ঘূর্ণাবর্ত

(উপন্যাস)

পশুপতি ভট্টাচার্য

ডি এম্ লাইব্রেরী

৪২ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রকাশক—

শ্রীগোপাল দাস মজুমদার

৪২ কর্ণওআলিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মুদ্রাকর—

শ্রীমিহির [illegible] [illegible]খোপাধ্যায়

টেম্প[illegible]

২, ন্যায়রত্ন লেন, ক[illegible]লিকাতা

আমার শ্রোতা এবং উৎসাহদাতা

শ্রীমান সনৎকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

স্নেহভাজনেষু—

দশ

মানুষ অবস্থাগতিকে নিতান্ত সাময়িক সমস্যার কথাগুলো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত থাকতে বাধ্য হয়। যখন যেমন পরিবেষ্টনের মধ্যে পড়ে তখন বাকি সব কিছু ছেড়ে তাই নিয়েই দিনরাত ভাবতে থাকে। যে রঞ্জন একদিন কেবল উচ্চস্তরের প্রেমের কথা চিন্তা করতো, জীবনের মোড়ে মোড়ে কুড়িয়ে পাবার মতো আরো কত নব নব আনন্দের কথা কল্পনা করতো, সভ্যতার আরো অধিকতর উৎকর্ষের কথা ধারণা করতো, ভবিষ্যৎ মানুষের চরম সার্থকতার কথা অনুধাবন করতো, সেই রঞ্জন এখন হিন্দু মুসলমানের বিরোধিতার কথা ছাড়া অন্য কোনো কথাই আর ভাববার সময় পায় না।

ধীরার সঙ্গে নবীন প্রেমের লুকোচুরি খেলাগুলো তার ঘুচে গেল, ফিলজফির বই নিয়ে মনোনিবেশ ক'রে পড়া ঘুচে গেল, মুখের হাসি ঘুচে গেল, মনের প্রসন্নতাও ঘুচে গেল। অনবরতই মনে হ'তে লাগলো যে সে তো হিন্দু নয়। চুরি ক'রে এমন হিন্দু সেজে এই সব হিন্দুদের মধ্যে দলভুক্ত হ'য়ে থাকা এখন তার পক্ষে হয়তো অপরাধ। সে হয়তো আপন কামনা আর নিষ্ঠার দ্বারা অন্তরের তরফ থেকে হিন্দু হ'তে পারে, কিন্তু মাতৃগর্ভ থেকে সে তো হিন্দু হ'য়ে জন্মায়নি! তার দেহের মধ্যে রয়েছে খাঁটি মুসলমান পূর্বপুরুষের রক্ত। একথা কেমন ক'রে সে নিজের মনের কাছে অস্বীকার করবে?

অথচ সে যে আপন অন্তরে অন্তরে বাস্তবিকই হিন্দু, এ কথাও কি সত্য নয়? হিন্দুর মতোই সে দেবদেবীকে মানে, হিন্দুদের রীতিনীতি-গুলোকে সে স্বকীয় বলে আপন সত্তা দিয়ে অনুভব করে। হিন্দুদের

মতো মনটা তার স্বভাবতই মমতাপ্রিয়, শান্তিকামী। তবে অষ্টপ্রহর এই ধরাপের হীন একটা চৌর্যের মতো অপরাধের ভাব জাগে কেন তার মনে? এখনও কি দ্বন্দ্বটা তার ঘোচেনি? কোনো কালে কি তা ঘুচবে না? এই অস্বস্তিকর একটা গোপন মালিন্য নিয়ে কেমন ক'রে সে দিন কাটাবে? কেমন ক'রে সে ধীরার সঙ্গে মন খুলে হাসিমুখে কথা বলবে?

রঞ্জন বারে বারে খুব অন্যমনস্ক হ'য়ে যায়। এক একবার মরিয়া হয়ে ভাবে, কিসের অপরাধ? মুসলমান ঘরে জন্মটাও ওর অপরাধ নয়, আর সেই সঙ্গে যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রবণতা ওকে বাল্যকাল থেকেই এমন হিন্দুত্বপ্রিয় ক'রে তুলেছে সেটাও কোনো অপরাধ নয়। এর থেকে যে সমস্ত বৈষম্য ঘটছে তাতে ওর নিজের কোনো হাত নেই। কিন্তু তবুও এ গোপন দ্বন্দ্ব মেটে না। মনের দ্বন্দ্ব মনে মনেই চলতে থাকে।

খেতে বসে কোনো কিছু কোলাহল শুনলেই ওর খাওয়া থেমে যায়। রাত্রে অনেকবারই বাইরের চীৎকারের শব্দে ওর ঘুম ভেঙে যায়। পাড়ায় পাড়ায় সারা রাত আলো জ্বলে, বাড়ির ছাদে ছাদে ইঁটের স্তূপ জড়ো ক'রে পাড়ার ছেলেরা পাহারায় জেগে বসে থাকে। অন্য পাড়া থেকে কিছু হট্টগোলের কিংবা শাঁখ বাজার শব্দ পেলেই অমনি এই পাড়ার সন্ত্রস্ত সজাগ ছেলেরা বিকট উত্তেজনাপূর্ণ কণ্ঠে চেঁচিয়ে ওঠে—'কালী-মায়ীকি'—। অপর একটা গলির জয়ধ্বনি দিয়ে সেই অসম্পূর্ণ বাক্যটাকে সম্পূর্ণ করতে না করতেই গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে চারিদিক থেকে বেজে ওঠে মেয়েদের ত্রস্ত সম্মিলিত শঙ্খধ্বনি। কোনো কোনো বাড়ি থেকে মেয়েরা ভয় পেয়ে অকস্মাৎ তারস্বরে চেঁচিয়ে ওঠে, শিশুরা কিছু বুঝতে না পেরে হাউমাউ ক'রে কেঁদে

ওঠে, বৃদ্ধেরা অনিশ্চিত উদ্বেগে জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খক্ খক্ ক'রে কাসতে থাকে। চারিদিক থেকে একটা রব উঠে যায়—'আসছে, আসছে,—এলো, এলো'! ঘুম ভেঙে ওর বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করতে থাকে। এই বুঝি এসে পড়লো দুর্দান্ত দুর্জয় সর্বগ্রাসী আততায়ী মুসলমানের স্রোত। এবার বুঝি সেই স্রোত সমগ্র শুচিবাইগ্রস্ত তালি দেওয়া পুরোনো নড়বড়ে হিন্দুত্বটাকে ভাসিয়ে ভেঙে তছনছ ক'রে গুঁড়িয়ে দিয়ে যাবে! ধীরা অত্যন্ত ভয় পেয়ে দুই বাহু দিয়ে ওকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে। কিন্তু ধীরাকে সান্ত্বনা দিয়ে শান্ত করবার মতো কোনো বাক্যই ও উচ্চারণ করতে পারে না। সেটা ভয়ে নয়, ও চিরকালই নির্ভীক প্রকৃতির। সেটা ওর নিজেরই অপরাধবোধের নবোত্থিত বেদনায়। ওর নিজের অন্তরের মধ্যে তখন এই রকমেরই একটা ভয়াবহ তাণ্ডবলীলা চলছে।

ক'দিন থেকে খুব জোর গুজব রটে গিয়েছিল যে মুসলমানেরা খিদিরপুরের দিক থেকে দল বেঁধে জাহাজে চড়ে তৈরি হয়ে আছে, সুযোগ পেলেই তারা গঙ্গার ধারে কোথাও নেমে শহরের ঐ অঞ্চলটা রাতারাতি আক্রমণ করতে আসবে। সেইজন্যেই সকলের এত ভয়। তারই প্রতিরোধ করবার জন্যে বাড়িতে বাড়িতে সবাই স্তূপাকার ইট সংগ্রহ ক'রে রেখেছে, যাদের বন্দুক আছে তারা সেগুলো প্রস্তুত রেখেছে, কেউ কেউ মারাত্মক হাতবোমা তৈরি ক'রে রেখেছে। আক্রমণকারীদের দলকে ভয় দেখাবার জন্যে কয়েকটা হাতবোমা তখনই তখনই সশব্দে ফাটানোও হ'য়ে গেল। কিন্তু বহুক্ষণ অপেক্ষা ক'রে দেখা গেল, আক্রমণ করতে কোনো দলই এলোনা। খানিকটা হৈ চৈ ক'রে তখন সবাই আবার শান্ত হ'য়ে গেল। ধীরার ভয়াতুর বাহুবন্ধন ক্রমে ক্রমে শিথিল

হ'য়ে গেল, সে আবার নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়লো। কিন্তু রঞ্জনের চোখে সহজে আর ঘুম আসে না। তার মনের মধ্যে তখনও একটা অস্থির আলোড়ন চলতে থাকে।

ধীরার মনে মুসলমানদের সম্বন্ধে বরাবরই কিছু অহেতুক ভীতি ছিল। এই হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় সেটা আরো অতিমাত্রায় প্রখর হ'য়ে উঠেছে। কোনো একটা গোলমালের শব্দ শুনলেই তার হৃদস্পন্দন স্তম্ভিত হ'য়ে হাত পা সমস্ত অসাড় হ'য়ে যায়, পেটের ভিতরটা যেন তাল পাকিয়ে গুটিয়ে যায়। যদি মুসলমানরা এসে দরজা ভেঙে বাড়ি চড়াও হ'য়ে আক্রমণই করে, তাহ'লে তখন ওর দুর্দশায় কি হবে? ওর প্রতি কেমন ধরণের অত্যাচার যে তারা করবে, কত রকমেরই নিষ্ঠুরতার উদ্ভাবনা করবে, তার কোনো স্থিরতাই নেই। আত্মরক্ষার জন্যে ও তখন কোন রকমের উপায় অবলম্বন করবে? বারান্দা থেকে লাফিয়ে পড়বে? তীব্রকণ্ঠে চীৎকার করবে? ক্ষুর দিয়ে নিজের গলাটা তাড়াতাড়ি কেটে ফেলবে? কিছুই ও স্থির করতে পারে না। ঐ সব ভাবলেই মনে মনে দিশেহারা হ'য়ে যায়।

রঞ্জনকে ধীরা এখন এক মুহূর্তের জন্যেও ছাড়ে না। তাকে বাড়ি ছেড়ে একবারও বাইরে বেরুতে পর্যন্ত দেয় না। এমন কি মোড়ের দোকানে সিগারেট কিনতে গেলেও সে অস্থির হ'য়ে ওঠে। স্টোভের জন্যে স্পিরিট ফুরিয়ে গেছে, তাও একটু দূর থেকে কিনে আনতে যেতে দিলে না। স্থানীয় ব্যাংক থেকে টাকা তুলে আনতে গেলেও সে বুঁচোকে সঙ্গে দিয়ে পাঠালে। বুঁচোকেও সে রাত্রে কয়েকদিন তার নিজের বাড়িতে যেতে দেয়নি, ভুলিয়ে ভালিয়ে পয়সা দিয়ে আপনার ঘরের মধ্যেই আটকে রেখেছে। রঞ্জন একবার

কিছুক্ষণের জন্য বাইরে একটু বেড়িয়ে আসতে চেয়েছিল, অমনি তার মুখ শুকিয়ে গেল। সে বললে যে রমজান যদি অমন ক'রে চলে যায়, তাহ'লে সে ভয়ে মরেই যাবে।

ক'দিন থেকে বাগমারির বাড়ির কোনো খোঁজ খবর নেওয়া হয়নি। তারা সবাই যে কেমন অবস্থায় রয়েছে তা কে জানে। রমজানের মনটা বড়ো উচাটন হ'য়ে উঠলো। খাঁরা তো এই বাড়ি ছেড়ে অত দূরে যেতেই দেবেনা। আর সেখানে যাবার পথেও হয়তো যথেষ্ট বিপদ আছে। ট্যাক্সি ক'রে যদিবা কোনোগতিকে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু সেখানে একবার গিয়ে পড়লে তারাই বা সহজে ছাড়বে কেন? দাঙ্গা একটু না কমলে যাবার কোনো উপায় নেই। অথচ তাদের একবার খবর নেওয়াটাও বিশেষ দরকার। ওর নিজের নিরাপত্তা সম্বন্ধেও তাদের কিছু খবর জানানো দরকার, নইলে তারাও তো খুবই ভাবছে।

ও তখন ভেবেচিন্তে তাদের কাছে টেলিফোন করতে গেল। মুস্তাফা সাহেবের বাড়ির কাছে একটা সাবান কল ছিল, তারা ওদেরই জমির ভাড়াটে। সেখানে টেলিফোন ক'রে ও সোভান মিঞাকে ডেকে পাঠালে। সোভান মিঞা এসে টেলিফোন ধরলে। ও তার কাছে সব রকমেরই খবরাখবর নিলে।

সোভান মিঞা ওর গলার আওয়াজ পেয়েও প্রথমে কিছুতেই বিশ্বাস [illegible] না। তার পর যখন বুঝতে পারলে যে ও প্রকৃতই রমজান, তখন খুবই খুশি হ'য়ে উঠলো। টেলিফোনের মারফতে সে অনেক খবরই বললে। রাবিয়া বিবি দুর্ভাবনায় আহার নিদ্রা প্রায় পরিত্যাগই করেছেন। তাঁর ধারণা যে হিন্দুরা তাঁর ছেলেটিকে নিশ্চয়ই কোন কালে মেরে ফেলেছে। ফাতিমা বিবি অনেক টাকা খরচ ক'রে পাহারা-

ওয়ালাদের ঘুষ খাইয়ে কলেজে খবর নিতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু কেউই রমজান ব'লে কাউকে কলেজের মধ্যে খুঁজে পায়নি। বাড়ির সকলে দারুণ উদ্বিগ্ন হ'য়ে দিন কাটাচ্ছে। বস্তির মধ্যেও যথেষ্ট উদ্বেগ। হিন্দুরা কখন এসে বস্তি জ্বালিয়ে দিয়ে যাবে, সর্বদাই এই ভয়। মেয়েছেলেরা রাত্রে বস্তির মধ্যে কেউই এখন থাকেনা, সবাই ওদের বাড়ির বারান্দায় আর উঠোনে এসে আশ্রয় নেয়। বস্তির লোকেরা কেউ কাজে বেরুতে পারছে না। অনেকে আজকাল খেতেই পাচ্ছেনা। তাদের রেশন আনতে যাবার উপায় নেই, বাজারে কিছু কিনতে যাবার পর্যন্ত উপায় নেই। পুলিশের লোক সঙ্গে নিয়ে এক একটা লরি এসে খাবার জিনিস দিয়ে যায়, তবেই তারা খেতে পায়। এক দিকে প্রাণের ভয়, অন্য দিকে খাবার অভাব, এমনি ক'রেই দিন কাটছে। সিনেমা একদম বন্ধ, বাড়িভাড়ার পয়সাকড়িও কিছুই আদায় হচ্ছে না।

রঞ্জন বিশেষ ক'রে বলে দিলে যে ওর জন্যে ভাবনা করবার কোনো দরকার নেই। ও খুব নিরাপদেই আছে। বস্তির লোকদের যেন যথাসাধ্য সাহায্য করা হয়। হাতে যা টাকা আছে তাই এখন খরচ করা হোক, গরিবদের মধ্যে কিছু কিছু বিতরণও করা হোক। ওর জন্যে কেউ যেন আর অনর্থক খোঁজখবর না করে। দাঙ্গাটা একটু মিটলেই ও বাড়ি ফিরে সকলের সঙ্গে দেখা ক'রে আসবে। খুব সম্ভব দু'একদিনের মধ্যেই গিয়ে হাজির হবে।

কিন্তু এ দাঙ্গা যে শীঘ্র মিটবে এমন কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। প্রথমটায় যে দল বেঁধে প্রকাণ্ড ডাকাত পড়ার মতো খুনোখুনির আক্রমণ আর লুটতরাজ চলছিল, সেটা কতক থামলো বটে। কিন্তু তার পর থেকে হত্যার ব্যাপারটা দুই পক্ষ থেকেই চোরাগোপ্তায় চলতে লাগলো।

এক পক্ষ যদি একটা খুন করে, তো অপর পক্ষ অমনি দুটো খুন ক'রে তার প্রতিশোধ নেয়। এমন অবুঝ অবস্থার মিটবে কেমন ক'রে?

সম্প্রতি রঞ্জনদের ঘরে তার সহপাঠী পরেশ এসে আশ্রয় নিয়েছে। সে থাকতো কোন এক মুসলমান পাড়ার মধ্যে কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে। সেই পাড়ার সমস্ত হিন্দুই প্রাণের ভয়ে পুলিশের সাহায্য নিয়ে পরিত্রাণ সমিতির লরি ডাকিয়ে কোনোমতে ঘরবাড়ি ফেলে পালিয়েছে। পরেশও তাদের সঙ্গে পালিয়ে এসে আপাতত রঞ্জনদের হোটেলেই ঢুকেছে। হোটেলে তখন ঘরে ঘরে লোক ভর্তি, কোথাও তিলধারণের স্থান নেই। সকল ভাড়াটের আত্মীয়স্বজন বিপন্ন হ'য়ে এখানে আশ্রয় নিয়েছে, যে ঘরে মাত্র দুজনের সীট সে ঘরে দশজন জুটেছে। এই বিপদের সময় কেউ কাউকে তাড়াতেও পারে না। পরেশ যখন এসে খুব সংকোচের সঙ্গে মাত্র দুদিনের জন্যে আশ্রয় চাইলে, তখন ওরা খুব খুশি হ'য়েই তাকে নিজেদের বসবার ঘরটা ছেড়ে দিলে। তবু তো একজন সাহায্য করবার লোক বাড়লো। বিপদের সময়ের জন্যে খানিকটা বলভরসা বাড়লো। বসবার ঘরের টেবিল চেয়ারগুলো সরিয়ে সেখানে একটা আম কাঠের চৌকি এনে পাতা হলো। দিনের বেলাতে তার ওপর বসেই আড্ডা চলতো, রাত্রে পরেশ সেখানে শুতো।

অবস্থা ক্রমে আরো যেন সঙ্গীন হ'য়ে উঠলো। দৈনন্দিন নরহত্যা কিছু কিছু নিত্যই চলেছে।

তার ওপর শহরে মড়ক দেখা দিতে লাগলো। বড়ো রাস্তার দুধারে স্তূপীকৃত জঞ্জাল জড়ো হ'য়ে মাঝখান পর্যন্ত ছাড়িয়ে গেছে, কর্পোরেশনের লরিগুলো সে জঞ্জাল উঠিয়ে নিয়ে যেতে কখনো আসেই না। ডাস্টবিনের পাশে হাত পা কাটা গলিত মৃতদেহ কয়েকদিন

থেকেই পড়ে আছে, তার বিকট দুর্গন্ধ থেকে নাকে কাপড় চাপা দিয়েও নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। পালে পালে শকুনি উড়ে আসে. মড়ার পচা মাংসগুলোকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন ক'রে দিয়ে সেই দুর্গন্ধটাকে তারা আরো বেশি ক'রে ছড়ায়।

প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় রঞ্জনদের ঘরে জোর আড্ডা জমে। সন্ধ্যার পর থেকেই কারফিউ। তখন বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ানোও নিরাপদ নয়. বন্দুকধারী সৈন্যবোঝাই হ'য়ে মিলিটারি লরিগুলো থেকে থেকে যাতায়াত করছে। তখনই আড্ডা বসে যায় পরেশের শোবার দরুণ সেই কাঠের চৌকিটার ওপর। রঞ্জন, ধীরা, পরেশ, উমাচরণ বাবু, আর তাঁর স্ত্রী, সবাই একযোগেই এসে জোটে। কোনোদিন হয় তাস খেলা, কোনোদিন হয় তর্ক। তর্ক বলাটা ঠিক নয়, এই হিন্দু মুসলমান নিয়েই আলোচনা। উমাচরণ বাবু খাদ্যবণ্টন বিভাগে কি একটা চাকরি করেন। আগে ছিলেন নয়া দিল্লীতে, এখন বদলি হ'য়ে এসেছেন কলকাতায়। তিনি ভেতরকার পলিটিক্স সম্বন্ধে অনেক গুহ্য খবরই নাকি রাখেন। সেই সব কথা অতি গুহ্যভাবে তিনি এদের কাছে ব্যক্ত করেন। সেই সব আজগুবি খবর শুনে ধীরা স্তম্ভিত হ'য়ে যায়, পরেশ মুখ ফিরিয়ে বসে বই পড়ে, রঞ্জন যথাসাধ্য প্রতিবাদ করে, আর উমাচরণ বাবুর স্ত্রী কেবল হাসে।

রাস্তার ও পাশের একটা বাড়ির জানলা খোলা দোতলার ঘর থেকে রেডিওর আওয়াজ শোনা যায়। কখনো তারা সেটাকে বেশ মৃদুস্বরেই বাজায়, আবার কখনো তার আওয়াজটা এতই জোরে বাড়িয়ে দেয় যে এমন খুব চেঁচিয়ে কথাবার্তা না বললে মোটে কিছু শোনাই যায় না। রেডিওতে যখন দাঙ্গার সম্বন্ধে খবর জানায়, তখন ঘোষণাকারী নির্বিকার কণ্ঠে এমন কথাই বলে যেন ব্যাপারটা বিশেষ

কিছুই নয়। আজ কলকাতার উত্তর অঞ্চলে কোনো জায়গায় সামান্যই কয়েকটা ক্যাজুয়ালটি হয়েছে, আর পূর্ব অঞ্চলের কোনো এক সম্প্রদায়ের কয়েকটা বস্তিতে আগুন লাগাবার বার কয়েক চেষ্টা হয়েছে মাত্র। তার পরেই খুব চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে রেডিওর বক্তা বলে—'আপনারা গুজবে কান দেবেন না'। এইখানেই খবর বলা শেষ। তার পরেই অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলকাতা কেন্দ্র থেকে রেকর্ডে তোলা পুরোনো কোনো সিনেমার গান শুরু হ'য়ে যায়।

উমাচরণ বাবু হাসতে হাসতে বলে—"আর গুজবে কান দিবেন না! কানে বুঝি সবাই তুলা আইটা বইস্যা রইবে? হিন্দুগো মুখে কেবল চাপা দিয়া রাইখবার চায়, আর আটার রেশন ফুরাইছে বইল্যা ভালো ভালো গমের আটাগুলান মুসলমানগো বস্তিতে বস্তিতে লরি কইর‍্যা চালান দিবার লাগে। এ শয়তানি কতদিন চাপা থাকবো?"

রঞ্জন বলে—"আপনি এ একটা অসম্ভব কথা বলছেন। তাই কখনো হয়? রেশনের মধ্যেও হিন্দু মুসলমানের ভাগাভাগি হয় নাকি?"

উমাচরণ বাবু বলে—"তাই হইছে মশয়, আর আপনি কন যে হয় না। ইস্তা যমুনা, আমার নস্যের ডিবা? (ভদ্রলোকের রোগা জাতির নাম যমুনা। নস্যের ডিবাটি হাতের কাছে না হাতড়ে পেলেই অমনি তার উপর পড়ে, সে ডিবাটি কাছের থেকেই তুলে নিয়ে অধিকর্তার কাছে এগিয়ে দেয়।) আরে হ, আমি নিজের কানে সব শুনছি মশয়। গবর্ণর সাহেব নিজেই এসে হুকুম দিয়া দিলেন আমাদের বড়ো কর্তারে, আমি তখন তাঁর কাছেই আছিলাম। এতো ইংরাজেরই কারসাজি, আমাগো খাইতে না দিয়া শুকাইয়া মারবো, আর ওগো খাইতে দিয়া ঝাগড়া করবো। এ ইংরাজই তো ফুসলানি

দিয়া তলে তলে এই ঝগড়াটা বাধাইছে। নইলে বোকা মুসলমানগোর কি এতখানি বুদ্ধি ছিল যে আলাইদা একটা রাজ্য বানাবার চায় ?"

রঞ্জন চটে উঠে বলে—"আমাদের নিজেদেরই মধ্যে বহুকালের যে ঝগড়া, তার জন্যে বাইরের তৃতীয় পক্ষকে দায়ী করেন কেন ? এ ঝগড়ার সূত্রপাত তো প্রথমে আমরাই করেছি। আমাদের নিজেদের সমাজ থেকে যাদের সামান্য কারণে তাড়িয়ে দিয়েছি, যারা বেরিয়ে গেলে আর সমাজে ঢুকতে দিইনি, তারাই তো এখনকার অধিকাংশ মুসলমান। ওরা আমাদেরই ঘরের লোক, অথচ ওদের আলাদা ব'লে চিরকাল ঘৃণা ক'রে এসেছি। আর ওরাও মনে মনে তার শোধ নিতে চেয়েছে। ঝগড়াটা বেধেছিল তো এই থেকে, ইংরেজরা না হয় তাতে খানিকটা ইন্ধন জুগিয়েছে। অপমানের খানিকটা শোধবোধ না হ'লে কি এই ঝগড়া মিটবে ? অনেক উপায় ক'রে সুরেন্দ্র নাথও সে ঝগড়া মেটাতে পারেননি, সি আর দাসও পারেন নি, সুভাষ চন্দ্রও পারেন নি, আর মহাত্মা গান্ধীও পারেন নি। পারবেন কোথা থেকে ? মেটাতে গিয়েও আমরা প্রথমেই ধরে নিয়েছি যে ওরা হলো আলাদা। আমরা যে-মানুষ, ওরা ঠিক সে-মানুষ নয়। এখন ওরাও তাই ধরে নিয়েছে। স্বাধীনতা এবার আসছে দেখে ওরাও নিজেদের জন্যে আলাদা রকমের একটা স্বাধীনতা চাইছে। আমাদের থেকে আলাদা ক'রে নিয়ে যতটা পারে নিজেদের সুখ সুবিধার দিকেই দেখছে।"

উমাচরণ বাবু বলে—"আপনি যে দেখি ওয়াগোর হয়ে অনেক রকমই বলতে লাগছেন ? পরের ঘরে সব ভালো, নিজের ঘরেই যত দোষ ! আপন জাতের ভালোর দিকে একটুও নজর নাই ! স্বাধীনতা চায় তো আমাগোর ঘরবাড়ি লুট করে ক্যান ? এখনো চক্ষু দুটা খোলেন না, এই রোগেই তো হিন্দু মরছে মশয় !"

রঞ্জন হঠাৎ অপ্রস্তুত হ'য়ে থেমে যায়। তাইতো, ও যে মনে প্রাণে হিন্দু হ'য়েও মুসলমানদেরই দাবীকে সমর্থন করছে! এই দারুণ দুঃসময়ের দিনে তাই কি এখন করা উচিত? ও যদি প্রকৃত হিন্দু হয় তো হিন্দুর দিকটাই তো টানবে? বিস্মিত হ'য়ে চারিদিকে চেয়ে দেখে যে ধীরা সেখানে নেই। সে কখন অলক্ষ্যে যমুনাকে নিয়ে অন্যত্র সরে পড়েছে। যমুনা দিদির সঙ্গে ধীরার এখন খুবই ভাব।

—এগারো—

ওপরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে রঞ্জন একদিন স্নান করতে যাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। ধীরা তখন বাথরুমে ঢুকেছে, পরেশ কি একটা বই নিয়ে ঘরে বসে পড়ছে। হঠাৎ রাস্তায় একটু দূরে তুমুল কোলাহল উঠলো। ও রেলিং দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখলে, কালো চেহারার নগ্নগাত্র একটি রোগা ছোকরাকে পাড়ার সবাই মিলে ঘিরে ধরেছে। সকলেরই হাতে রয়েছে এক একটা লাঠি, ছেলেটি সম্পূর্ণ নিরস্ত্র। মুখখানা তার আতংকে শুকিয়ে গেছে।

সকলে মিলে তাকে ধমক দিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো—"বল তুই হিন্দু না মুসলমান?" ছেলেটি ভয়ে কোনো কথাই বলতে পারলে না। তাকে নির্বাক দেখে সকলেই প্রথমে একটু ইতস্তত করতে লাগলো। একজন বললে—"ওর কাপড় খুলে আগে দেখে নে, হিন্দু না মুসলমান।" কাপড় ধরে টানতেই মরিয়া হ'য়ে ছেলেটি 'ওরে বাবারে' ব'লে একটা লাফ দিয়ে ছুটে পালাতে গেল। কিন্তু ছুটতে আর তাকে হলোনা, দু তিন ঘা লাঠি পড়লো তার পায়ের গোছে। যেমনি সে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল, অমনি অসংখ্য লাঠির আঘাত সজোরে বর্ষিত হ'তে লাগলো তার মাথায়, পিঠে, সর্বাঙ্গে। সে দু একবার ওঠবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। তখন সে উবুড় হ'য়ে শুয়ে পড়েই আঘাতের পর আঘাত খেয়ে যেতে লাগলো। একটুও কোনো সাড়া শব্দ করলে না, একটুও আর নড়লো না। মার খেতে খেতে কিছুক্ষণের পরেই সে ঘাড়

কাৎ ক'রে অবশ হ'য়ে লুটিয়ে পড়লো। লাঠির ঠেলা মেরে তখন তাকে চিৎ ক'রে ফেলা হলো। তখন সে নিষ্পলক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। কি বিস্মিত ভয়াতুর সেই দৃষ্টি! তার মুখে আর বুকে আবার পড়তে লাগলো সজোরে লাঠির পরে লাঠি। তখন সে একেবারেই মৃত। মুখের অবয়বটা থেঁতলে বিকৃত হ'য়ে নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্তস্রোত গড়িয়ে পড়তে লাগলো। তবু চোখ খুলে তখনো সে যেন চেয়ে আছে। কি ভয়াবহ তার সেই মৃত দুটি চোখের অসহায় দৃষ্টি! রাত্রে ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বুঝি সে দৃষ্টি ভোলা যাবে না।

রঞ্জন ভেবেছিল, নিষ্ঠুর হত্যার এই প্রত্যক্ষ দৃশ্য সে চোখে দেখতে পারবে না। তখনই সেখান থেকে সরে যেতে চাইলো, কিন্তু চেষ্টা ক'রেও কিছুতেই সরতে পারলে না। চোখ দুটো বুজিয়ে ফেলতে চাইলো, কিন্তু তাও কোনমতে পারলে না। যেন মন্ত্রমুগ্ধের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আগাগোড়া সবটুকুই সে দেখতে বাধ্য হলো। যখন 'কালী মাঈকি জয়' ব'লে হল্লা করতে করতে হত্যাকারীর দল মৃতদেহটা টেনে নিয়ে চলে গেল, তখনও সে ঠায় তেমনি ভাবেই দাঁড়িয়ে আছে। পা দুটো তার বিশ মোণ পাথরের মতো ভারী।

দু পাঁচ মিনিট যেতে না যেতেই গলির মোড়ের দিক থেকে একটা ফেরিওয়ালার ডাক শোনা গেল—"হাফ প্যান্ট চাই, হাফ প্যান্ট! সস্তা দামের ভালো ভালো রঙীন হাফ প্যান্ট!" ডাক শুনে হঠাৎ রঞ্জন যেন চমকে উঠলো। গলার স্বরটা যেন খুব চেনা চেনা। সেই বাগমারির বস্তির গজল গাওয়া ইসমাইলের গলার মতো নয়? ফেরিওয়ালা আরো কাছে এগিয়ে এলো। রঞ্জন খানিকটা দূর থেকে দেখেই তাকে চিনতে পারলে। হাঁ, এ সেই ইসমাইল ছোঁড়াই তো! নিশ্চয়ই সে, তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই।

কিন্তু কী সর্বনাশ। ওর কি প্রাণের ভয় নেই? এ পাড়ার লোকেরা যদি একবার ওকে দেখতে পায়, তাহ'লে এখনই তো ঐ আগের লোকটির মতো ওকেও খুন ক'রে ফেলবে। গরিব হিন্দু যুবকের মতো বেমালুম ভাবে ও কাপড় জামা পরেছে বটে, কিন্তু তাতেই কি আর পরিচয় ঢাকা যায়! একটু লক্ষ্য ক'রে দেখলেই বোঝা যায়, এ হিন্দু নয়, মুসলমান। হতভাগাটার এতই দুঃসাহস? কিন্তু এখনই যে সর্বনাশ হ'য়ে যাবে!

নিচে হোটেলের দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল বঁচো। রঞ্জন গলা বাড়িয়ে তাকে ডেকে বললে—"ওরে ঐ হাফ্ প্যান্টওয়ালাকে একবার ডাক ডাক, আমি হাফ প্যান্ট কিনবো।" এই ব'লে তাড়াতাড়ি সে ঘরে ঢুকে তেলমাখা মাথাটাই জামার মধ্যে গলিয়ে চটি পায়ে দিয়ে ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে গেল।

ইসমাইল খুবই হুঁশিয়ার, নিমেষে চমৎকার বোকা সাজতে জানে। রঞ্জনকে অমন ক'রে ছুটে আসতে দেখে সে একটুও বিচলিত হলো না, ওকে যে চিনতে পেরেছে এমন কোনো লক্ষণই তার দেখা গেল না। রঞ্জন কিছু বলবার আগে সে নিজেই বললে—"হাফপ্যান্ট নেবেন স্যার? আপনার মতো মাপেরও রয়েছে আমার কাছে। নেন যদি তো একটা দুটো নিয়ে লাভ নেই, একসঙ্গে হাফ-এ-ডজন নিয়ে নিন, ডজন হিসেবে আরো সস্তায় পেয়ে যাবেন। এ যেমন তেমন কাপড় নয়। হিন্দু তাঁতীদের হাতের হাওলুমের তৈরি কাপড়, মা কালীর দিব্যি আপনাকে বলছি।"

রঞ্জন কোনো উচ্চবাচ্য না ক'রে তাড়াতাড়ি তাকে বাড়ির মধ্যে ডেকে নিয়ে গেল। তার নিজের ঘরে নিয়ে যাবামাত্রই সে দরজার কাছটিতে বসে পড়ে প্যান্টগুলো খুলে নমুনা দেখাতে শুরু

ক'রে দিলে। বললে—"দেখুন একবার কাপড়টায় হাত দিয়ে, আমি যা বলেছি তা ঠিক কিনা।"

রঞ্জন বললে—"তুই যে এই হিন্দু পাড়ায় ফেরি করতে এসেছিস, তোর সাহস তো কম নয়!"

"কি করি বলুন, পেটে আজকাল মোটে খেতেই পাই না। ঘরে আমার বৌ আছে, তার একটা ছেলেও হয়েছে। তাদেরও কিছু খেতে টেতে দিতে হবে তো। মুসলমানদের পাড়ায় একটা বিড়ির দোকান খুলেছিলাম, তারা আমাকে মেরে সেখান থেকে তাড়িয়ে দিলে। বললে, এখানে কেন? নিজের পাড়ায় চলে যা, সেখানে অনেক পয়সা রোজগার হবে। কি করি বলুন, পেটের দায়ে এই হাফ্‌প্যান্ট ফেরি করে বেড়াচ্ছি। রাত্রে বসে কাপড় কেটে সেলাই করি, আর দিনে পাড়ায় পাড়ায় হেঁকে বেড়াই। কি করি বলুন, পেটের দায় যে বড় দায়!"

"না না, তুই ভারী অন্যায় কাজ করেছিস। এখনই পাঁচ মিনিট আগে এই রাস্তার ওপরেই আমার চোখের সামনে একটা খুন হ'য়ে গেল। লোকটাকে কিছু বলতেই দিলে না, বাঁশ দিয়ে ঠেঙিয়ে মেরে ফেললে। এইমাত্র তারা সরে গেছে, এখনই আবার সব দলবল নিয়ে এসে পড়বে। তোকে দেখলেই মেরে ফেলবে, কোনো কথাই তোর শুনবে না। অচেনা মানুষকে দেখলেই তারা ঠিক চিনে ফেলে।"

ইসমাইল তবু হাসতে লাগলো। কিন্তু সে দারুণ ভয়ের হাসি। ভয়ে মুখখানা তার শুকিয়ে চুণ হ'য়ে গেছে। বিপদ যে খুব সন্নিকট, প্রাণটা যে সঙ্কটাপন্ন তা এবার সে বুঝতে পেরেছে। নিতান্ত শুষ্কভাবে তেমনি হাসিমুখেই সে বলল—"আমাকে আপনারা একটু

জল খাওয়াতে পারেন ? সকালে আজ কিছু খেয়ে পর্যন্ত বেরোইনি কিনা।”

খুঁচোকে ইঙ্গিত করাতে সে একগ্লাস জল এনে দিলে। এক নিঃশ্বাসে সবটুকু জল পান ক'রে নিয়ে সে আবার একটু হাসলে। তারপরে বললে—“তাহ'লে এ পাড়া থেকে দয়া ক'রে আপনারা আমাকে বড়ো রাস্তায় বের ক'রে দিন, আমি অন্য দিকে চলে যাই।”

রঞ্জন বললে—“এখন রাস্তা দিয়ে তোকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াও বিপদ। কে কি সন্দেহ ক'রে বসবে, কিছুতেই আর বাঁচাতে পারবো না। তুই তার চেয়ে দিনের বেলাটা এইখানে থেকে যা। সন্ধ্যার পরে পরেশ আর আমি দুজনে মিলে তোকে ট্রাম রাস্তায় ছেড়ে দিয়ে আসবো।”

বীরা স্নান সেরে এসে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের এই সব কথাবার্তা শুনছিল। সে অকস্মাৎ হাত দুখানা নেড়ে একটু যেন ঝাঁজিয়ে ব'লে উঠলো—“না না, এখানে কিছুতেই ওর থাকা চলবে না। ও নিশ্চয়ই মুসলমান, ওর মুখ দেখেই আমি বুঝতে পারছি। ওর ঠোঁট দুখানা ঠিক ঐ ওদেরই মতো, লুকোবে কেমন ক'রে? ওকে বিদেয় ক'রে দাও, নইলে আমার ভয়ানক ভয় করবে।”

রঞ্জন আশ্চর্য হ'য়ে গেল। ওর কথার ওপর বীরা আজ প্রতিবাদ করে! এই কি সেই বীরা? ওকে যেন আর তেমন চেনা যাচ্ছে না।

কিন্তু বাকবিতণ্ডা করবার তখন সময় নয়। রঞ্জন বললে—“আচ্ছা তবে চলে আয়, তোকে এখনই আমি এ পাড়া থেকে পার ক'রে দিয়ে আসি।”

খুঁচো কিন্তু বারণ করলে। সে বললে—“এখন গিয়ে কাজ নেই। মোড়ের মাথায় নামু গুণ্ডা ঘাটি আগলে বসে আছে। কে

জানে, সে হয়তো ওকে চিনে রেখেছে, তার সুমুখ দিয়ে পার ক'রে নিয়ে যেতে গেলে আপনিও বিপদে পড়বেন। তার চেয়ে আমার বাড়িতে ওকে নিয়ে চলুন। খুব কাছেই আমার বাড়ি, সেখানে এখন কেউ নেই। পাশেই আমার মায়ের আগেকার মনিবের বাড়ি। তিনি বাড়িতে একাই থাকেন, বিধবা মেয়েমানুষ। সেখানে থাকলে কোনোই ভয় নেই। কিছু খাবার দিয়ে বাইরের দরজায় তালা বন্ধ ক'রে ওকে রেখে আসবো, সন্ধ্যার পরে তালা খুলে বাইরে বের ক'রে নিয়ে যাবো। কেউ তখন জানতেও পারবে না।"

বুঁচোর পরামর্শতেই ওরা দুজনে ইসমাইলকে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। পাড়ার লোকের সঙ্গে যেতে দেখে কেউ তাকে কোনো সন্দেহ করলে না। এমন কি একজন ওকে ডেকে একখানা হাফ্ প্যান্টও দর ক'রে কিনে নিলে।

কিছু খাবার দিয়ে জল দিয়ে বুঁচো ওকে নিজের সেই খোলার বাড়িতে রেখে এলো। পাশের দোতলা কোঠা বাড়িতে থাকতেন একজন বিধবা ভদ্রমহিলা। তাঁর বাড়িটা ওদের বাড়ির গায়ে লাগালাগি, এমন কি খিড়কির দরজাটা দিয়ে ওদের বাড়ি থেকে তাঁর বাড়িতে যাওয়াআসা পর্যন্ত করা যায়। বাইরে বেরিয়ে আসবার সময় বুঁচো সেই ভদ্রমহিলার খিড়কির দরজাটা ওকে দেখিয়ে দিয়ে এলো। বললে সেখান থেকে হাঁক দিলেই ঐ বাড়ির বুড়ির সাড়া পাওয়া যাবে। বাইরে বেরিয়ে সদর দরজায় সে তালা বন্ধ ক'রে দিলে।

সন্ধ্যার সময় বুঁচো সেই আশ্রিত লোকটির খোঁজ নিতে বাড়ির মধ্যে ঢুকে দেখে সর্বনাশ কাণ্ড। তালা যেমন বন্ধ ছিল তেমনি

বন্ধই আছে, কিন্তু বাড়ির মধ্যে কেউ নেই। পাশের বাড়িতে মহা হুলুস্থুল আর হট্টগোল পড়ে গেছে। ব্যাপারটা কিছু বুঝতে না পেরে তখনই সে রঞ্জনকে খবর দিতে ছুটলো।

রঞ্জন সেখানে গিয়ে সমস্ত দেখেশুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। অনায়াসেই বুঝতে পারলে যে তার নিজের বুদ্ধির দোষেই এই কাণ্ডটি ঘটেছে। মমতার বশে ইসমাইলকে রক্ষা করতে গিয়ে সে তাকে চুরি ডাকাতি করবার সুযোগ দিয়েছে। হয়তো এই সুযোগই সে খুঁজতে এসেছিল, প্যাণ্ট ফেরি করা তার একটা ছল মাত্র। দাগী চোর জেনেও রঞ্জন বোকার মতো তাকে সেই বিষয়েই সাহায্য করেছে।

সন্ধান নিয়ে বোঝা গেল যে—পাশের বাড়ির খিড়কির দরজাটিতে যথেষ্ট ফাঁক ছিল, সেখান দিয়ে কিছু ঢুকিয়ে চাড় দিতেই খিলটা খুলে গেছে। সেই বাড়ির মালিক এক ভদ্রমহিলা সেখানে একাই বাস করেন। তার চাকর দাসী দু তিনজন আছে বটে, কিন্তু দুপুরের খাওয়া দাওয়ার পরে তারা সবাই বাইরে আড্ডা দিতে চলে যায়, বৃদ্ধা সদর দরজাটি বন্ধ ক'রে সে সময় বাড়িতে একাই নিদ্রা দেন। যথেষ্ট বয়স হয়েছে, এতে ভয় করবার তাঁর কোনোই কারণ নেই। সেদিনও তিনি ঘুমোচ্ছিলেন, হঠাৎ জেগে উঠে দেখতে পেলেন যে কে একজন লোক চুপি চুপি এসে গলা থেকে তাঁর সোনার হারটা কেটে নিচ্ছে। একবার চেঁচিয়ে ওঠবামাত্রই সেই লোকটা তাড়াতাড়ি ওঁকে চেপে ধরে কাপড় দিয়ে মুখটা বেঁধে ফেললে, তার পরে মস্ত একটা ছুরি বের ক'রে ওঁকে কাটতে যায়। সেই সময় তার হাতটা ধরে ফেলে উনি খুব ধ্বস্তাধ্বস্তি করেন, কিন্তু একজন জোয়ান লোকের জোরের সঙ্গে তিনি পারবেন কেন? ধারালো ছুরির আঘাতে হাত দুটো ওঁর ক্ষতবিক্ষত হ'য়ে যায়। একটা

আঙুলও আধখানা কেটে যায়। তখন বৃদ্ধা কাবু হ'য়ে পড়তেই লোকটা কাপড় দিয়ে ওঁর হাত পা বেঁধে নিশ্চল করে ফেলে রাখে, আর আঁচল থেকে চাবি খুলে লোহার সিন্দুকে যা কিছু ছিল সমস্তই সংগ্রহ ক'রে নিয়ে সদর দরজা খুলে বেরিয়ে চলে যায়। সিন্দুকে অনেক দামী গহনা ছিল, আর নগদ টাকাও যথেষ্ট ছিল, সবই সে নিয়ে গেছে। উনি ঐ অবস্থায় অজ্ঞানের মতো হ'য়েই পড়ে থাকেন। বিকেলে ওঁর চাকর দাসীরা ফিরে এসে এই কাণ্ড দেখে পাড়ার লোকদের ডাকে, আর পুলিশে খবর দেয়। পুলিশ এসে ইতিমধ্যে তদন্ত ক'রে গেছে। কিন্তু কোথা থেকে কেমন ক'রে যে সেই চোর এসে বাড়ির মধ্যে ঢুকলো তার কেউই কিনারা করতে পারেনি। পাশের খোলার বাড়িতে যাতায়াতের খিড়কির দরজাটা খোলা ছিল বটে, কিন্তু সে বাড়িতে কোনো লোক বাইরের থেকে এসে ঢুকে পড়বার সম্ভাবনা ছিল না। তার দরজা কয়েক-দিন ধরেই বাইরের থেকে তালাবন্ধ ছিল। অনেকের ধারণা যে লোকটা বাড়ির দেয়ালের নল বেয়ে জানলা দিয়ে ঢুকেছে।

রঞ্জন সবই বুঝতে পারলে। কিন্তু মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারলে না। বুঁচো খুব চালাক ছোকরা, সেও নিতান্ত নিরীহের মতো চুপ ক'রে রইল। কিন্তু রঞ্জন নিজের মনে মনে তীব্র কশাঘাত খেতে লাগলো, আর যে অনিষ্ট ওরই দোষে হয়েছে তার যথাসাধ্য প্রতিকারের চেষ্টা করতে লাগলো। সে নিজেই দায়িত্বের ভার নিয়ে তৎক্ষণাৎ সকল বিষয়ের একটা ব্যবস্থা করতে লেগে গেল।

কেউ বিপদে পড়লে পাড়া প্রতিবেশীরা সবাই আত্মীয়তা দেখিয়ে প্রথমটায় খুব হৈ চৈ করে। কিন্তু যেটুকু কাজ প্রকৃত সাহায্য হিসেবে করা দরকার, সেটুকু কষ্ট শেষ পর্যন্ত খুব কম লোকেই

করে। রঞ্জন নিজের ঘাড়ে ঝুঁকি নিয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে অনেক কিছুই ব্যবস্থা করছে দেখে সবাই সরে দাঁড়ালো। রঞ্জনের পক্ষে সেটা আরো ভালোই হলো। নিজের ইচ্ছামতো সে তৎক্ষণাৎ ভালো একজন ডাক্তার ডাকিয়ে আনলে, নার্সের ব্যুরোতে ফোন ক'রে নিজের পয়সায় শিক্ষিত একজন নার্স আনিয়ে রাখলে, আর স্বয়ং উপযাচক হ'য়ে ভদ্রমহিলার সব রকমের সেবায় শুশ্রূষায় লেগে গেল। নিতান্ত আত্মীয়ের মতোই সে দেখাশোনা করতে লাগলো।

মহিলাটির বয়স সম্ভবত পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হ'য়ে গেছে। কোনো ভদ্রবংশের ব্রাহ্মণের ঘরের বিধবা। গায়ের রং খুব ফর্শা, একসময় বেশ সুন্দরী ছিলেন বলেই বোধ হয়। মাথার চুলগুলি প্রায় সমস্তই পেকে গেছে, এখন সেই চুল ঘাড় পর্যন্ত রেখে ছোটো করে ছাঁটা। মহিলাটিকে দেখলে মনে মনে আপনা থেকেই একটা সম্ভ্রম জাগে। কথাবার্তায় খুবই নম্র, খুবই ভদ্র। এই বিপদে পড়েও তিনি বেশি বিচলিত হন নি। আঘাতের যন্ত্রণায় খুব কাতর হ'লেও মুখের হাসিটি তখনো মুখে লেগেই থাকে। ডাক্তার এসে যথাকর্তব্য ক'রে চলে গেল। নার্স নিয়মিত সেবা করতে লাগলো। রঞ্জন দিনের মধ্যে বহুবার এসে পরমাত্মীয়ের মতো ব্যবহার করতে লাগলো। অথচ কত পয়সাকড়ি যে খরচের জন্যে দরকার সে কথা কেউই কিছু বলে না দেখে বৃদ্ধা সমস্তই বুঝতে পারলেন। ঐ প্রিয়দর্শন পাড়ার ছেলেটিই যে এত কাণ্ড করছে সে কথা বুঝতে তাঁর বাকি রইল না।

একদিন তিনি রঞ্জনকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন—"বাবা, এতগুলো টাকা যে অনর্থক এমন ক'রে তুমি নিজের থেকে খরচ ক'রে ফেলছো, এ তো আমি কোনোদিন শোধ দিতে পারবো না!"

রঞ্জন ও কথাটা উড়িয়ে দেবার জন্তে বললে—"না না, খরচ তো এমন কিছু বেশি হয়নি। একটু চেনাশোনা থাকলে ওষুধে ডাক্তারে খুব বেশি পয়সা লাগেনা। আর আপনাকে যে তাও শোধ করতে হবে, এরই বা কি মানে আছে?"

ভদ্রমহিলা একটু হেসে বললেন—"পরের দেনা শোধ করতে হয় বৈ কি বাবা! সারা জীবনটাই যে তাই ক'রে আসছি! শেষকালটায় কি দেনা রেখে তোমাকেই ফাঁকি দিয়ে মরবো?"

"আমাকে অতটা পরই বা ভাবছেন কেন? নিজের ছেলের মতোই মনে করুন না!"

"ওরে বাছা, তুই নেহাৎ ছেলেমানুষ, তোকে আর কত বলি বল। নিজের ছেলের দেনাই যে সব চেয়ে আরো বেশি ক'রে শোধ করতে হয়! অন্য জায়গায় বরং ফাঁকি দেওয়া যায়, কিন্তু ওখানে ফাঁকি দেবার কোনো উপায় নেই। ঘাড়ে জোল দিয়ে আদায় ক'রে নেয়। ছেলের মতো হ'য়ে আর তোমার কাজ নেই বাবা, ছেলের জ্বালা বড়ো জ্বালা। আমি এমনিতেই তোমাকে আশীর্বাদ করছি। তোমার মতো মানুষ আজকালকার দিনে হয় না। আমার যদি হাত দুটো থাকতো তাহলে দুটি বেলা তোমার মাথায় হাত বুলিয়ে আমি আশীর্বাদ করতুম। হাত তো নেই, মুখেই শুধু বলি।"

"থাক্ থাক, ও কথা যেতে দিন। সত্যিই তো, অমন ক'রে দুটো হাতই জখম হ'য়ে পড়ে থাকা, এ বড়ো কষ্ট। নিজের হাতে খাওয়া যায় না, ইচ্ছে করলে একটা মাছি পর্যন্ত তাড়ানো যায় না। আচ্ছা, আপনার হাতে খুব বেশি ব্যথা করে নাকি? ওপর থেকে হাত বুলোলে কি একটু আরাম হয়?"

"না বাবা, ব্যথা কেন করবে? মনটা অসন্তুষ্ট থাকলেই শরীরের

ব্যথাগুলো খুব জোর ক'রে লাগে, নইলে কোনো কিছুই তেমন বোঝা যায় না। আমার তো মনে হয় হাত দুটো কেটেকুটে গিয়ে আমার উপকারই হয়েছে। অনেক পাপ করেছিলাম, এমনি একটা গুরুতর শাস্তি পাবার হয়তো দরকার ছিল।"

"এসব আপনি বাজে কথা বলচেন, আমাকে ভুলিয়ে দেবার জন্যে। নইলে ব্যথা যথেষ্টই হয় বৈকি!"

"মিছে কথা আমি বলিনি বাবা। মনের কষ্টের কাছে এসব কষ্ট কিছুই নয়। মেয়ে মানুষ বড়ো খারাপ জাত, সে তুমি কিছু বুঝতেই পারবে না। মেয়ে মানুষের মনের মধ্যে অনেক রকম পাপের অনেক রকম কষ্ট, সমস্ত একটি একটি করে মনে জমা হ'য়ে থাকে। মনেরই ঝোঁকে এই বোকা মেয়েদের জাত জলে ঝাঁপ দেবার মতো এক একটা কাজ ক'রে ফেলে, তার পরে সারা জীবনের মধ্যে আর সেটাকে কিছুতেই ভুলতে পারে না। তখন তারই কষ্টের কাছে অন্য সব কষ্ট তুচ্ছ হ'য়ে যায়। সে সব কথা আর একদিন তোমায় বলবো। তবে ঐ যে বলছিলাম দেনাশোধের কথা, এও আমার একটা দেনাশোধ হ'য়ে যাচ্ছে। তাও খুব সামান্য, আসলের তুলনায় কিছুই নয়।"

ভদ্রমহিলা নিজের কথা নিয়ে ওর সঙ্গে এমনি বক্‌বক্ করতে খুব ভালোবাসতেন। প্রত্যহই তাঁর জ্বর হচ্ছিল, ওকে দেখলেই জ্বরের ঝোঁকে তিনি অনেক রকমের কথা বলতেন। কথা বলতে পেলে কষ্ট খানিকটা ভুলে থাকেন দেখে রঞ্জন প্রত্যহই তাঁর কাছে কিছুক্ষণ ক'রে বসতো, যা মনে আসে বকে যাবার সুযোগ দিত। কি বলছেন মন দিয়ে ততটা শুনতোও না, আর বোঝবারও চেষ্টা করতো না। কিন্তু নিজে এমন অন্যমনস্ক হ'য়ে থাকলেও তাঁর বাক্যের উচ্ছ্বাস কমে গেলেই আবার যা তা একটা প্রশ্ন করতো। বাক্যস্রোত

আবার নতুন উদ্যমে ছুটতে থাকতো। এতটা বাজে সময় নষ্ট করা ও সহ্য করতো ভালো লাগার জন্যে নয়, অনেকটা কর্তব্যেরই খাতিরে।

দুপুর বেলাটায় যখন চাকর বাকরেরা কিছুক্ষণের জন্যে সরে পড়ে, আর নার্স মেয়েটিও খেতে গিয়ে ফিরে আসতে দেরী করে, রঞ্জন প্রায়ই সেই সময়টিতে ভদ্রমহিলার কাছে প্রত্যহ একবার বসতে যায়। তিনি একা শুয়ে ছটফট করছেন দেখে ও তাঁকে নানা কথা বকাতে শুরু করে।

এমনি একদিন দুপুরে সে ওঁর কাছে বসে বললে—"সেদিন যে বলছিলেন আপনার কোন দেনাশোধের কথা আমায় শোনাবেন, সেইটে আজ আবার গোড়া থেকে বলুন তো শুনি।"

"পেটের ছেলের দেনাশোধের কথাই বলছিলুম বাবা। ছেলের দেনা বড়ো ভয়ানক দেনা, কোনো কিছু দিয়ে তার শোধ হয় না। লোকে যে সারাজীবন খেটে বিষয়-সম্পত্তি ছেলেকে দিয়ে যায়, তাতেই কি তার আশা মেটে? মনে হয় কিছুই দেওয়া হলো না। আবার, ছেলেকে যদি কোনো একটা কষ্ট দেওয়া হয় তবে সারাজীবন ধরে হাজার জ্বলে পুড়ে মরলেও কখনো তার আপশোষের শেষ হয় না। ছেলে হলো এমনি মারাত্মক পাওনাদার। ছেলের দেনা শোধ করা কি সহজ?"

"কিন্তু আপনার তো শুনতে পাই কোনো ছেলেপুলেই হয়নি। তাহলে আর আপনি ও কথা বলেন কেন?"

"হয়েছিল বৈকি বাবা, নইলে কি আর শুধু শুধু এত কথা বলছি। এক দিনের জন্যে যে আমার একটা ছেলে হয়েছিল, একটি দিন মাত্র সে আমার কোলে ছিল। তারই দেনা আজও পর্যন্ত আমার শোধ হলো না।"

"সেই এক দিনের ছেলের জন্যে আপনি এখনও এত ক'রে কাতর হন? মরে গেল বুঝি সেই ছেলে?"

"না বাবা, মরলে তো ল্যাঠাই চুকে যেত। তখন না মরে উল্টে সে আমাকেই মেরে গেল।"

"তাই নাকি? আপনাকে মেরে গেল কি রকম?"

"শুনবে তুমি সে সব কথা? আজ তোমাকেই তাহ'লে বলি, এতদিন কাউকে কখনো বলিনি। পঁচিশ ছাব্বিশ বছর কেটে গেল, কিন্তু এখনো মনে হয় সে যেন আজকের কথা। তবে বলি শোনো। তোমার কাছে আর লজ্জা ক'রে আমার কি হবে! সময়মতো আমার বিয়েও হয়েছিল, কপালও পুড়েছিল। বেশ একরকম নিশ্চিন্তেই ছিলাম। কিন্তু অতোটা বয়সে যে আমার ছেলে হ'তে পারে এমন কথা স্বপ্নেও ভাবিনি। ভগবানের মরজি, হঠাৎ আমার পেটে একটা ছেলে হলো। কি আর করি, যতটা পারি চেপেচুপে রইলাম। মনে করলাম যে আগে তো ছেলেটাই জন্মাক, তার পর না হয় দেখা যাবে। ছেলে হলো একটি পদ্মফুলের মতো। তাকে দেখেই এমন মায়া জন্মালো যে সারাদিন কোল থেকে একবারও নামাতে পারলুম না। তারপর সন্ধ্যার সময় মুস্তাফা সাহেব এসে একেবারেই বলে বসলেন যে তা হবেনা, ঐ ছেলেটি আমার চাই।"

"কে মুস্তাফা সাহেব?"

"সে কি তুমি চিনতে পারবে বাবা? তিনি এখন বেঁচে নেই। মানুষটা একদিকে খুবই ভালো ছিলেন। তখন তিনি একটা বায়স্কোপের ব্যবসা খুলেছিলেন, আমার সঙ্গে তাঁর আধাআধি বখরা ছিল। তার পর শোনোনা কি হলো বলি। আমিও কিছুতে ছেলেকে ছাড়বো না, আর তিনিও জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে যাবেন

তাঁর নিজের ঘরে কোনো ছেলেপুলে হয়নি কিনা! বললেন, এ ছেলে নিয়ে তুমি তো মানুষ করতে পারবে না, আমাকে দিয়ে দাও। কিন্তু দাও বললেই কি আমি অমনি পেটের ছেলেটাকে দিয়ে দিতে পারি? কিছুতেই দিচ্ছিনা দেখে শেষে তিনি খুব জোর করতে লাগলেন। আমিও মরিয়া হ'য়ে জোর ক'রে তাকে আঁকড়ে ধরে রইলাম। খুব রাগ ক'রে কোল থেকে যখন নিতান্তই কেড়ে নিচ্ছেন, তখন আমিও রাগের মাথায় জিদ ক'রে ছেলের হাতের আঙুলটা কামড়ে ধরলাম। তবুও তিনি ছেলেকে আমার হাত থেকে টেনে ছিনিয়ে নিলেন। কচি ছেলের নরম তুলতুলে আঙুল, কিন্তু আমার তখন সে সব জ্ঞান ছিল না। দাঁতের চাপে কেমন ক'রে তার আঙুলটা আধখানা হ'য়ে কেটে একটা টুকরো আমার মুখের মধ্যেই রয়ে গেল। মুস্তাফা সাহেব সেই আঙুল-কাটা ছেলেকে তখনই নিয়ে চলে গেলেন। তার পর থেকে তিনি আর আমার সঙ্গে দেখাই করলেন না। ছেলে মরে গেছে বলে একদিন আমার বখ্‌রার টাকাটা পর্যন্ত লোক দিয়ে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু সেই যে আমার নিজের ছেলের আঙুল আমি নিজেই দাঁত দিয়ে কেটে নিয়েছি, সে কথা আর কিছুতে ভুলতে পারলুম না। মুস্তাফা সাহেব অনেক কাল মারা গেছেন, সে ছেলেও কবে মারা গেছে তার ঠিক নেই। কিন্তু এখনও আমি সেই আপশোষে মরি। রাগের মাথায় কেন যে মরতে দাঁত দিয়ে কামড়ে ধরলাম, তার শাস্তি এখনও ভোগ করছি। সেইজন্যেই তো বলি, এই যে আমার হাত দুটো কেটেকুটে গেছে, এ ভালোই হয়েছে। ভগবান এমনি ক'রে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে দিলেন।"

ভদ্রমহিলার এই কাহিনী শুনতে শুনতে রঞ্জন একেবারে স্তম্ভিত হ'য়ে

গেল। খানিকক্ষণ পর্যন্ত সে কোনো কথাই বলতে পারলে না। তার পরে ধীরে ধীরে নিজের হাতখানা দেখিয়ে তাঁকে বললে—"এই দেখুন, আমারও হাতের একটা আঙুল কাটা।"

"কেমন ক'রে কাটলো?"

"তা তো আমি জানিনা, শুনেছি জন্মের সময় থেকেই আঙুলটা আমার কাটা। আর জন্মাবধি আমি বাগমারিতে একজন সিনেমা-ওয়ালা মুস্তাফা সাহেবের কাছেই মানুষ হয়েছি। আমি এতকাল জানতুম যে আমি তাঁরই ছেলে।"

ভদ্রমহিলা সেই শয্যাগত অবস্থাতেই ধড়মড় ক'রে উঠে বসলেন। পাগলের মতো হ'য়ে বলতে লাগলেন—"কৈ দেখি দেখি! ঐ যে ঠিক কথাই তো, বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটাই তো বটে! কৈ দেখি দেখি! তোর মুখখানা একবার দেখি!"

ব্যাণ্ডেজ করা সেই ক্ষতবিক্ষত হাত দুখানি তুলে ভদ্রমহিলা পাগলের মতো হ'য়ে ওর মুখখানা ধরতে যান, অসমর্থ হ'য়ে থরথর ক'রে কেবল কাঁপতে থাকেন। রঞ্জন তাড়াতাড়ি হাত দুখানা ধরে ফেললে। অনেক কষ্টে তাঁকে আবার শুইয়ে দেয়।

ঐ ভদ্রমহিলাই তাহ'লে ওর আসল গর্ভধারিণী মা! সন্দেহ করবার আর উপায় নেই, অথচ এ কথা বিশ্বাসও হ'তে চায় না। লটারিতে লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে, এমনি একটা টেলিগ্রাম পেলে যেমন আর সন্দেহের কোনো কারণ থাকে না, অথচ বিশ্বাসও হ'তে চায় না, অনেকটা যেন সেইরকম। ও বাস্তবিকই তবে হিন্দু মায়ের হিন্দু সন্তান, তাতে আর কিছুই ভুল নেই?

ভদ্রমহিলার চোখ দিয়ে কেবল ঝরঝর ক'রে অশ্রু ঝরতে থাকে।

"ওরে আমার মাণিক, আমার সোনা, আমার বুকের ওপর মাথাটা

তোর একবার নিয়ে আয় বাবা, আমার বুকটা তবু একটু জুড়িয়ে যাক।”

“আপনি অমন করবেন না। একটু সুস্থির হোন, নইলে ব্যাণ্ডেজ ট্যাণ্ডেজ সব নষ্ট হ'য়ে যাবে।”

“আর আমার মরলেও কোনো দুঃখ নেইরে, এবার এখনই আমার মরণ হোক না। আর আমার প্রাণের ভাবনাটা কিসের? কোলের সেই হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়েছি, আর আমার বাঁচবারই বা কি দরকার? বাঁচলেই তো আবার তোকে হারাতে হবে?”

“না না, আমি আপনার কাছেই তো বরাবর রয়েছি। আপনি চুপ ক'রে এখন শুয়ে থাকুন।”

“চুপ ক'রে থাকতে আমি পারছিনা যে বাবা! দেখলি তো ভগবানের কি লীলা! যেমনি আমার হাত দুখানা কাটা গেল, অমনি তোর আঙুল কেটে নেবার সেই দেনাশোধ হলো, আর অমনি তোকে তিনি আমায় ফিরিয়ে দিলেন। আর আমি চুপ ক'রে থাকবোনা, অনেক কাল চুপ ক'রে কাটিয়েছি। ওরে বাবা, তুই যতখানি বড়ো হ'য়ে উঠেছিস, আমার বুকের ভেতরকার আপশোষটাও যে ততখানি বড়ো হ'য়ে উঠেছিল রে! আর আমি এই চোখ দুটো কিছুতে বোজাবো না। কি জানি, ঘুমিয়ে পড়লে আবার যদি জেগে উঠে তোকে আর না দেখতে পাই? আমি এমনি ক'রে দিনরাত চেয়েই থাকবো, এবার থেকে শুধু চেয়েই থাকবো।”

রঞ্জন ওঁকে শান্ত করবার মতো আর কোনো কথাই খুঁজে পায় না। নিজের মনটাই তার উদ্বেল হ'য়ে উঠেছে, অপরকে সে শান্ত করবে কেমন ক'রে? বৃদ্ধাও কিছুতেই ওকে চোখের আড়াল করতে চায় না। দিনরাত কেবল ওকে খোঁজে, কেবলই ওকে দেখতে চায়।

আনন্দের আতিশয্যে তার পর থেকেই ভদ্রমহিলার মাথা খারাপের লক্ষণ দেখা দিল। অনবরত তিনি যা তা আবোলতাবোল বকতে শুরু করলেন। ক্ষত ঘাগুলো সেপটিক হ'য়ে রক্তদুষ্টি ঘটবার আশঙ্কা ডাক্তারেরা আগের থেকেই করছিল। তারই সমস্ত লক্ষণ বেশ স্পষ্টভাবে দেখা যেতে লাগলো। জ্বর খুব বেড়ে গেল, চোখ দুটো রক্তবর্ণ হ'য়ে উঠলো। তিনি কাউকে আর আলাদা মানুষ ব'লে চিনতেই পারতেন না, সবাইকেই মনে করতেন তাঁর ছেলে। অনেক রকমের চিকিৎসা সত্বেও দুদিন বাদেই তিনি মারা গেলেন। মরবার সময় অজ্ঞান অবস্থাতেই ছিলেন, কিন্তু মুখখানা দেখে মনে হলো যেন অনেক কালের হারানো রত্ন খুঁজে পেয়ে তিনি হাসতে হাসতে পরম সুখে ঘুমিয়ে পড়লেন। রঞ্জন নিজে কাঁধ দিয়ে গঙ্গার ঘাটে নিয়ে গিয়ে নিজেই মুখে আগুন দিয়ে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ক'রে এলো।

যথাকালে খবরের কাগজে এই খবরটা অতিরঞ্জিত হ'য়ে বেরিয়ে গেল। লোকে তাই পড়ে জানলে যে কলকাতা শহরের অমুক পাড়াতে দিনে দুপুরে জনৈক ব্রাহ্মণ বিধবার বাড়িতে কয়েকজন দুর্বৃত্ত ঢুকে তাঁকে আক্রমণ করে। পাড়ার লোকেরা অনুমান করে যে তারা কোনো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের লোক। অসহায় বিধবার সমস্ত সম্পত্তি লুট ক'রে দুর্বৃত্তেরা তার হাত পা বেঁধে সাংঘাতিক রকমে আহত ক'রে চলে যায়, সেই আঘাতের ফলে তাঁর মৃত্যু ঘটে। এমন পৈশাচিক ঘটনা আজকাল প্রায়ই ঘটছে, এর কি কোনো প্রতিকার নেই?

বারো

মাত্র কয়েকটা দিন রঞ্জন নির্বাকের মতো হ'য়ে রইল। ধীরা বুঝতেই পারলে না যে কি হয়েছে। পরেশও কিছু বুঝতে পারলে না। ওরা ভালো ক'রে এই সাময়িক পরিবর্তনটা বুঝতে পারবার আগেই কিন্তু দেখতে দেখতে অন্য দিক দিয়ে রঞ্জনের জীবনে একটা পরিবর্তন ঘটলো। হঠাৎ কেমন ক'রে সে ঐ পাড়ার বাসিন্দাদের মধ্যে মাতব্বর হ'য়ে সমাজ-হিতৈষণার কাজে নেমে পড়লো।

এর অবশ্য যথেষ্টই কারণ ছিল। পাড়ার লোকেরা সকলেই দেখেছে যে কি নিঃস্বার্থ অধ্যবসায়ের সঙ্গে রঞ্জন শেষ পর্যন্ত ঐ বিধবা স্ত্রীলোকটির সেবা করেছে। নিজের গাঁঠ থেকে অনেক পয়সা খরচ ক'রে সে ভালো রকমের চিকিৎসা আর শুশ্রূষার কাজ বরাবর চালিয়ে গেছে, অথচ পাড়ার কারো কাছে সাহায্যের জন্যে একবারও হাত পাতেনি। বিধবাটি হয়তো সেইজন্যেই মোহে প'ড়ে কিংবা দেনাশোধ হিসেবে মরবার আগে বাড়িখানা ওর নামেই লিখে দিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন মুসলমানপ্রধান ভিন্ন ভিন্ন পাড়া থেকে পলাতকেরা দলে দলে এই পাড়াতে এসে আশ্রয় খুঁজে বেড়াতে লাগলো, তখন রঞ্জন নিজের থেকে পাড়ার লোকদের ডেকে বললে যে ঐ বাড়িতেই তাদের জন্যে একটা পরিত্রাণ আশ্রম খোলা হোক। পাড়ার লোকেরা প্রত্যেকে নিজেদের সাধ্যমত কিছু কিছু চাল ডাল নুন তেল সংগ্রহ ক'রে দিন, বাকি যা কিছু লাগবে তা ও নিজেই প্রত্যহ দিয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, হিন্দু আহত আর পীড়িত লোকদের জন্যে সেখানে একটা স্বতন্ত্র সেবা কেন্দ্রও খোলা হলো, আর পরেশকে প্রাথমিক ব্যবস্থা করবার

ভার দিয়ে সেখানে সব সময়ের জন্যে বসিয়ে দেওয়া হলো। পাড়ার একজন নামজাদা ডাক্তার, যিনি ঐ ভদ্রমহিলার চিকিৎসা করেছিলেন, তিনিই প্রত্যহ দুবেলা তাদের তদারক ক'রে যেতেন। এরও খরচ পত্র যা কিছু সব রঞ্জনই চালাতো। এতে পাড়ার সবাই ওর খুব সুখ্যাতি ক'রে বলতে লাগলো যে ভদ্রলোকের মনটাও উদার, আর হাতেও বেশ কিছু পয়সা আছে।

রঞ্জন এখন এই সব কাজ করবার জন্য খুব ব্যগ্র। তার মনে আর কোনো দ্বিধা নেই, দ্বন্দ্ব নেই, নিজের সঙ্গে নিজের লুকোচুরি করবার সংকোচ নেই। সে যে একজন খাঁটি হিন্দু, একথা বলতে আর কিছু বাধা নেই। শুধু হিন্দু নয়, আরো বেশি গর্বের কথা এই যে সে ব্রাহ্মণের সন্তান। ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভেই ও জন্মেছে, ব্রাহ্মণের রক্তই ওর শরীরে প্রবাহিত হচ্ছে। ও হিন্দু, ও হিন্দু, এখন ও সর্বতোভাবে হিন্দু। এটা ও তাই বাল্যকাল থেকে একটা সহজ প্রেরণার দ্বারাই অনুভব করেছিল। মনে মনে গোড়া থেকে ও সেই কারণেই অমন ক'রে হিন্দুদের মধ্যে মিশতে চেয়েছিল।

তবে মায়ের পরিচয় পেয়ে সেই সময় ওর বাপের কথাটা গোলমালে আর জিজ্ঞাসা ক'রে নেওয়া হয়নি। ওর তখন নানা কারণে অতোটা খেয়ালই ছিল না। ধরে নেওয়া যেতে পারে যে তিনি সম্ভবত ব্রাহ্মণই ছিলেন। না হ'লেও অন্তত হিন্দু ছিলেন নিশ্চয়। নাই বা হলো রঞ্জন শ্রেণীগোত্র মেলানো নিখুঁত সামাজিক বিবাহের বৈধ সন্তান। সামাজিক বিবাহের যত কূটকচালে ব্যবস্থা নিয়ে অতিরিক্ত শুচিবাইটাকে ও নিজেও মোটে গ্রাহ্য করে না। বিয়ে সম্বন্ধে বৈধতা নিয়ে এতটা কড়াকড়ি কিছুকাল পরে কিছুই আর থাকবে না। বিধবাদের দ্বিতীয় স্বামী নিতেও বাধা থাকবে না।

হিন্দু বাপ মায়ের ছেলে হলেই সে হলো হিন্দু। এর মধ্যে কোনো গোলমাল নেই। মনটা প্রথমে একটু খুঁৎখুঁৎ করেছিল বটে কিন্তু সেটুকু এই বলে সে সারিয়ে নিলে।

কিন্তু মুস্তাফা সাহেবের কতখানি অন্যায়! নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্যে হিন্দুর ছেলেকে জোর ক'রে কেড়ে নিয়ে নিজের ছেলে বলেই চালিয়ে দিলেন? তাতে যে তার কতটা সর্বনাশ করা হচ্ছে সেটা একবারও ভেবে দেখলেন না? পবিত্র ব্রাহ্মণের সন্তানকে আজীবন লোকের ঘৃণার পাত্র করতে একটু দ্বিধা হলো না, এমনই স্বার্থপর ছিলেন তিনি। মানুষ যে ভেতরে ভেতরে কতখানি হীন হয়, তাকে বাইরের থেকে কিছুই চেনা যায় না। অথচ সেই মুস্তাফা সাহেবকে রঞ্জন এক কালে নিজের বাপ বলে কতই ভক্তিশ্রদ্ধা করতো!

যাই হোক, রঞ্জন এখন সম্পূর্ণ আত্মস্থ, প্রশান্তচিত্ত। এমন একটা মানসিক মুক্তি ও জীবনে কখনো পায়নি। মনের অতি গভীর গোপন মর্মস্থলেও ও এখন সম্পূর্ণ হ'য়ে গেছে হিন্দু নামাঙ্কিত। যে হিন্দুত্বকে ও এতদিন পর্যন্ত আপন ক'রে নিলেও তবু কতকটা সসংকোচেই বরণ করতে বাধ্য হয়েছিল, তাকে ও এখন পরম নিঃসংকোচে আরো নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন ক'রে নিলে। এ পাড়ার লোকেরা সবাই ওর আপন জন। যারা এসে পরিত্রাণ আশ্রমে আশ্রয় নিয়েছে তারাও এখন ওর নিতান্ত আপন জন। তাদের প্রতি ওর অনেক কর্তব্য রয়েছে। তাদের মধ্যে থেকে ওকে অনেক কাজ করতে হবে। তাদের উন্নতির জন্যে ও নিজেকে মনেপ্রাণে উৎসর্গ করবে।

মীরাকে নিয়ে সর্বক্ষণ আত্মহারা হ'য়ে থাকার নেশাটা ইতিমধ্যে কেটে গেছে। মীরার সম্বন্ধে ওর মোহটা এখন অনেকখানি শিথিল এসেছে। অবশ্য বিতৃষ্ণাও নেই, তাচ্ছিল্যও নেই, অবহেলাও নেই। সে সব

কিছু নয়। তবে সেই উগ্র আকুলতা, সেই উন্মাদনা আর এখন আপনা থেকেই ততটা নেই। প্রথম প্রেমের যে সমস্ত আঁকাবাঁকা লুকোচুরি লীলা ওদের মধ্যে প্রত্যহই চলতে থাকতো, সেগুলো এখন আপনা থেকেই অনেকটা বিরল হ'য়ে এসেছে। ধীরাও তার জন্যে কোনো ক্ষোভ করেনা, সেও নিজের তরফ থেকে এইটেই স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছে। আরও একটা কথা, যা হয়তো রঞ্জন নিজেই ভালো ক'রে ভেবে দেখেনি। যতদিন পর্যন্ত সে মনে মনে কিছুমাত্রও অহিন্দু ছিল, ততদিন ধীরার সম্পর্কে সেই আগ্রহটা তার কিছুতেই যেন মিটছিল না। ধীরাকে কাছে পেয়েও যেন তবু কিছুতে তার সবটা পাওয়া তখনও পর্যন্ত নিঃশেষ হচ্ছিল না। কিন্তু যেমনি ওর কাছে প্রমাণ হ'য়ে গেল যে ও হিন্দু, ওর মধ্যে একটুও কিছু অহিন্দুর লুকোনো নেই, অমনি ওর সেই সীমাহীন প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অগোচরে কোথায় একটা ছেদ পড়ে গেল। ও যে বাস্তবিক হিন্দু, এই কথাটুকু জানবার পর থেকেই যেন ধীরার সম্বন্ধে একটা ন্যায্য অধিকারবোধ ওর এসে গেল। অতঃপর আর তাই নিয়ে নতুনতরো কিছু করবার নেই। ধীরাও তার পড়াশোনা, সেলাই বোনা, আর যমুনা দিদিকে নিয়ে চমৎকার সময় কাটাচ্ছে। রঞ্জন এবার থেকে পরম নিশ্চিন্তে বিভিন্ন রকম একটা বৃহত্তর কাজের আসরে নেমে পড়লো।

হিন্দুত্বের জয়গান আর প্রচার নিয়ে সে মেতে উঠলো। গৃহরিক্ত হিন্দুদের পরিত্রাণ আর নিরাপদ স্থানে গৃহস্থাপনা ক'রে দেওয়া নিয়ে স্থানে স্থানে সভা আহূত হতে লাগলো। রঞ্জন এখন অকপট উৎসাহের সঙ্গে সেই সব সভাতে ওজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগলো। সে বললে—"হিন্দু ধর্ম আর হিন্দুত্ব হলো দুটো স্বতন্ত্র জিনিস। দুটোকে একসাথে করলে খুব ভুল হবে। হিন্দু ধর্মের কথা অবশ্য বিশেষ কিছুই

জানিনা, তাই সে সম্বন্ধে আমার বলবার কোনো অধিকার নেই। যাঁরা ধর্ম নিয়ে বিশেষ রকমের চর্চা ক'রে থাকেন, তাঁরাই সে কথা বলতে পারবেন। কিন্তু এই হিন্দুত্ব সম্বন্ধে অবশ্যই আমি কিছু বলতে পারি। তার কারণ হিন্দুত্বের বনিয়াদের শক্ত মাটির ওপর দাঁড়িয়ে থেকেই এতাবৎ আমি দিন কাটাচ্ছি। এমনি আজকাল অনেকেই ঠিক আমার মতো হিন্দু। তারা সনাতন হিন্দুধর্মের হয়তো কোনো ধারই ধারে না, কিন্তু তবুও তারা হিন্দু। এই হিন্দুত্ব জিনিসটা তাহ'লে কি? এটা আর কিছুই নয়, আমাদের বহুকালের সঞ্চিত প্রবণতা অনুসারে আমাদের পূর্বপুরুষদের পূর্বাপর উদাহরণ অনুসারে, নির্দিষ্ট ধরণের সুখ দুঃখের ভেতর দিয়ে দৈনিক জীবনটাকে স্বচ্ছন্দে যাপন ক'রে যাবার একটা চলন্ত প্রণালী। এ ছাড়া আর কিছুই নয়। সকল দেশের সকল জাতের মানুষের মধ্যেই এমনি এক একটা নিজস্ব প্রণালী ঠিক করা ছিল। সকলেই ইতিমধ্যে সুযোগ আর সুবিধা বুঝে তাদের রীতিনীতির অনেক অদলবদল ক'রে ফেলেছে। কিন্তু আমরা আমাদের রীতিনীতিকে এখনও পর্যন্ত অনেকটা একই ভাবে রক্ষা ক'রে এসেছি। কেন আমরা এতটা রক্ষণশীলই বা হলুম? তার কারণ আমরা দেখেছি যে এই হিন্দুত্ব নামক প্রণালীটাই আমাদের পক্ষে সবচেয়ে শ্রেয়, একে রক্ষা ক'রে যেতে পারলে আমাদের শেষ পর্যন্ত কোনো মার নেই। আমরা দেখেছি যে এইতেই আমাদের জাতের আসল বিশিষ্টতা বজায় থাকে, আর সেই বিশিষ্টতাটুকুর ভেতর থেকে তারই দরুণ আমাদের মধ্যে এমন কত কত মহৎপ্রাণ আর মহাপুরুষ জন্মায়, যেমন কখনো অন্য কোনো দেশে কোনো জাতের মধ্যেই দেখা যায় না। আজ হয়তো আমরা সবচেয়ে হীন হ'য়ে গেছি, সকলের চেয়ে পদদলিত হয়ে পিছনে পড়ে আছি। কিন্তু একদিন এমন

আসছে যখন দেখা যাবে যে আমরাই সকলের চেয়ে জিতেছি। হিন্দুরা অনেক রকমের গোঁড়ামি দিয়ে নিজেদের গণ্ডীটাকে সংকীর্ণ ক'রে রেখেছে বটে, কিন্তু একটা জায়গাতে তারা একটুও সংকীর্ণ নয়। সেটা হলো ত্যাগে। স্বার্থকে ত্যাগ ক'রে এরা পরার্থকে দেখে, বর্তমান সুখকে ত্যাগ ক'রে ভবিষ্যতের আনন্দকেই দেখে। আমাদের হিন্দুদের আসল গৌরব ঠিক এইখানে। এই নিয়েই এদের যত কিছু শিক্ষা দীক্ষা আর গোঁড়ামি। এতেই হলো এদের আসল স্বাতন্ত্র্য। জগতের সব জাতই বলে লেঙ্গে লেঙ্গে, কেবল এরাই বলে দেঙ্গে দেঙ্গে। প্রাপ্তির কোনো সুখকে কিছুতেই এরা শ্রেয় ব'লে স্বীকার করবে না। এরা দেখেছে যে স্বার্থপ্রধান সুখের দিকে লক্ষ্য রেখে সেই সুখ মেলে বটে, কিন্তু তাতেও কোনো আনন্দ নেই। যেটা বাস্তবিক কাম্য সেটা ওর চেয়ে অনেক উঁচুদরের জিনিস। এরা তাই সুখের চেয়ে অন্য কিছু চায়। এরা বলে যে আজকের সুখটা সুখই নয়, যদি কালকের জন্যে এর চেয়ে আরো কিছু বড়ো রকমের সম্ভাবনা না থাকে। যে সুখের সম্পদ আজই মাত্র থেকে কাল ফুরিয়ে যায়, তাকে এরা তাচ্ছিল্য করেই চলে। সুখের চেয়েও বৃহত্তর যে তৃপ্তি, তারই আদর্শ নিয়ে হিন্দুদের মূল ভিত্তিটা গড়ে উঠেছে। সেইজন্যে এরা সহস্র রকমে মার খেলেও তবু কিছুতেই দমে না। এরা জানে যে এগুলো কেবল আজকের, কালকের কখনই নয়। এরা জানে যে আজ যতই হার হোক, জগতের ভবিষ্যতের জয়মালা কাল এদের সেই ত্যাগের আদর্শই জিতে নেবে। এমন অদ্ভুত ধরণের হিন্দুকে যেমন ক'রেই হোক আমাদের বাঁচিয়ে রাখা চাই। অপর জাতের মতো স্বার্থপরতা করতে শেখা আমাদের ধাতে সইবে না। সে সব শিক্ষা আপনারা ভুলে যান। স্বার্থের ভিতর দিয়ে নয়,

হিন্দুত্বকে আর হিন্দু জাতকে তার ত্যাগের ভিতর দিয়েই রক্ষা করুন।”

আরো কত কথাই রঞ্জন বলে। ভাষায় তার ওজস্বিতা, ভঙ্গীতে সুগভীর আন্তরিকতা। হিন্দুত্বের এই গভীরতর ব্যাখ্যা শুনে সবাই ধন্য ধন্য করতে থাকে। যখন সে শান্ত হয় তখন চারিদিক থেকে ঘন ঘন হাততালি পড়ে। সেই সভাতে তখনই অনেক চাঁদা উঠে যায়। পরিত্রাণের কাজ আরো বেশি বেশি বেড়ে উঠতে থাকে।

লোকে বলে, এ পাড়া আমাদের হিন্দুস্থান হ'য়ে গেছে। কোনো মুসলমানকে আর এখানে এসে মাথা গলাতে হচ্ছে না। হিন্দু ছাড়া আর কাউকে এর সীমানায় ঢুকতে হবেনা। বলো ভাই, আমাদের হিন্দুপাড়ার জয়, আমাদের পাড়ার রঞ্জন বাবুর জয়। আমরা এবার দেখিয়ে দেবো যে আমরাও নিজেদের বাঁচাতে জানি, স্বাতন্ত্র্যের দাবী করতে আমরাও জানি। ওরাও যেমন উঠে পড়ে লেগেছে, আমরাও তেমনি এবার উঠে পড়ে লাগবো।

রঞ্জন অমনি জিভ কেটে বলে—“না না, এ কি কথা আপনারা বলছেন? আমাদের ছেড়ে ওরা যাবে কোথায়? এ পাড়ায় না থাকে, অন্য পাড়ায় তো থাকবে। বৃহত্তর যে হিন্দুস্থান, এই যে চিরকালের হিন্দুস্থান, এখানে কি সকল রকম জাতকেই আমরা অবাধে ঢুকতে দিই নি? তারি কি কোনো একটা সার্থকতা নেই? কত যে বিদেশীকে আমরা আমাদের মধ্যে আসতে দিয়েছি, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের পর্যন্ত আমরা আজ আপন ক'রে নিয়েছি, তবে এখন নিজেদেরই পাশের পুরোনো বাসিন্দা মুসলমানের প্রতি এমন বিদ্বেষ কেন? বিদ্বেষই যে আরো বিদ্বেষ আনে, তা কি আপনারা জানেন না? ওরা সম্প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ করছে বলে আমরাও তাই করবো? আমাদের হিন্দুত্বের মধ্যে বিদ্বেষ

ঢোকবার যে কোনো রাস্তাই রাখা হয়নি! ওরা বিদ্বেষ করুক, কিন্তু আমরা করবো ক্ষমা। ওরা অন্যায় করুক, আমরা করবো সেটা অগ্রাহ্য। ইংরেজও তো এক সময় দেশের বুকে বসে আমাদের ওপর কত রকম অত্যাচারই করেছে, তবু আজ তাকে আমরা বন্ধুভাবে মেনে নিচ্ছি কেমন ক'রে? আমাদের এই আসমুদ্র-হিমাচল অতিথিবৎসল হিন্দুস্থান থেকে তো কিছুতেই ঐ সব মুসলমানদের তাড়িয়ে দেওয়া চলবে না। আমাদের ঘরের পাশেই ওদের থাকবার জায়গা দিতে হবে। কথাটা আপনারা বুঝে দেখুন, ঘরের পাশের পুরোনো চেনা লোকেদের সঙ্গে কতদিন বিদ্বেষ ক'রে কাটাবেন? ওরা দেশকে ভাগ ক'রে নিজেদের এলাকা আলাদা ক'রে নিতে চাইছে। যদিও তাই ওদের এখন দেওয়া হয়, সেটা কি চিরকাল বজায় থাকবে? একদিন ওরা নিজেদের ভুল বুঝে আবার আমাদের সঙ্গেই এক হ'য়ে মিলে যাবে। এটা একদিন হ'তেই হবে। ওরা যে এতকাল জোর ক'রে আমাদের লোকজনদের ধ'রে মুসলমান ক'রেছে, এবার কিন্তু ওরা নিজেরাই আমাদের মধ্যে এসে হিন্দু হ'য়ে যাবে। যদিও নামে থাকবে মুসলমান, কিন্তু কাজে হ'য়ে যাবে হিন্দু। এ হ'তেই হবে। হিন্দুস্থানের মাটিতেই রয়েছে এই রকমের হিন্দু করাবার গুণ। ক্রমে ক্রমে এখানে সকলকেই হ'য়ে যেতে হবে এমনি একই রকমের হিন্দু। এই হিন্দুস্থানের মানুষদের কেবল এক রকমেরই প্রকৃতি হ'তে পারে, আর তারই নাম হলো হিন্দুত্ব। ওটা একটা ধর্ম নয়। আপনারা দেখছেন না, হাজার কাটাকাটি করলেও ওরা এর মধ্যেই কতখানি হিন্দু ভাবাপন্ন হ'য়ে গেছে? ওরা আমাদের মতোই পীরের দরগায় গিয়ে মানত ক'রে মাথা কোটে, ওদের মেয়েরা কেউ কেউ মাথায় সিঁদুর পর্যন্ত লাগিয়ে দেয়। কোনো কোনো

মুসলমান স্বইচ্ছায় মাছমাংস খাওয়াটুকু পর্যন্ত ছেড়ে দেয়। এখনই এই, বাইরের বিদ্বেষটা মিটে গেলে আরো অনেক বেশি হবে। রাগের উল্টোপিঠেই থাকে অনুরাগ, সেটা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। এখন ওদের যত বেশি রাগ দেখছেন, এর পরে তত বেশি অনুরাগ দেখবেন। আপনারা হয়তো জানেন না, ওরা ভেতরে ভেতরে আমাদের এই ধরণের তৃপ্তিপ্রিয় হিন্দুত্বকে খুবই ভালোবাসে। মহা আগ্রহ ক'রে হিন্দুদের মতোই ওরা থাকতে চায়। সেটা আমরা হ'তে দিইনা ব'লেই ওদের আসে রাগ। হিন্দুস্থানের হিন্দুত্ব যদি গোঁড়ামি ছেড়ে সকলকে কোল বাড়িয়ে দেয়, তাহ'লে তখনই ওরা ছুটে আসবে।"

লোকে এবার ওর অগোচরে মুখ বাঁকায়, হাসে। বলে, লোকটার মন ভালো, কিন্তু তাহ'লে কি হয়, একটা বদ্ধ পাগল। মোটেই প্র্যাকটিক্যাল নয়। ভূতকে দিয়ে ও রাম নাম বলাতে চায়। বোধ হয় গান্ধী মহারাজের চেলা। যা চোখে দেখা যাচ্ছে তারও একটা উল্টো মানে ক'রে বসে। তা হোক, ঐ পাগলকে নিয়েই আমাদের কাজ চালাতে হবে। ওর বাড়িখানা খুব কাজে লাগছে, পয়সাও দেদার খরচ করছে, লোকটা এদিকে তো মন্দ নয়। ওকে চটিয়ে দিলে চলবে না, যা বলে তাই চুপচাপ শুনে যেতে হবে। বলুক না যা খুশি!

কোথা থেকে জানতে পেরে ঐ সভাতে নীরা আর রূপেন এক সঙ্গে এসে জুটেছিল। তারা এক কোণে বসে আগাগোড়া ওর ঐ বক্তৃতাটা শুনলে। সভা ভাঙবার পরে ও বাইরে বেরিয়ে যেতেই নীরা ওর কাছে এসে হাজির হলো। বললে—"আপনি এতখানি ভীষণ হিন্দু হয়ে গেলেন কবের থেকে?"

"কেন, আমি তো বরাবরই হিন্দু ছিলাম! এতদিনেও সেটা তুমি জানতে না?"

"জানতুম বৈকি! কিন্তু হিন্দুদের এমন একজন নেতা ছিলেন বলে তো কখনো জানতুম না!"

"কে বললে নেতা? লোকের কাছে খানিকটা বক্তৃতা করলেই কি নেতা হয়? এতখানি ধৃষ্টতা আমার নেই। ওরা কিছু বলতে বলে, আমার যা সত্যি ব'লে মনে হয় তাই আমি বলি। এটা তো আমার কর্তব্য।"

"তাই বলে সমস্ত মুসলমানদেরও আপনি দলে টেনে এনে নিজের মতো হিন্দু বানিয়ে নিতে চান? এটাও কি আপনার একটা কর্তব্যের মধ্যে?"

"তা চাইবো কেন? ওদের মনটাও হিন্দুর মতো সমান ধরণের হোক, এই আমি চাই।"

"কোন ধরণটা ওদের পক্ষে ভালো, সেটা আপনার চেয়েও ওরা হয়তো অনেক বেশি বোঝে। কিন্তু সে কথা যাক। আমি একটা কাজের জন্যে আপনাদের কাছে যাচ্ছিলাম। এই সভাতে আপনি বক্তৃতা করতে আসছেন শুনে এখানেই ঢুকে পড়লাম। ভালোই হলো, আপনার সঙ্গে এখানেই দেখা হ'য়ে গেল। তা আপনি তো আজকাল আপনার হিন্দুত্ব নিয়ে খুব মেতে বেড়াচ্ছেন, দিদিকে দিন-কতকের জন্যে আমাদের ওখানে পাঠিয়ে দিন না! এখন আপাতত সেখানেই থাকবে, এই গোলমালটা মিটে গেলে আবার না হয় ফিরে আসবে। একটা হোটেলের ঘরের মধ্যে সে একা পড়ে থাকে, আর আপনি থাকেন বাইরে বাইরে আপনার হিন্দুত্ব নিয়ে। আজকালকার দিনে কখন কি হয় তা তো বলা যায় না। আমাদের তাই ভাবনা হয়। বাবাই এ কথা বলে পাঠালেন।"

"আমার কোনো আপত্তি নেই। তবে তোমার দিদি যাবেন কিনা সেটা আগে জানো।"

"আপনিই আমার হয়ে জেনে নেবেন। তাহ'লে আমি আর সেখানে যাবোনা। আমি জানি, দিদি আমার যাওয়া আসা পছন্দ করেনা। আপনি নিজেই বরং তাকে আমাদের হ'য়ে বলবেন যে বাবা এই কথা বলে পাঠিয়েছেন। যেতে ইচ্ছে হ'লে সে নিজেই যাবে।"

"আমার বলাটা ঠিক হবেনা। তাও তিনি পছন্দ করেন না, আর তা ছাড়া আমার হয়তো মনেই থাকবেনা। অনেক রকমের কাজে জড়িয়ে রয়েছি, অষ্টপ্রহর তাই নিয়েই আজকাল মেতে থাকি। বলতে হয়তো আমি ভুলেই যাবো।"

"আমার সম্বন্ধে না হয় অনায়াসে ভুলে যেতে পারেন, কিন্তু দিদি যাতে একটু নিরাপদে থাকে সে সম্বন্ধে বলতেও কি আপনি ভুলে যাবেন? তা তো নয়, দিদিকে কাছে না পেলেই অন্ধকার দেখবেন, চলে গেলে হয়তো আপনার কষ্ট হবে।"

"তবে তাই। যদি জানোই তবে আর বলছো কেন?"

নীরা আর কিছু বললেনা, একটু মৃদু হেসে চুপ ক'রে রইল। তখন রূপেন রঞ্জনের সঙ্গে নানারকমের কথা বলতে লাগলো। রূপেন আজকাল নীরাদের ওখানেই থাকে। এখন সে আইন পড়ছে, ওখান থেকেই কলেজে যাতায়াত করে। রূপেন এখন আর সে রূপেন নেই, আগেকার চেয়ে অনেকটা বদলে গেছে।

রূপেন বললে—"ধীরাকে অমন ক'রে দিনরাত পাঁচজনের হোটেলে একটা ঘরের মধ্যে ফেলে রাখবে, আর নিজে এই সব সভাসমিতি ক'রে মেতে বেড়াবে, অথচ তাকে যদি আমরা দুদিনের জন্যে

আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে চাই তো তাও তাকে যেতে দেবেনা, এটা কি তোমার উচিত হচ্ছে ভাই?”

“কি করবো বলো, সে যে এ সব জায়গায় আসা পছন্দ করে না, নইলে তাকেও এখানে সঙ্গে আনতুম। আর তোমাদের ওখানে যেতে দেবোনা এমন কথাই বা ভাবছো কেন? সে যখন খুশি যেতে পারে, আমার তাতে একটুও আপত্তি নেই। যাওনা, তোমরা তাকে তোমাদের সঙ্গেই নিয়ে যাওনা। চলো, এখনই বরং তার কাছে তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি। যাবে আমার সঙ্গে? চলো আমিই না হয় তোমাদের হ'য়ে বলছি।”

রূপেন আর নীরা ওর সঙ্গে গিয়ে উঠলো সেই শেল্‌টার নুকে। ওদের ঘরে গিয়ে দেখলে, ধীরা সেখানে নেই। চাকরটা একা বসে ঘর আগলাচ্ছে। কুকুরটা নতুন আগন্তুকদের দেখে ঘেউ ঘেউ ক'রে চেঁচিয়ে উঠলো।

খবর নিয়ে জানা গেল, পরেশ গেছে পরিত্রাণ আশ্রমে, আর ধীরা সেই যমুনা বৌটির সঙ্গে কোন এক পাশের বাড়িতে বেড়াতে গেছে। নয়া দিল্লী থেকে এক পাঞ্জাবী দম্পতি সেই বাড়িতে সম্প্রতি এসে উঠেছে, যমুনা বৌটির আগের থেকেই তাদের সঙ্গে ভাবসাব ছিল। ধীরার সঙ্গে আজকাল তাদের নাকি খুবই হৃদ্যতা হয়েছে। তাই সর্বদাই সেখানে যাতায়াত হচ্ছে।

বুঁচোকে দিয়ে ডাকতে পাঠিয়ে ওরা অপেক্ষা করতে লাগলো। কিছুক্ষণ পরেই ধীরা হাসতে হাসতে যমুনার সঙ্গে ফিরে এলো। কিন্তু নীরাদের দেখতে পেয়েই তার হাসি বন্ধ হ'য়ে গেল।

রূপেনের দিকে চেয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে—“তোমরা হঠাৎ কি মনে ক'রে?”

রূপেন বললে—"আমরা তোমায় নিতে এসেছি। দিন কতক আমাদের সঙ্গে আলিপুরে থাকবে চলো।"

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে রঞ্জনের দিকে ফিরে ধীরা বললে—"তুমিই বুঝি ওদের এই পরামর্শ দিয়ে সঙ্গে এনে এতক্ষণ বসিয়ে রেখেছো?"

রঞ্জন বললে—"আমিই ওদের সঙ্গে ক'রে এনেছি বটে, কিন্তু নিয়ে যাবার প্রস্তাবটা ওদেরই। আমার পরামর্শে ওরা আসেনি, ওরা বলছে যে তোমার বাবাই ওদের এইজন্যে পাঠিয়েছেন।"

"কেন, তিনি কেন পাঠাতে যাবেন? কক্ষনো না। ওরা দুজনে নিজেরাই মতলব ক'রে এসেছে।"

"তিনি হয়তো এই দাঙ্গা হাঙ্গামার সময় তোমার জন্যে খুব ভাবিত হচ্ছেন। এ সময় তুমি তাঁর কাছে থাকলে তিনি কতকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন।"

"তুমি এত কথা কেমন ক'রে জানলে? তাঁর সঙ্গে তোমার নিজের দেখা হয়েছিল নাকি?"

"তা নয়, এটা ওদের মুখে শুনেই তোমায় বলছি।"

"তা ওদের হ'য়ে তুমি ওকালতি করতে এসো কেন? তোমারও কি তাই ইচ্ছে যে আমি এখান থেকে চলে যাই? আমি যখন তোমার সঙ্গে চলে আসি, তখন তাই কি কথা ছিল, যে আবার আমি সেখানে ফিরে যাবো? আর তুমিই আমাকে যেতে বলবে?"

"তুমি ভুল করছো ধীরা। আমি তোমাকে যেতেও বলছি না, আর যেতে বারণও করছিনা। তোমার যেমন খুশি হবে তেমনি করবে, সেইটুকুই শুধু বলছি। কোনোটাতেই আমার আপত্তি নেই।"

"কেনই বা তোমার আপত্তি থাকবে না তাই শুনি? কেনই বা

তুমি বারণ করবেনা? আমি কি তোমার কাছে এতটাই সস্তা হ'য়ে গেছি যে এখন চলে গেলেও তোমার কোনো ক্ষতি নেই? একেই তো বলে অবহেলা। ওদের সামনে তুমি আমাকে এমনি অপমান করলে? আমি যাবোনা, কিছুতেই যাবোনা। তুমি না বারণ করলেও আমি যাবোনা। যখন আমার যাবার ইচ্ছে হবে তখন আমি এমনিই যাবো। তুমি বারণ করলেও আমি যাবো। তোমার কোনো কথাই মেনে আর আমি চলবো না।"

রঞ্জন চুপ ক'রে সেখানে দাঁড়িয়ে রইল। একটিও কথা আর সে বললে না। কিন্তু একটু একটু ক'রে মুখখানা তার গোল হ'য়ে ফুলে উঠলো। ফর্শা রংএর সেই মুখখানা লাল টক্‌টকে হ'তে হ'তে ঘোরতর কালো হ'য়ে উঠলো। চোখ রাঙিয়ে চেঁচিয়ে সহস্র ভৎ‍সনার চেয়েও এই স্ফীত রক্তিত মুখের নির্বাক নিস্তব্ধতা আরো ভয়ংকর। সদা-দাক্ষিণ্যপূর্ণ রঞ্জনের মুখের এমন রুদ্রমূর্তি ইতিপূর্বে কেউ কথনো দেখেনি। ধীরে ধীরে সে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে গেল। এত দিনের দাম্পত্য জীবনে এই ওদের প্রথম কলহ।

নীরা এর মধ্যে একবারের জন্যে একটিও কথা বলেনি।

তেরো

মনোলোকে যেমন তিন রকম ধরণের স্তর আছে, আমাদের গণলোকেও তেমনি তিনরকম ধরণের স্তর আছে। বিপ্লবকালে ঝগড়া আন্দোলন করে এক স্তরের লোক, আর হত্যা অত্যাচার করে অন্য স্তরের লোক। চীৎকার আন্দোলন করে তারাই যারা ওরই দ্বারা সুযোগ সুবিধার আস্বাদ কিছু পেয়েছে, এবং আরো বেশি পেতে চায়। হত্যা আর লুট করে তারাই যারা ন্যায়ের পথে চলে বিশেষ কিছু লাভ করতে পারেনি, সেই ক্ষোভটা অন্যায়ের অত্যাচারের পথে যথাসম্ভব পুষিয়ে নিতে চায়। আর ওর দ্বারা মরে এবং ভোগেও তারাই, যারা ঐ দুই স্তরের মাঝামাঝি জায়গাতে থাকে, যারা নিরীহভাবে নিজেদের দিন গুজরাণের নৈমিত্তিক কাজগুলো ক'রে যাওয়া ছাড়া দুনিয়ার হালচাল অন্য কিছুই বোঝে না। হিন্দু আর মুসলমান দুই পক্ষেরই ঐ পূর্বোক্ত দুই স্তরের লোকগুলি ছাড়া বাকি নিরীহ শ্রেণীর লোকগুলো যখন মৃত আর আহত হ'য়ে সংখ্যাতে কিছু কমে গেল, এ পাড়া ও পাড়া থেকে যখন অনেক লোক পালিয়ে গেল, খুনোখুনির উৎসাহে দুই পক্ষের মধ্যে কিছু ক্লান্তি এসে পড়লো, আর পুলিশে মিলিটারিতে যখন জোর পাহারা দিতে শুরু করলে, তখন কিছুদিনের জন্য দাঙ্গাহাঙ্গামাটা আপাতত থেমে গেল। আক্রমণকারীর দল তখন চুপচাপ একটু বিশ্রাম নিতে লাগলো, আর ঝগড়াকারীর দল তখনও সমানে তাদের বচনবাণ নিক্ষেপ ক'রে আস্ফালন চালাতে লাগলো। একে যদিও মিটমাট বলা যায় না, কিন্তু নিরীহ শ্রেণীর লোকেরা মিটমাট হ'য়ে গেছে

ভেবে একটু একটু ক'রে ঘরের কোণ ছেড়ে কথঞ্চিৎ নির্ভয়ে আবার সর্বত্র যাতায়াত করতে লাগলো। একটু একটু ক'রে আবার দোকান পসরাগুলো আধপাল্লা ফাঁক ক'রে দরজা খুলতে লাগলো, ট্রাম বাস গাড়ি ঘোড়া ক্রমে ক্রমে চলতে লাগলো, কলকাতা শহর আবার যেন কতক ধাতস্থ হ'য়ে এলো। লোকে আবার কিছু কিছু গলা ছেড়ে হাসতে আরম্ভ করলে, সিনেমা বায়স্কোপে আবার বিকেলের দিকে ভিড় জমতে দেখা গেল। মেয়েরা আবার সেজেগুজে রাস্তায় বাহার দিয়ে বেরুতে লাগলো। ভয় একেবারে ঘোচেনি, কিন্তু ভাবনা তখন কতকটা নিবৃত্ত হয়েছে।

রঞ্জন এর মধ্যে বাগমারিতে গিয়ে চট্ ক'রে একবার বাড়ির লোকদের সঙ্গে দেখাশোনা ক'রে আসতে পারতো। কিন্তু যাবার ইচ্ছে থাকলেও অনেক রকমের কারণে সে যেতে পারেনি। ধীরাকে সে একটুও কিছু তাচ্ছিল্যের সন্দেহ করতে কিংবা মুখভার করবার সুযোগ দিতে চায় না। তা ছাড়া পরিত্রাণ আশ্রমে সর্বদাই তাকে একটা না একটা সমস্যার সমাধান করতে হয়, নিজে গিয়ে না দেখলেই অনেক গণ্ডগোল হ'য়ে যায়। তার ওপরে এখন তার কলেজ খুলেছে, কিছুকাল বন্ধ থাকার দরুণ যে ক্ষতি হয়েছে সেটা পুষিয়ে নিতে হচ্ছে। এর মধ্যে কিছুক্ষণের জন্যেও অন্যত্র যাওয়া তার পক্ষে একরকম অসম্ভব ছিল।

এইবার একদিন সুযোগ বুঝে সে সকলকে বলে কয়ে ব্যবস্থা ক'রে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলো। ধীরাকে বুঝিয়ে বললে যে একবারটি সে বিশেষ প্রয়োজনে দেশে যাচ্ছে, ফিরে আসতে হয়তো একটা দুটো দিন দেরী হ'তে পারে। তার জন্যে ভাবনার কিছু নেই, পরেশ তা রইল। অনেক কাল না যাওয়াতে বিষয় সম্পত্তিগুলোর ক্ষতি

হচ্ছে, আত্মীয় স্বজনেরাও নানারকম ভাবছে, ইত্যাদি। একদিনে নয়, দু'তিন দিন ধরে এই সব কথা জপাতে জপাতে একদিন সে ঐ বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো।

দাঙ্গার সময় রঞ্জন হিন্দু পাড়াতে থেকে এতদিন কেবল হিন্দুদের অবস্থাটাই দেখে এসেছে, মুসলমানদের অবস্থা যে কেমন হয়েছিল তা এ পর্যন্ত কিছুই জানে না। রাস্তায় যেতে যেতে দুপাশে চেয়ে দেখলে, যেখানে যেখানেই মুষ্টিমেয় মুসলমানদের আড্ডা ছিল, সেখানে সেখানেই অগ্নিদাহ আর ধ্বংসের চিহ্ন তখনও পর্যন্ত বর্তমান রয়েছে। মসজিদগুলো ভেঙেচুরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, দেয়াল ফাঁক হ'য়ে দরজা জানলাগুলো ভেঙে পড়েছে। তৈজসপত্র ছত্রাকারে ছড়ানো। দেখে ওর মনে বড়ো কষ্ট হলো।

নানা কথা ভাবতে ভাবতে রঞ্জন ট্রাম থেকে নেমে বাগমারির দিকে এগিয়ে চলল। ট্রাম লাইনের রাস্তা পার হ'য়ে গিয়ে এক জায়গায় পড়লো পথের দুই ধারে মুসলমানদের পাড়া। কিছুদূর অগ্রসর হ'য়ে যেতেই দুদিক থেকে তিন চারজন মুসলমান ওর কাছে এসে উপস্থিত হলো।

একজন ওর সুমুখে এসে বললে—"বাবু সাহেব, আপনি আমাদের পাড়ায় এসে ঢুকছেন কেন? এ পাড়ায় কোনো হিন্দুই তো আজকাল আসেনা! আমরাও আপনাদের হিন্দু পাড়ায় আর যাই না। ঠিক কথা বলুন। আপনি এখানে কোন মতলবে ঢুকেছেন?"

রঞ্জনের তখন মনে পড়লো যে সে ঠিক হিন্দুর মতোই পোষাক পরিচ্ছদ পরে' আছে। এতটা তার খেয়াল ছিলনা। সে বললে—"আমার পোষাক দেখে তোমরা হয়তো আমাকে চিনতে পারছো না, কিন্তু আমি মুসলমান। এই দিকেই আমার বাড়ি, আমি মুস্তাফা

সাহেবের ছেলে।" কথাটা বলতে ওর মাথা কাটা গেল, মুখে বেধে যেতে লাগলো। কিন্তু তখন ঐ পরিচয় দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না।

"কোন মুস্তাফা সাহেব?"

"যাঁর বাগমারিতে বাড়ি, ওখানকার সিনেমা হাউসটা যাঁর ছিল।"

"তিনি তো অনেকদিন আগে মারা পড়েছেন!"

"হাঁ আমি তাঁরই ছেলে!"

"বিশ্বাস হচ্ছে না। আপনি হিন্দুদের পাড়া থেকে কেমন ক'রে তাহ'লে আসছেন? আমরা আপনার সঙ্গে যাবো।"

"চলো।"

যে পরিচয় ওর সত্যিকার নয় সেই পরিচয় দিয়ে ও তাদের সঙ্গে সঙ্গে চলল। ওদের নিজেদের বস্তির মুখে যেতেই সেখানকার সবাই ওকে দেখে তৎক্ষণাৎ চিনতে পারলে। এবার সঙ্গের লোকগুলো ওর কাছে অনেক ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে চলে গেল। ও তখন সেই বস্তির ভেতর দিয়েই শর্ট-কাট ক'রে নিজেদের বাড়ির দিকে চলল।

যেতে যেতেই ওর মনে হলো, এখন আর নিজেকে রঞ্জন বলে যেন মনে হচ্ছে না, ও যেন সেই আগেকার রমজান।

এ ঠিক সেই রাস্তাটি, যেখান দিয়ে মুস্তাফা সাহেব সর্বপ্রথম একদিন গভীর রাত্রে ঐ রমজানকে কোলে তুলে নিয়ে গিয়ে আপন পুত্রের মতো নিজের সংসারে স্থান দিয়েছিলেন। আজও সে পথটি তেমনি সংকীর্ণ, তেমনি সকল সময়েই অন্ধকার। দিনে সেখানে রোদ প্রবেশ করেনা; রাত্রে প্রাণের ভয়ে কর্পোরেশনের বাতিওয়ালা গ্যাসের বাতি জেলে দিতে আসে না। আশে-পাশে পাঁক জমানো গভীর ময়লা ড্রেন ; দু পাশে মাটির দেয়াল দেওয়া সারি সারি খোলার ঘর। ঐটুকু

সংকীর্ণ রাস্তার মধ্যেই চলাচলের জায়গা জুড়ে খাটিয়া পেতে বসে কালো আলখাল্লা পরা দুই চারজন বৃদ্ধ মুসলমান সাদা দাড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে আলবোলার নলে মুখ লাগিয়ে তামাক টানছে। খাটিয়ার চারিপাশে অসংখ্য মুরগির ছানা মাটি খুঁটে খুঁটে চরে বেড়াচ্ছে, ঐ গলিপথের স্যাঁতসেঁতে মাটিতে কি খাদ্য খুঁজে পাচ্ছে সে তারাই জানে। আগন্তুককে আসতে দেখেই বৃদ্ধেরা চিনতে পারলে, তাড়াতাড়ি উঠে খাটিয়া সরিয়ে মুরগির ছানাগুলোকে তাড়িয়ে তার যাবার রাস্তা ক'রে দিলে। হলদে রংএর গোল গোল ছাপ লাগানো কাপড় পরে দু একটি বেঁটে বেঁটে অস্থিচর্মসার মেয়ে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে অবাক হ'য়ে ওর দিকে চেয়ে রইল। লুঙ্গি পরা খালি গা দু একজন হাড়-বের-করা লিক্‌লিকে চেহারার যুবক কেমন এক অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো। সেই অস্বস্তিদায়ক দৃষ্টি ওর জামা কাপড়ের দিকে, না ওর সুপুষ্ট স্বাস্থ্যের দিকে, তা ঠিক বোঝা গেল না। চারিদিকের ড্রেণ থেকে ভেসে আসছে কেমন একটা অপ্রীতিকর পেঁকো পেঁকো ভাপসানি গন্ধ। কোথায় পেঁয়াজ ভেজে কি রান্না চড়ানো হয়েছে, তারই একটা তীব্র ঝাঁজ এসে মাঝে মাঝে ঐ ড্রেণের গন্ধকে পর্য্যন্ত চাপা দিয়ে দেয়। প্রত্যেক বাড়ির দরজায় দরজায় দড়ি বের করা ময়লা তেল চিট্‌চিটে কালো চটের সহস্রছিদ্র পরদা ঝুলছে, তাই দিয়ে তাদের অন্দরের আবরু রক্ষা হচ্ছে। কোথাও বাইরের অতি সংকীর্ণ একটু দাওয়ায় বসে ছোঁড়ারা কানে পায়রার পালক গুঁজে গুণগুণ ক'রে গজল ঠুংরির তান ভাঁজতে ভাঁজতে বিড়ি পাকাচ্ছে। একটা জায়গাতে দপ্তরিদের ঘর, তারা একটা উনুনের ওপর তুঁতে মেশানো লেই ঘোঁটাচ্ছে, আর ক্ষিপ্রহস্তে কাগজে তাই মাখিয়ে বইএর মলাটের জিল্‌দ্

তৈরি করছে। এক জায়গায় একটি শীর্ণা যুবতী ডাল বাছতে বাছতে তার শীর্ণ শিশুকে স্তন্যপান করাচ্ছে।

যেতে যেতে সব কিছুই রমজানের চোখে পড়ে গেল। এমন সব দৃশ্য দেখতে বহুকালই সে অভ্যস্ত ছিল না। আশ্চর্য হ'য়ে ভাবলে, এই যে রোগা চেহারার নিরীহ লোকগুলো, এরাই কি সেই ফ্যানাটিক মুসলমান, যারা স্বভাবতই ধর্মান্ধতায় দুর্ধর্ষ হয়, যারা ক্ষেপে উঠলে আর রক্ষা থাকে না, যাকে পায় তাকেই খুন ক'রে ফেলে? আশ্চর্য আশ্চর্য, এরাই কি সেই ইতিহাসের মুসলমান, যাদের থাকে এক হাতে তলোয়ার আর অন্য হাতে কোরাণ? এই সব বাংলা দেশের গরিব গৃহস্থ মুসলমানদের দেখলে কি সত্যি তাই মনে হয়? ও ছেলেবেলাতে বহুদিন পর্যন্ত যে এদেরই সমাজের একজন ছিল। কৈ, ওঁর নিজের মধ্যে তেমন কোনো বদরাগী ধরণের দুর্ধর্ষতার আভাসমাত্র তো একদিনের জন্যেও দেখা দেয়নি! এদের মধ্যেও যে তেমন কিছু আছে তাও কি এদের এই অবস্থায় বাস করতে দেখলে কিছুতে বিশ্বাস হয়?

যাই হোক এখন ও আর ওদের মতো মুসলমান সম্প্রদায়ের লোকই নয়। এখন হিন্দু হ'য়ে এদের থেকে ও স্বতন্ত্র। ওর মনের ভাব সম্পূর্ণই এখন ভিন্নরকম। ও আপন পৃথিবীতে শান্তি চায়, মিল চায়, মঙ্গল চায়। তেমনিই ওর চরিত্র। যার যেমন চরিত্র, রক্তের ভিতরেই তার মূল কারণটা নিশ্চয় আগের থেকে লুকিয়ে থাকে। যতই কেন বিপরীত শিক্ষা আর বিভিন্ন সংশ্রবের মধ্যে তাকে রাখা যাক, সেটা কিছুতেই বদলায় না।

সে যাই হোক, এখানকার সমস্ত সংশ্রবই ও পরিত্যাগ করবে। অন্তুতপক্ষে মুস্তাফা সাহেবের প্রদত্ত সম্পত্তিটা ওকে নিশ্চয়ই পরিত্যাগ

করতে হবে। পূর্বসম্পর্কের মায়েদের নামে ও সব কিছুই লিখে দেবে। হিন্দু হ'য়ে যে সমস্ত কিছু জেনেশুনেও আগের মতো ও মুসলমানের সম্পত্তি ভোগ করতে থাকবে, তা কিছুতেই হয় না। সে কথা রাবিয়া বিবি না বুঝলেও ফতিমা বিবিকে বুঝিয়ে বললে বুঝবে। ওর হিন্দু মায়ের দরুণ যে বাড়িখানা পেয়েছে সেটা বিক্রি করলে আজকালকার বাজারে অনেক টাকা হবে, তাতেই ওর বহুকাল পর্যন্ত বেশ চলে যাবে। তার পর ইতিমধ্যে পাশ ক'রে একটা চাকরি বাকরি যা হোক জোগাড় ক'রে নিতে নিশ্চয়ই পারবে। দুটো তো মাত্র পেট চালানো, তার জন্যে আর ভাবনা কি? তবে ফতিমা বিবিদের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করা মানেই যে দেখাশোনো করা পর্যন্ত ছেড়ে দেওয়া, তা অবশ্য নয়। তাহ'লে নিতান্ত নিমকহারামি করা হবে। ওঁদের স্নেহটা তো মিথ্যে নয়। আর গোড়া থেকে শুরু ক'রে এতকাল পর্যন্ত আদরে যত্নে মানুষ ক'রে তোলাটাও নেহাৎ মিথ্যে নয়। তবুও ছেড়ে যাবার আগে একবার জিজ্ঞাসা ক'রে নিতে হবে যে আসল ঘটনাটা কি হয়েছিল। ফতিমা বিবিরা ঠিক কতটুকু জানেন তা খোলাখুলি একবার তাঁদের কাছে শুনে নিতে হবে। মুস্তাফা সাহেব যখন ওকে সদ্যোজাত অবস্থায় নিজের বাড়িতে এনেছিলেন তখন নিশ্চয় মেয়েদের কাছে কিছু বলেছিলেন। হয়তো বলেছিলেন যে ও কোনো মুসলমানেরই ছেলে। হয়তো ফতিমা বিবিরা এখনও জানেন না যে ও একজন হিন্দুর সন্তান। নইলে এতদিন সে কথা নিশ্চয়ই তাঁরা ওর কাছ থেকে লুকিয়ে রাখতে পারতেন না। কথাটা ফতিমা বিবিদের কাছে ও তাহ'লে এবার স্পষ্ট ক'রেই জানিয়ে দেবে।

মনের মধ্যে নানারকমের সংকল্প বুনতে বুনতে ও বাড়িতে গিয়ে উঠলো। কিন্তু সেখানে ঢোকবামাত্রই ওর সমস্ত সংকল্প কোথায় তলিয়ে গুলিয়ে লণ্ডভণ্ড হ'য়ে গেল।

বাড়িতে ঢুকেই ও দেখলে রাবিয়া বিবির খুব অসুখ, প্রায় যায় যায় অবস্থা। হঠাৎ দারুণ হার্টের অসুখ হয়েছে, পা দুখানা ফুলেছে। তিনি বালিশ কোলে নিয়ে বসে অনবরত হাঁপাচ্ছেন, সাত দিন সাত রাত মোটে বিছানায় পিঠ দিয়ে শুতেই পারেন নি। ভালো চিকিৎসাও হয়নি। হিন্দু ডাক্তারেরা কেউ পাড়াতে আজকাল ঢুকতে চায় না। এদিকে রাবিয়া বিবির অন্তিম শ্বাসকষ্ট উপস্থিত।

মুসলমানেরা কি এতই খারাপ লোক যে ডাক্তারে পর্যন্ত বিশ্বাস ক'রে রোগী দেখতে ওদের ঘরে আসতে চায় না? এই নিয়ে রঞ্জন রাগতভাবে সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে দেখে রাবিয়া বিবি হাঁপাতে হাঁপাতে হাত নেড়ে ওকে থামিয়ে দিয়ে বললেন— "ডাক্তারে আর কাজ নেই বাপজান। তোর জন্যেই আমার প্রাণটুকু এখনও টিঁকে আছে, নইলে এতদিন কবে চলে যেতো। তোর সঙ্গে দেখা হ'য়ে গেল, আর আমার কোনো ডাক্তার লাগবে না। তুই আমার কাছে এসে চুপ ক'রে একটু বোস, আমি তোকে দেখতে দেখতে মরি।"

রাবিয়া বিবির সে কি আকুতি! এক হাত দিয়ে ওর হাতখানা চেপে ধরে থাকে, আর অন্য হাত দিয়ে অনবরত ওর গায়ে পিঠে বুলিয়ে যেতে থাকে। যেন এতেই তাঁর সকল যন্ত্রনার উপশম হ'য়ে যাচ্ছে।

অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হ'য়ে ও এখনই আসছে বলে উঠে গিয়ে টেলিফোনে ডাক্তারদের কল্ দেবার জন্যে তাড়াতাড়ি সাবান কলে ছুটলো।

তিন চারজন চেনা ডাক্তারকে ও পর পর টেলিফোন করলে। কিন্তু পরিচয় থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে কেউই ওখানে আসতে স্বীকার হলো না। বললে যে ডবল ফী দিলেও ও পাড়াতে যাওয়া এখন ভয়ানক রিস্কি। কে কোন মতলবে টেলিফোনে ডাকে তার ঠিক কি? চেনা লোককেও এ সময় বিশ্বাস করা যায় না। এমনি বোকামি করতে গিয়ে দু একজন ডাক্তার নাকি গুণ্ডাদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে। ডাক্তারেরা কেউই তাই অন্য সম্প্রদায়ের পাড়াতে আপাতত যেতে রাজি নয়।

এই সব কথা শুনে রাগে দুঃখে যেন ওর কান্না পেতে লাগলো। কোনো উপায় নেই দেখে অগত্যা একজন নিকটস্থ মুসলমান ডাক্তারকেই সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরলো। সে বেচারা রোগীর কষ্টের একটু উপশম করবার জন্যে তার যথাসাধ্য চেষ্টা করলে। কিন্তু রাবিয়া বিবির তখন যে অবস্থা, তাতে কোনো ডাক্তারই কিছু করতে পারেনা। ডাক্তার বললে, অক্সিজেন দেওয়া দরকার। অক্সিজেন খোঁজা হলো, তাও কোথাও মিললো না।

ঘণ্টা খানেক ধরে কয়েকটা ইনজেকশন দিয়ে অনেক রকমের চেষ্টা ক'রে ডাক্তার অবশেষে একটা ঘুমের ওষুধ লিখে দিয়ে চলে গেল। সে ওষুধ আবার ঐ অঞ্চলে পাওয়া যায় না, সেটা আনবার জন্যে বাথ-গেটের বাড়িতে লোক পাঠানো হলো।

এদিকে রাবিয়া বিবির অবস্থা উত্তরোত্তর খারাপ হ'তে লাগলো। তখন তিনি রঞ্জনকে কাছে বসিয়ে অনবরতই হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে অনেক কষ্টে এক একটা কথা বলে যেতে লাগলেন। সে কেবল স্নেহপূর্ণ মাতৃহৃদয়ের যত আদরের কথা, অন্য কিছুই না। "আমার বাপজান, আমার দিলজান, আমার রমজান, তুই এসেছিস আমি বাঁচলুম। তোকে

রেখে নিশ্চিন্ত হ'য়ে আমি চললুম এবার। আমাকে তুই মা বলে একটু ইয়াদ রাখিস। আমার যা গহনাপত্র রইল সব তোর বৌকে দিবি। তাকে বলিস যে তোর বড়ো মা তার জন্তে এই সব রেখে গেছে। এতকাল মনে করতুম যে ছেলে-বৌএর মুখ দেখে তবে আমি যাবো, কিন্তু সে আমার তকদিরে নেই। ফতিমা বহিন রইল, সেই এখন তোর বৌ নিয়ে ঘর করুক। ছেলের গায়ে হাত রেখে হাসতে হাসতে চলে যাচ্ছি, এর চেয়ে বেশি সুখ আর আমার কি হ'তে পারে? আল্লা তোকে বড়ো করুন, আল্লা তোকে বাঁচিয়ে রাখুন।"

কথা বলতে' বলতে হঠাৎ রাবিয়া বিবি রঞ্জনের হাতখানা সজোরে একবার চেপে ধরলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের তারা দুটো কপালে উঠে পড়লো। তার পরেই তিনি একেবারে নিস্পন্দ হ'য়ে গেলেন। হাপরের মতো হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া তাঁর একদম থেমে গেল। চোখ দুটো আপনিই বুজে গেল, সকল যন্ত্রণার অবসান হয়ে মাথাটা এক পাশে লুটিয়ে পড়লো।

মৃত্যু অনেক রকমেরই ও দেখেছে। কিন্তু সে যে এমন অপ্রত্যাশিত মুহূর্তে ঘটতে পারে, ওর হাতখানা ধরে ওরই সঙ্গে কথা বলতে বলতে যে রাবিয়া বিবি অকস্মাৎ এমনভাবে ইহলোক ত্যাগ ক'রে চলে যাবে এমন ব্যাপার ও আদৌ ভাবতেই পারেনি। মুহূর্তপূর্বে পর্যন্ত ওকে না জানতে দিয়ে কত সহজে তাঁর প্রাণটা বেরিয়ে গেল! তার শেষ পর্যন্ত ওকেই কিনা জীবনের একমাত্র ইষ্টসিদ্ধি ভেবে নিয়ে তিনি তাঁর জীবনান্তের শেষ নিঃশ্বাসটি ত্যাগ করলেন! যেন জানার থেকে অজানার পথে যাত্রামুখে একমাত্র ওকে রেখে যাওয়াই হলো তাঁর চরম সান্ত্বনা।

ও যে বেঁচে রয়েছে, শুধু এইটুকু আশ্বাস নিয়ে তাঁর মরে যেতে

যেন কিছুমাত্র ক্ষোভই হ'লো না। অথচ সব খবরই তো নিশ্চয় উনি জানতেন। ও যে তাঁর গর্ভের সন্তান নয়, তাঁর আপন বলতে কেউই নয়, তাঁর রক্তের সঙ্গে কিংবা বংশধারার সঙ্গে পর্যন্ত ওর যে কোনো কিছুই সম্পর্ক নেই, এ সব কথা মরবার সময়টাতে পর্যন্ত ভুলে রইলেন কেমন ক'রে? হাজার মানুষকরা ছেলে হ'লেও উনি তো ওর সত্যিকারের মা নন!

যে ছিল ওর সত্যিকারের গর্ভধারিণী মা, তার মৃত্যুও ও এই সম্প্রতিই দেখে এসেছে। সেও মরেছিল এমনি ক'রেই, ওর মুখের দিকে চেয়ে পরম সান্ত্বনার চরম তৃপ্তি নিয়ে। এমনিই বুঝি মেয়েদের ধারা? যে হয় সত্যিকারের মা, আর যে মনে ক'রে নেয় কারো মা ব'লে, এই দুইএর মধ্যে কোনো একটু তফাৎই বুঝি এরা রাখেনা? এই কি চিরন্তনের মেয়েজাতি, মাতৃজাতি? এমনিভাবে পরকে আপন ক'রে নিতে কি জগতের সকলকেই এরা শিখিয়ে দিতে পারেনা?

এর পর নিজেকে রমজানের বদলে রঞ্জন বলে ভাবতে ওর মনে মনে কেমন লজ্জা করতে লাগলো।

রাবিয়া বিবির মৃত্যুদৃশ্য দেখে ওর সব কিছুই গণ্ডগোল হ'য়ে গেল। ও যে হিন্দু, এই কথাটার ওপরে আর তেমন বেশি জোর দিয়ে আগেকার মতো মনকে পুলকিত রাখতে পারলে না। মুসলমান হ'লেই বা এমন ক্ষতি ছিল কি? মনুষ্যত্বের বিকাশ যেমন হয়েছে তেমনিই হতো, স্নেহ-ভালোবাসার সম্পর্ক যেমন জুটেছে তেমনিই জুটে যেতো। জীবনের সার্থকতা সব সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যেই সমান।

আরো একটা ব্যাপারে ওর উদার হিন্দুত্ব কিছু আঘাত পেলো

রাবিয়া বিবিকে মাটি দিয়ে যখন ওরা ম্রিয়মান মুখে সদলবলে ফিরে আসছিল, তখন কোথা থেকে হঠাৎ কে ওদের গায়ে একটা তীব্র অ্যাসিডের বাল্‌ব ছুঁড়ে মারলে। একজনের গায়ে লেগে সেটা ফেটে গেল, তার এবং পাশের লোকটির গায়ের খানিক খানিক অংশ সেই অ্যাসিড লেগে পুড়ে গেল। তখনই সবাই মিলে দুরন্ত ক্রোধে হল্লা ক'রে উঠলো, কিন্তু শুধু হাতে মৃতের সৎকার ক'রে ফিরে যাবার মুখে তখন হল্লা করবার সময় নয়। ও সবাইকে এই কথা ব'লে অনেক কষ্টে সংযত ক'রে নিয়ে গন্তব্য পথে চলে গেল। কিন্তু মনে মনে ও অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে উঠলো। এ কত বড়ো অন্যায়! শান্তিপূর্ণ নির্বিরোধী কয়েকটি মানুষ মৃতের সৎকার ক'রে রাস্তা দিয়ে চলে যাচ্ছে, তাদের ওপর অকারণ এমন অত্যাচার! এই কি হিন্দুদের শিক্ষা দীক্ষা আদর্শ, একেই কি আজকালকার হিন্দুত্ব বলে মেনে নিতে হবে? এ যে কোনো দুষ্টবুদ্ধি দায়িত্বজ্ঞানশূন্য দুর্বৃত্তের দ্বারাই সংঘটিত হওয়া সম্ভব, আর দুই পক্ষেরই মানুষের মধ্যে ঐ ধরণের দুষ্টবুদ্ধি লোকেরা যে সাম্প্রদায়িক রেষারেষির ফলে এমনি ক'রেই আস্কারা পেয়ে যাচ্ছে, এত কথা রাগের মাথায় ও ধারণা করতেই পারলে না। রাবিয়া বিবিকে চিকিৎসা করতে কোনো হিন্দু ডাক্তার আসতে স্বীকার না হওয়ায় ওর মনটা বেশ বিরূপ হয়েই ছিল, এই ব্যাপারে তা আরো বেশি বিরূপ হ'য়ে উঠলো।

বাড়ি ফিরে গিয়ে ও আহত লোক দুটির ভালোরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে দিলে। তার পর মায়ের মৃত্যু উপলক্ষে বস্তির গরিব লোকদের ডেকে এনে সরবৎ-পানি খাইয়ে প্রচুর দানখয়রাৎ করতে শুরু ক'রে দিলে। এ ছাড়াও সে ওই অস্বাস্থ্যকর বস্তিটার আমূল সংস্কার ক'রে দেবার ব্যবস্থা করলে। রাবিয়া বিবির নামে বস্তির

মধ্যে একটা টিউব কল ক'রে দেবার জন্যে অনেক টাকার বরাদ্দ ক'রে দিলে। এই সব কাজ নিয়ে ও দিন দুই খুবই ব্যস্ত হ'য়ে রইল, ফতিমা বিবির কাছে বসে দুটো কথা বলবারও অবসর পেলে না।

দিন দুই পরেই ও নিজের বাসাতে আবার ফিরে যাবার জন্যে ব্যস্ত হ'য়ে উঠলো। ধীরার কাছে মাত্র দুদিনের মেয়াদ ক'রে চলে এসেছে। তার বেশি থাকা কিছুতেই চলতে পারে না। চার দিন পরে যেদিন শ্রাদ্ধশান্তি হবে সেদিন না হয় আবার ফিরে আসবে। এখন একবার সেখানে যাওয়া অবশ্যই উচিত। কিন্তু কেমন ক'রে সে কথা ফতিমা বিবির কাছে উত্থাপন করা যায়? তিনি এখন শোকে অভিভূত হ'য়ে রয়েছেন, তাঁকে কিছু বলতে যাওয়াই এখন কঠিন। এমন একটা কিছু কারণ দেখাতে হবে যাতে তিনি ওর যাওয়া সম্বন্ধে একটুও অমত করতে না পারেন।

মনে মনে যখন তেমনি গুরুতর একটা কিছু বলে পালিয়ে যাবার উপায় চিন্তা করছে, তখন হঠাৎ আবার প্রবলভাবে হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গা নতুন ক'রে বেধে উঠলো। যে আগুন নিস্তেজ হ'য়ে ধিকিধিকি জ্বলছিল, সেটা আবার কোথায় একটা ইন্ধন পেয়ে দাউ দাউ ক'রে লেলিহান হ'য়ে দেখা দিল।

চোদ্দো

"আল্লা আল্লা হো!" "আল্লাহ্ আকবর!"

বর্ষণরিক্ত বায়ু চলাচলশূন্য প্রচণ্ড সেই গুমোট মধ্যাহ্নে সেদিন অকস্মাৎ বারে বারে সে কি প্রলয়ংকর মনুষ্যগর্জন! কল্পনাসীমান্তের অপরপারে অধিষ্ঠিত সকলের শ্রেষ্ঠাতিশ্রেষ্ঠ স্বয়ং বিধাতাও হয়তো এমন তীব্র আহ্বান শুনে চমকে ওঠেন। হিংসায় উন্মত্ত হ'য়ে স্বয়ং সেই বিধাতাকে এ কি তাড়নাদায়ক তীব্র আহ্বান!

পুরোপুরি দাঙ্গা আবার শুরু হ'য়ে গেছে। দাঙ্গা চলে কত দলের সঙ্গে দলের, পাড়ার সঙ্গে পাড়ার, বস্তির সঙ্গে বস্তির। গুজবই এই দাঙ্গার ইন্ধন যোগায়, মানুষকে ক্ষিপ্ত ক'রে তোলে। গুজবের মারফতে শোনা গেছে যে খালের ওপারের হিন্দুরা এ পারের মুসলমানদের আক্রমণ করতে আসবে। তার আগেই তাদের ওপর এদের ঝাঁপিয়ে পড়া চাই। চার পাঁচ শো মুসলমান মরদ একত্র হ'য়ে লাঠি ছোরা তলোয়ার সোডার বোতল ইট যে যা পারে সংগ্রহ ক'রে নিয়ে হল্লা করতে করতে ওপারের দিকে অগ্রসর হলো।

ও পক্ষেও ঠিক তাই। খুব জোর গুজব শোনা গেছে যে মুসলমানেরাই দল বেঁধে হিন্দুদের পাড়া আক্রমণ করতে আসবে। তখন উপযুক্ত রকমে বাধা দেওয়া চাই। হিন্দু যুবকেরা তাই বহু সংখ্যায় দল বেঁধে লাঠি সোটা নিয়ে নিজেদের শ্লোগান বলে চেঁচাতে চেঁচাতে এগিয়ে চলল।

দুই উন্মত্ত আততায়ীর দল পরস্পরের দিকে অগ্রসর হ'তে হ'তে এক জায়গায় হ'য়ে গেল সাক্ষাৎ। তখন ঢেউএর সঙ্গে ঢেউএর ধাক্কা

লেগে যাওয়ার মতো প্রচণ্ড শব্দসংঘাতে সেই বিক্ষুব্ধ বিচিত্র মনুষ্যসমুদ্র বিপুল গর্জন ক'রে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে এক অবর্ণনীয় ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি হলো। কে যে কোথায় ছুটছে পালাচ্ছে পড়ে যাচ্ছে, কে যে কোথায় লাঠি চালাচ্ছে আর কে যে আঘাত খেয়ে আর্তনাদ করছে, কে যে তীব্র চীৎকার ক'রে সোডার বোতল চালাচ্ছে আর কোথায় লেগে সশব্দে সেটা ফেটে যাচ্ছে, কারাই বা রাস্তা খুঁড়ে খোয়া পাথর তুলে নিয়ে তাই শুধু দুহাতে নিক্ষেপ করছে, কে যে উন্মাদ হ'য়ে সাক্ষাৎ মরণকে বরণ ক'রে মহা উল্লাসে লাফাতে লাফাতে সামনের দিকে বুক ফুলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, আর কারাই বা সামনের লোকদের আড়ালে দাঁড়িয়ে যথাসম্ভব সাবধানে আত্মরক্ষা করছে, তফাৎ থেকে দাঁড়িয়ে এর কোনো কিনারাই করা যায় না। হঠাৎ একটা ঝড় উঠলে যেমন হয়। শুধুই খানিকটা আঁধির মতো, সেই সঙ্গে চীৎকার আর হট্টগোল। দলবদ্ধ শক্তি আক্রমণ করতে যাচ্ছে দলবদ্ধ শক্তিকে। কিন্তু তারা যে পরস্পরে পরস্পরের ওপর নিতান্তই ঝাঁপিয়ে পড়ছে তা নয়। মাঝখানে রয়েছে খানিকটা জমির ব্যবধান, সেটাকে কেউ অতিক্রম করছে না। অত্যন্ত আঘাত খেয়ে একটা দল যখন যতটুকু পিছিয়ে পড়ছে, অপর দলটা বিজয়োল্লাসে যেতে ঠিক ততটুকুই এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই অসমসাহসিকতার প্রয়াস দেখে অপর দল যেমন ক্ষিপ্ত হ'য়ে আবার রুখে আসছে, অমনি ক্ষণিকের অগ্রগামী দল আবার যাচ্ছে পেছিয়ে।

এমনি একটা ইট ছোঁড়াছুঁড়ি আর ডাণ্ডা পেটাপেটির উন্মত্ত লড়াই বড় জোর আধ ঘন্টার বেশি চলতে পারেনা। ওরই মধ্যে দুই পক্ষেরই কয়েকজন লোক হত আর আহত হলো। হতের সংখ্যা খুব কম, আহতের সংখ্যাই বেশি। তাদের স্থানান্তরিত করতে গিয়ে দুই পক্ষেরই তখন চেতনা হলো যে এবার ক্ষতি হ'য়ে যাচ্ছে। দুই পক্ষই তখন

একটু একটু ক'রে পিছিয়ে পড়তে লাগলো। কিন্তু দুই পক্ষই তুমুল কোলাহলের দ্বারা বুঝিয়ে দিলে যে আমরা অপর পক্ষকে হটিয়ে দিয়ে এসেছি। যতক্ষণে সবাই ছত্রভঙ্গ হ'য়ে সরে পড়লো ততক্ষণে পুলিশ আর মিলিটারি এসে পৌঁছে গেল। তারা সেই ভাঙা আসরে খুব খানিকটা দাপাদাপি ক'রে বেড়ালে, তার পর ফুটপাথের ধারে স্থানীয় দোকানঘরের টুল বেঞ্চিগুলো টেনে এনে বসে বসে বিশ্রাম নিতে লেগে গেল।

বাড়িতে বসে রমজান ঐ সব কোলাহলই শুনেছে, কিন্তু এ পর্যন্ত ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারেনি। যখন বস্তির লোকেরা মহা ভিড় ক'রে আহতদের এনে ওর বাড়ির সামনেই হাজির করলে, তখন খানিকটা বোঝা গেল। দল বেঁধে এরা হিন্দুদের সঙ্গে দাঙ্গা করতে গিয়েছিল, তারাও এসেছিল এদের সঙ্গে দাঙ্গা করতে। দুই পক্ষেরই অনেক লোক আহত হয়েছে। হিন্দুরাও এখন নিজেদের জায়গায় ফিরে গেছে। তাদের আহতদের জন্যে হয়তো অনেক ডাক্তার আছে, অনেক ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এরা অসহায় নির্বুদ্ধি গরিব বস্তিবাসী, এদের কে দেখবে? এরা তাই বরাবর রমজানের কাছে এসেই হাজির হয়েছে। সেই যে অ্যাসিড লেগে পোড়ার দরুণ ও সেদিন সহানুভূতি দেখিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা ক'রে দিয়েছি[illegible], তার থেকেই এরা ধরে নিয়েছে যে এই সব ব্যাপারে রমজান সা[illegible]ই এখন একমাত্র সহায়। ওর কাছে আহতদের নিয়ে গিয়ে ফেললে ও যা হোক কিছু একটা করবে।

করতেও হলো তাই। বাড়ির বাইরের দিকে কয়েকটা ঘর খালিই পড়েছিল, ও সেইখানে আহতদের নিয়ে রাখলে। হাসপাতালে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু কেউই কিছুতে যেতে চাইলে না।

ও তখন ওষুধপত্র আর সার্জিক্যাল সরঞ্জাম অনেক আনিয়ে ফেললে। ফার্ষ্ট এড্ সম্বন্ধে নিজেরও কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছিল, আর সেই মুসলমান ডাক্তারটিকেও নিযুক্ত ক'রে নিলে। এমনি ক'রে নতুন উদ্যমে আবার ও এই পক্ষের আহতদের শুশ্রূষাতেই লেগে গেল।

এর পরে ভবানীপুরে ধীরার কাছে শীঘ্র ফিরে যাবার সম্ভাবনা ওর ঘুচে গেল। একেই তো এমন দারুণ দাঙ্গার সময়ে মুসলমান পাড়া থেকে বেরিয়ে খাল পার হ'য়ে হিন্দুপাড়ার দিকে যাওয়াই বিপদজনক। যতই হিন্দুর মতো পোষাক পরে যাক, তাতেও কিছুতে রেহাই পাবে না। তার ওপরে অনেকগুলো আহতের সেবা শুশ্রূষার ভার নিয়েছে, তারা কতকটা সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত ছেড়ে চলে যাওয়া যায় না। ভবানীপুরে ওদের হোটেলের বাসার কাছেই কোনো ভদ্রলোকের বাড়িতে টেলিফোন ছিল। সাবান কল থেকে সেখানে টেলিফোন ক'রে ও পরেশকে সেই বাড়িতে ডেকে আনালে। তাকে বললে যে দেশ থেকে ফেরবার পথে ও এমন জায়গায় আটকে পড়েছে, যেথান থেকে এক পা বাড়ালেই গুণ্ডাদের কবলে পড়তে হবে। সেইজন্যে দাঙ্গাটা একটু না থামলে ওর যাবার কোনোই উপায় নেই। আপাতত আটকে থাকলেও ও একজন চেনা লোকের কাছে নিরাপদেই আছে। ধীরা যেন কোনো ভাবনা চিন্তা না করে, ও এখন থেকে প্রত্যহই তাদের টেলিফোন ক'রে খবর নেবে। বললে বটে এই কথা, কিন্তু কাজে তা হ'য়ে উঠলোনা। প্রায়ই টেলিফোন ধরলে কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না, ঘণ্টা খানেক ধরে বার বার চেষ্টা ক'রে শেষে বিফল হ'য়ে ফিরে আসে। দাঙ্গার ভয়ে অধিকাংশ টেলিফোন অপারেটর মেয়েরা কাজ করতে আসেনা, টেলিফোনে খবরাখবর করাও তাই তখন অচল হ'য়ে উঠেছিল।

দাঙ্গা মারামারি প্রত্যহ চলতে থাকলো। প্রকৃত দাঙ্গা হোক আর নাই হোক, তার জন্যে দস্তুরমতো আয়োজনটা নিত্যই হ'তে থাকে। কোথা থেকে যে প্ররোচনা আসে, অস্ত্রশস্ত্র কেমন ক'রে জোগাড় হ'তে থাকে, নতুন লোকজন কোথা থেকে এসে জুটে যায় তা কিছুই বলা যায়না। দেখা গেল যে রেল লাইন ধরে অপরিচিত লোকেরা এসে দল ভারী ক'রে বস্তির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। আবহাওয়াটা বেজায় ভারী ভারী। ঘোরতর কিছু একটা যেন শীঘ্রই ঘটবে।

গতিক খারাপ বুঝে পাড়ার ছক্কু সর্দারকে রমজান ডেকে পাঠালে। সে হলো ঐ বস্তির একজন মাতব্বর গোছের নেতা। তাকে বিশেষ ক'রে বলে দিলে যে ও তাদের সকল বিষয়েই সাহায্য করেছে এবং ভবিষ্যতেও করতে রাজি আছে, কিন্তু কেবল এই সর্তে যে পাড়ার সকলে শান্তভাবে বস্তির মধ্যেই থাকবে, বস্তি ছেড়ে অপর জায়গায় দাঙ্গা হাঙ্গামা করতে কেউই বেরিয়ে যাবে না। এই বস্তি থেকে কোনো আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টা কেউ যেন না করে। তবে কেউ যদি বস্তি আক্রমণ করতে আসে তাহ'লে অবশ্যই সকলে আত্মরক্ষার জন্যে যা করা উচিত তাই করবে। তাতে রমজান নিজেও যতটা পারে সাহায্য করবে। ছক্কু সর্দারকে এটা কিন্তু দেখতে হবে; কেউ যেন ওপর-পড়া হ'য়ে হিন্দুদের সঙ্গে দাঙ্গা না বাধায়। কড়া হুকুম পেয়ে ছক্কু সর্দার এতে সহজেই রাজি হ'য়ে গেল। সে বললে যে ঐ রকম উদ্দেশ্য তাদেরও নেই, আর সর্দারের হুকুম না পেলে কেউ তেমন অন্যায় কাজ কখনই করবে না।

ঐ বস্তির মুসলমানদের কতকগুলো বিশেষ গুণ দেখে ও খুবই সন্তুষ্ট হলো। তারা সকল বিষয়েই নিজেদের দলপতির বাধ্য। যাকে নেতা ব'লে একবার মেনে নেয়, নির্বিচারে তার আদেশ

মেনে সকলেই চলে। সে ভালো করছে কি মন্দ করছে তাই নিয়ে মাথা ঘামায় না। হয়তো নির্বুদ্ধি হবার দরুণই একতার এতটা মর্যাদা রেখে তারা চলতে পারে।

বস্তির মুসলমানদের মধ্যে লোকসেবার কাজ ক'রে রমজান সন্তুষ্ট হলো। হ'লেই বা এরা সাম্প্রদায়িক মুসলমান! দেখা গেল যে এরাও ঠিক সাধারণ মানুষেরই মতো। উপকারকে এরা শ্রদ্ধার সঙ্গে মাথা পেতে নিতে জানে, উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ হ'তে জানে। আর দেখা গেল যে উপকারে প্রয়োজনও এদের খুবই বেশি। অধিকাংশ লোকই দিনমজুরি ক'রে খেটে খায়। অফিসের চাকরি নয় যে যেমন ক'রে হোক মাসকাবার হ'য়ে গেলেই মাইনেটা পুরোপুরি পেয়ে যাবে। এদের কেউ বা রাজমিস্ত্রি, কেউ বা দপ্তরি, কেউ বা দোকান করে, কেউ বা ফেরি করে, আর কেউ বা সানাই বাজায়। দাঙ্গা হওয়াতে সকলেরই কাজ কর্ম একদম স্থগিত হ'য়ে গেছে। কারোই কিছু রোজগার নেই, কারোই এমন সম্বল নেই যে তাই ভাঙিয়ে বসে বসে খাবে। লুটতরাজের মাল কেউ কেউ পেয়েছিল বটে, কিন্তু তাতে খানিক ফূর্তি করাই চলে, দৈনন্দিন সংসারযাত্রা চলে না। অধিকাংশ লোকই নিতান্ত নিঃসহায় নিঃসম্বল। এরাই যে প্রথমে ইচ্ছে ক'রে দাঙ্গা বাধিয়েছিল এ কথা ঠিক সত্য নয়। রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য হয়তো কেউ বা কারাও হুজুগের ধুয়ো তুলে লোক জড়ো করে দাঙ্গা বাধিয়ে থাকবে। কিন্তু দাঙ্গা একবার বেধে যাওয়াতে কিছুকাল পরে এরাই যে তখন মরিয়া হ'য়ে উঠলো তাতে আর সন্দেহ নেই। রোজগার ঘুচে গেলে মানুষের নিরীহতাও ঘুচে যায়, তখন সে একটুতে মরিয়াই হ'য়ে ওঠে। মানুষ মাত্রেরই এই রীতি। প্রথম ঝোঁকে যারা দাঙ্গা করে, তারা করে সেটা প্ররোচনায়।

তার পরে যারা দাঙ্গা করে, তারা করে সেটা অভাবে। তখন অভাবটা কতক মিটিয়ে দিতে পারলে তারা প্রায়ই শান্ত হ'য়ে যায়।

এই সমস্ত বুঝতে পেরে রমজান ওদের অভাব অভিযোগ যথাসাধ্য মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করলে। কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন ক'রে ওদের রেশন আনিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলে। যাদের হাতে অর্থ নেই তাদের কিছু কিছু অর্থ দিয়ে সাহায্য করলে। বস্তিতে ভালো পানীয় জলের ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। যারা অসুস্থ তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা হ'য়ে গেল। চার পাঁচ দিনের মধ্যেই এত রকমের উপকার পাওয়া যাচ্ছে দেখে সবাই শান্ত হ'য়ে রমজান সাহেবের কথার বাধ্য হ'য়ে গেল। একেই তো এই নবীন বয়সের দিলদরিয়া চৌধুরী সাহেব ওদের জমিদার, তার ওপরে এমন উপকারী। সবাই যেন ওর গোলাম হ'য়ে রইল। ছক্কু সর্দার তো আগের থেকেই বাধ্য ছিল। তা ছাড়া হিয়াৎ আলি, ইয়াকুব, আলিজান, আকবর, আবদুল হক প্রভৃতি যারা যারা ও পাড়ার উৎসাহী যুবক ছিল, সকলেই ফূর্তি ক'রে ওর সঙ্গে হিতসাধনের কাজে লেগে গেল। আদেশ উপদেশ নেবার জন্যে অনবরতই তারা রমজানের কাছে ঘোরাফেরা করতে লাগলো।

ইসমাইল এখন কোথায় কি করছে জানবার জন্যে রমজানের খুবই কৌতূহল ছিল। খবর নিয়ে এবার জানলে যে সে আজকাল ধর্মতলার সাহেব পাড়াতে মস্ত এক দর্জির দোকান খুলেছে। আজকাল সে খুব মদ খায়, ট্যাক্সি চড়ে অনেক রাত্রে মাতাল হ'য়ে বাড়ি ফেরে। দুজন গুণ্ডাকে ও মাইনে দিয়ে রেখেছে, সদাসর্বদা ওর সঙ্গে সঙ্গে থেকে পাহারা দেবার জন্যে। আজকাল দাঙ্গার জন্যে প্রায়ই সে বাড়ি ফিরছে না। বাড়িতে ওর স্ত্রী আছে, আর একটি ছোটো ছেলে আছে। একদিন বাড়ি এলে রমজান তাকে ডেকে পাঠালে। বললে—

"বুড়া হিন্দু আওরৎকে খুন ক'রে তুই তার সমস্ত টাকাকড়ি চুরি ক'রে এনেছিস। জানিস আমি তোকে পুলিশে ধরিয়ে দিতে পারি?"

ইসমাইল অমনি জিভ কেটে বললে—"খুন করলুম কোথায় হুজুর? আমি তো কিছুই জানিনা।"

"আমি সেদিন তোর জান বাঁচিয়ে দিলাম, আর অমন ক'রে তুই আমারই সঙ্গে বেইমানি করলি?"

"চুরি করাটা যে আমার নেশা হুজুর, চুরি না করলে আমি থাকতে পারিনা। নইলে খাবো কি? সে জন্যে কিছু মনে করবেন না, আমায় এবারকার মতো মাপ করুন। বুড়ির কেউই নেই, ওতে কোনো দোষ হয়নি। আমি না কেড়েকুড়ে নিলে ঐ বুড়ির টাকা ভোগ করতো কে? আপনারই তাঁবেদার, এখন দুটো খেয়ে বাঁচছি।"

অতি বিনীতভাবে লম্বা একটা সেলাম ক'রে সে চলে গেল।

রমজানের পক্ষে যতটুকু করা সাধ্য সে তা করলে, কিন্তু তবুও বস্তির লোকেদের আক্রোশের নিবৃত্তি হয় না। ভেতর থেকে সেটা মাঝে মাঝে গুমরে উঠতে থাকে। যখন চারিদিকে দাঙ্গা চলছে তখন চেষ্টার দ্বারা কতকগুলো মানুষকে হয়তো তার থেকে নিবৃত্ত রাখা যায়, কিন্তু তাদের মনে থেকে থেকে যে উত্তেজনা জাগে সেটাকে নিবৃত্ত রাখা যায় না। মহম্মদ জান একজন নামজাদা রাজমিস্ত্রি। চোখ দুটো করঞ্জার মতো লাল ক'রে সে একদিন এসে বললে—"হিন্দুরা আমাদের এলাকার বুকের ওপর দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে মোটর চড়ে ফূর্তি ক'রে বেড়াবে, আর আমরা তাই দেখেও বরদাস্ত করবো? এ কিছুতেই চলবে না। আপনি একবার হুকুম দিন চৌধুরী সাহেব, এ পাড়ার মধ্যে মোটর এলেই আমরা তার চাকা ফুটো ক'রে আগুন লাগিয়ে দেবো।"

"ব্যাপার কি মিস্ত্রি? তুমি হঠাৎ অমন খাপ্পা হ'য়ে উঠলে কেন?"

"খাপ্পা হবো না তো কি বলুন! হিন্দুদের একটা জোয়ান ছোঁড়া আর একটা ছুঁড়ি মোটরে চড়ে আমাদের দিকে চেয়ে হাসতে হাসতে আমাদের মুখে ধুলো ছিটিয়ে দিয়ে চলে গেল, আর আমরা কিছুই করতে পারলুম না। ওরা চড়ে বেড়াবে মোটরে, আর আমরা না খেতে পেয়ে দাঁতে কুটো দিয়ে তাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখবো?"

"রাগটা তোমার হিন্দুর জাতের ওপর, না হিন্দুর মোটরের ওপর? ওরা যদি হিন্দু না হ'য়ে মুসলমান হতো, তাহ'লে নিশ্চয় তোমার সহ্য হতো?"

"তা কেন হবে না? মুসলমান লোকের মুসলমান পাড়াতে বেড়াতে আসবার হক আছে, আলবৎ।"

"সেটা কোনো কথাই নয়। ওরা একে জাতে হিন্দু, তাতে চড়ে এসেছে মোটরে। সেই জন্যেই তোমার এত রাগ। তোমার তেমন পয়সা নেই, তুমি সেটা পারো না। সেই জন্যেই তো রাগটা হচ্ছে? কিন্তু যদি ধরো তোমরাই কোনোদিন খুব বড়লোক হ'য়ে যাও, আর ওরা হ'য়ে যায় গরিব, তাহ'লে ওদেরও তো এমনি রাগ হ'তে পারে? ওরা যদি তখন তোমার গাড়ির চাকা ফুটো ক'রে আগুন লাগাতে চায়, সেটা কি ঠিক হবে?"

মহম্মদ জান আর কোনো জবাব করলে না। গজ্ গজ্ করতে করতে মুখ নিচু ক'রে চলে গেল।

একদিন সকালে আবার জনকয়েক লোক ভীষণ উত্তেজিত অবস্থায় চৌধুরী সাহেবের ফটকের কাছে এসে উপস্থিত। কারা যেন রাতারাতি কোনো এক বৃদ্ধ মুসলমানের মুণ্ড কেটে দাড়ি-

সমেত মুণ্ডটাকে একটা মস্ত লম্বা বাঁশের মাথায় খাড়া ক'রে ব্রিজের ওপর এমনভাবে রেখে গেছে, যাতে এই পাড়ার লোকেরা অনেক দূর থেকেই দেখতে পায়। এটা শুধুই নৃশংসতা নয়, ওদের সমগ্র সম্প্রদায়েরই এতে অপমান। এমন অপমান চুপ ক'রে সয়ে যাওয়া অসম্ভব। চৌধুরী সাহেব নাকি হিন্দুদের কোনো কিছু দোষ দেখতে পায় না. এবার এটা স্বচক্ষে একবার দেখে নিয়ে কি বলতে চায় স্পষ্ট ক'রে বলুক।

রমজান তখনই সেখানে চলে গেল ওদের সঙ্গে। পুলের কাছে গিয়ে বাঁশটা নামিয়ে মুণ্ডটাকে খুলে আনতে বললে। অনেকে ইতস্তত করছে দেখে ও নিজেই সেটা নামালে। তখন দেখা গেল সেটা আসল মানুষের মুণ্ড নয়, মাটির তৈরি নকল মানুষের মুণ্ড। কে হয়তো তামাসা ক'রে এই কাণ্ড করেছে।

যারা সেখানে দল বেঁধে হৈ হৈ করতে গিয়েছিল, তারা ঐ দেখে আরো বেশি ক্ষেপে উঠলো। বললে, এমন ধরণের তামাসা করা তো আরো বেশি অপমান! এর শোধ আরো বেশি ক'রেই নিতে হবে। যে জিনিস ও পক্ষ মস্করা ক'রে নকল দেখিয়েছে, সেই জিনিস এ পক্ষ আসল দেখিয়ে তার শোধ নেবে। কেউ যেন তাতে এবার একটুও বাধা না দেয়।

রমজান বললে—"কিন্তু তার আগে তোমরা আমাকে এইটুকু বুঝিয়ে দাও, কেমন ক'রে তোমরা জানলে যে এই কাজটা নিশ্চয় হিন্দুরাই করেছে? এমনও তো হ'তে পারে যে তোমাদেরই তরফের কেউ তোমাদের সবাইকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে নিজের স্বার্থ-সিদ্ধি ক'রে নেবার জন্যে এই কাজটি করেছে!"

এ প্রশ্নের আর কেউ জবাব দিতে পারলে না। সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো।

আর একদিন আরো একটা কাণ্ড ঘটলো। কলেজে পড়া কোনো ভদ্রঘরের হিন্দু মেয়ে বই খাতা হাতে নিয়ে ভুল ক'রে কিংবা হয়তো দুর্বুদ্ধিবশত ওদের পাড়ার মধ্যে ঢুকে পড়েছিল। কয়েকজন গুণ্ডাশ্রেণীর লোক তাকে জোর ক'রে ধরে এনে নিজেদের পাড়ার মধ্যে একটা বাড়িতে আটক করে। তাকে নিয়ে কি করা হবে এই সম্বন্ধে অনেক রকমের সলাপরামর্শ চলতে থাকে। সেখানে রমজানের অতিবাধ্য চেলাও দু'চার জন উপস্থিত ছিল। মেয়েটির ওপর অত্যাচারের সম্ভাবনা দেখে তারা ছুটে ওকে খবর দিতে যায়। ও তখনই তাদের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হয়। কিন্তু সেখানে গিয়ে মেয়েটিকে সে দেখতে পায়নি। রমজান পৌঁছে যাবার আগেই ছক্কু সর্দার সেখানে গিয়ে পড়েছিল। রমজান সাহেব পাছে এটা জেনে ফেলে রাগ করে, এইজন্যে সে তখনই তাড়াতাড়ি তাকে নির্বিঘ্নে ব্রিজ পার করিয়ে দিতে নিজেই সঙ্গে নিয়ে চলে গেছে।

রমজান তবুও বললে—"মেয়েছেলেকে অমন ক'রে ধরে আনা তোমাদের খুবই অন্যায় হয়েছে।"

ভিড়ের ভেতর থেকে কে একজন বললে—"মেয়েছেলে নয় সাহেব, সে বেটাছেলের ওপরে যায়। ঐটুকু একরত্তি লড়কির সাহস কি! প্রাণে একটুও ভয় ডর নেই। বলে কিনা, নিয়ে চলো আমাকে তোমাদের রমজান চৌধুরীর কাছে, দেখি সে আমার কি করতে পারে! ছক্কু সর্দার হঠাৎ এসে পড়লো তাই, নইলে"—

"সে তো কোনো দোষ করেনি, সেই জন্যেই তার অতো সাহস। তোমরাও যে কোনো দোষ ক'রে ফেলোনি, সেইটেই খুব ভালো কথা। এমন যেন আর কখনো না হয়। মেয়েছেলের

সম্বন্ধে কোনো দোষ করলেই তোমাদের নিজেদের মন ছোটো হ'য়ে যাবে, তখন আর কোনোদিক সামলাতে পারবে না।”

কিন্তু এতটা চেষ্টা যত্ন করা সত্বেও ওর উদ্দেশ্য সফল হলো না। বস্তির লোকদের কিছুতেই শান্ত রাখা গেল না। একদিন গভীর রাত্রে হিন্দু পশ্চিমাদের একটা দল চুপি চুপি এসে ওদের বস্তির একপাশে পেট্রল ঢেলে আগুন লাগিয়ে দিলে। তাদের বস্তিতে অন্য কোনো একটা পাড়ার মুসলমানেরা হয়তো একদিন এমনি ক'রেই আগুন লাগিয়েছে, সেই রাগে তারা ক্ষেপে উঠে এমন বোকামির কাজ করলে। এক জায়গাতে কতকগুলো কাঠ জমা করা ছিল, পেট্রল ঢালার ওপর আগুন লেগে সেগুলো দাউ দাউ ক'রে একসঙ্গে জ্বলে উঠলো। তাড়াতাড়ি ফায়ার ব্রিগেডের দমকল এসে আগুন নিবিয়ে ফেললে বটে, কিন্তু ওদের বস্তির রীতিমত খানিকটা ক্ষতি হ'য়ে গেল।

এবার ওরা যথার্থই ক্ষেপে উঠলো। একেই তো মুসলমানদের মধ্যে আপন সম্প্রদায়বোধের ভাবটা হিন্দুদের চেয়ে কিছু বেশি। সম্প্রদায়ের মধ্যে কারো অনিষ্ট হ'লে সেটা নিজের অনিষ্ট ব'লেই প্রত্যেকে মনে করে। তার ওপরে কোঠা বাড়িতে যারা থাকে তারা প্রতিবেশী হ'লেও পরস্পরের মধ্যে যেমন একটা দুস্তর নির্লিপ্তভাবের স্বাতন্ত্র্য রেখে চলতে জানে, বস্তির খোলার বাড়িতে যারা থাকে তারা ঐ ধরণের স্বাতন্ত্র্য বোঝে না। পরস্পরে হয় ঝগড়া করে নয় ভাবসাব করে। কিন্তু যাই করুক, একজনের বিপদ হ'লে সেটা প্রত্যেকের মধ্যেই যথেষ্ট ছায়াপাত করে। তার কারণ অল্পই এদের পুঁজি। একরত্তি ফালি ফালি ক'রে এদের ঘরবাড়ি, অল্প একটু গণ্ডীর মধ্যে সামান্য একটুখানি আবেষ্টন রচনা ক'রে আপন

আপন সংসার নিয়ে ওরা টায়েটোয়ে বসবাস করে। ওরা জানে, সামান্য একটুতেই ওদের সেই অতি যত্নে বাঁধা আশ্রয়ের নীড়টুকুর মারাত্মক সর্বনাশ হ'য়ে যেতে পারে। তারই ঈষৎ কিছু সম্ভাবনা দেখলেই ওরা তাই হঠাৎ মরিয়া হ'য়ে ওঠে। বিশেষ ক'রে মেয়েদের আর কাচ্চাবাচ্চাদের নিরাপদে আগলে রাখবার ব্যাপার নিয়ে ওদের পুরুষদের স্বভাবটা নববৎসা গাভীর শিং নাড়ার মতো একটু অত্যধিক মাত্রায় উগ্র। সেটা এমনিতে বেশ ঘুমিয়ে থাকে, কিন্তু একবার কোনো দিক থেকে নাড়া খেয়ে জেগে উঠলে আর নিস্তার নেই, তাকে শান্ত রাখা তখন খুবই কঠিন।

খুবই চঞ্চল হ'য়ে উঠলো বস্তির লোকেরা। তাকে ঠিক জিঘাংসাও বলা যায় না। উদ্বেগ, আতংক, রাগ, আর স্নায়বিক উত্তেজনাতে মিলিয়ে মিশিয়ে একটা জটিল রকমের ক্ষিপ্ততা। যখন তখন বিনা কারণে "আল্লা-আল্লা-হো" ব'লে সমবেত কণ্ঠে ওরা খামখা ওঠে চেঁচিয়ে। বহু দূর পর্যন্ত সে তুমুল শব্দ ধ্বনিত হ'তে থাকে, লোকে ভাবে কি একটা ঘটলো বুঝি। বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পথের ধারে সারে সারে গুম্ হ'য়ে সবাই চুপচাপ বসে থাকে, চোখে একটা সন্দিগ্ধ হিংস্র তীব্র দৃষ্টি, যেন কিসের প্রতীক্ষায় ওৎ পেতে বাঘের মতো চেয়ে আছে। মাঝে মাঝে অনেকগুলো মাথা এক এক জায়গায় একত্রিত হয়। চাপা গলায় কি জটলা করে, এদিকে ওদিকে বারে বারে চাইতে থাকে, দূরে কেউ আসছে দেখলেই থেমে যায়। রাত্রে কেউ ওরা ঘুমোয় না। অনেকেই মেয়েদের কাচ্চা-বাচ্চাদের সমেত পাঠিয়ে দেয় চৌধুরী-সাহেবদের কোঠা বাড়ির বারান্দায় উঠোনে দালানে, আর পুরুষেরা সবাই মিলে মশাল জ্বেলে অনবরত পাহারা দেয়। অধিকাংশের মনে হিংসার চেয়ে আতংকটাই বেশি, জিঘাংসার

চেয়ে প্রাণরক্ষার তাগিদটাই বেশি। রাত্রে বেশিক্ষণ চুপ ক'রে থাকতেও ভয় পায়। তাই বস্তির এ পাশ থেকে একদল যখন চেঁচিয়ে ওঠে, তখন অপর পাশ থেকে অন্য দল তার চেয়েও জোরে সাড়া দেয়। তখন যেন ওরা কিছু ভরসা পায়।

এমনি একটা অস্পষ্ট আতংককে সহ্য ক'রে বেশিদিন থাকা কষ্টকর। বোঝা গেল যে নিজেদের এই বিভীষিকাটাকে ঝেড়ে ফেলতে শীঘ্রই ওরা মরিয়া হ'য়ে অন্য কারোদের ওপরে নিষ্ঠুরভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে। রমজান বার বার ক'রে বলে দিয়েছে যে অসংখ্য হিন্দুর মধ্যে ওরা মাত্র এই কয়েক ঘর মুসলমান, ইচ্ছে করলে তারা ওদের পিষে মেরে ফেলতে পারে। কিন্তু সে ভয়ও ওদের রইল না। একদিন রাত্রে দেখা গেল যে বালবৃদ্ধবনিতারা বাদে গোটা বস্তিটাই যেন জনশূন্য। সে রাত্রে মশালও কেউ জ্বাললে না, পাহারাও কেউ দিলে না। সব যেন নিস্তব্ধ। পরের দিন সকালে দেখা গেল, বস্তিতে আবার লোকজন ফিরে এসেছে, কিন্তু সবাই কেমন চুপচাপ। রমজান নিজে যখন সন্ধান নিতে গেল, তখন দেখলে প্রত্যেক ঘরে ঘরেই দু একজন ক'রে পুরুষ আহত হ'য়ে পড়ে রয়েছে। অনেকেরই হাত মুখ পুড়ে গেছে, স্থানে স্থানে লাল দগ্‌দগে ঘা বেরিয়ে পড়েছে। কেউ কেউ গুলি খেয়েছে, আহত স্থানটা ময়লা পাড়ের ফেট্টা দিয়ে বেঁধে রেখেছে। ছক্কু সর্দারকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মহম্মদ জান প্রভৃতি আরো কয়েকজনকে পাওয়া যাচ্ছে না। কিন্তু সবাই চুপচাপ, কারো মুখে হাসি নেই, কারো চোখে কান্না নেই। জিজ্ঞাসা করলে কেউ কোনো কথাই বলে না। রাতারাতি কে জানে কোথায় অনেক দূরে ওরা হয়তো ওদেরই মতো কোনো এক অত্যন্ত গরিব হিন্দু বস্তির ওপরে গিয়ে চড়াও হয়েছিল। জ্ঞানশূন্য উন্মাদের মতো হ'য়ে

ওরা সেখানে আগুন লাগিয়েছে, মানুষ মেরেছে, শিশুহত্যা করেছে, নারীধর্ষণ করেছে, বীভৎস চীৎকার করতে করতে অনেক লোকের সুখের সংসারকে ধ্বংস করেছে, পিশাচের মতো তাণ্ডব নৃত্য করেছে, তার পরে হয়তো গুলি খেয়ে ক্ষান্ত হ'য়ে পালিয়ে এসেছে। এখন আর আতংক নেই, উদ্বেগ নেই, একেবারে চুপচাপ।

মানুষ কি শুধুই জানোয়ার? কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে তার চেয়ে আরো বেশি ভয়ংকর। কিন্তু তার জন্যে কি মানুষই দায়ী, না মানুষের স্বভাব দায়ী? তা তো নয়, দায়ী মানুষের আজ-কালকার এই অর্ধ-অজ্ঞতা, এই অর্ধ-মূঢ়তা। পুরোপুরি অন্ধকারে থাকা যায় তো সেও ভালো, আর পুরোপুরি চক্ষুষ্মান হওয়া যায় তো সেও ভালো। কিন্তু এমনি আধা-চোখে চাইলেই মানুষ কেবল বাঁকা দেখে, আর কেবল ভুল পথে চলে। এমনিই হলো মানুষের জ্ঞান-থাকতেও ভুল পথে চলা। আজকাল চালাক হ'য়েও সকলেই সেই ভুল পথে চলছে। কোনো কালে এ ভুল ভাঙবে কিনা তা কে জানে!

পনেরো

উত্তেজনার পরেই অবসাদ। এ পক্ষেও যখন তাই আর ও পক্ষেও তাই, তখন আপনা থেকেই দাঙ্গাহাঙ্গামা থেমে এলো। কেউ বললে বড়লাটের হুকুমে মিলিটারি এসে পড়াতেই এটা থেমেছে। কেউ বললে যেমনি কারফিউ আইন হলো অমনি ও সব থামতে বাধ্য হলো। আবার কেউ বললে তা নয়, পিউনিটিভ জরিমানা দিতে দিতেই বাছাধনদের (অর্থাৎ অপর পক্ষের) লপচপানি ঠাণ্ডা মেরে গেল। তবে যদিও দাঙ্গা থামলো বটে, কিন্তু চোরাগোপ্তায় খুনোখুনি আর হাতবোমা ছোঁড়াছুঁড়ি তখনও দু'একটা চলছে। কারো কারো ব্যক্তিগত কণ্ডুয়ণ তখনো পর্যন্ত একেবারে নিবৃত্ত হয়নি।

রঞ্জন ধীরার কাছে যাবার জন্যে আবার ছটফট শুরু করলে। পনেরো দিনের চেয়েও বেশি হ'য়ে গেল, বাগমারি অঞ্চলেই সে আবদ্ধ হ'য়ে রয়েছে। বাইরের মুক্ত জগতের সঙ্গে কোনোই যোগাযোগ নেই। এমনি ক'রে গণ্ডীর মধ্যে বন্দী হ'য়ে থাকতে ও মোটে অভ্যস্ত নয়। যদিও মাঝে মাঝে টেলিফোনের মারফৎ ধীরাদের খবরাখবর দৈবাৎ দু'একবার পেয়ে গেছে, কিন্তু তবু আর তো ওখানে থাকা যায় না।

যখন দেখলে বস্তির লোকগুলো শান্ত হয়েছে, আর আহত যারা হয়েছিল তারাও কিছু কিছু সুস্থ হয়েছে, তখন ও মনে মনে সংকল্প করলে যে কালই আমি চলে যাবো। কেবল একদিন আগের থেকে ফতিমা বিবিকে একটু জানান দিয়ে রাখা দরকার। ফতিমা বিবির কাছে বসে আগে খানিকটা গল্প জমিয়ে নিতে

হবে, তার পরে তাঁর মেজাজটা খুশি ক'রে নিয়ে কিছুদিনের জন্যে চলে যাবার কথাটা বেশ গুছিয়ে বলতে হবে। এই সমস্ত মতলব ক'রে নিয়ে সে ফতিমা বিবির ঘরে ঢুকলো।

ফতিমা বিবির কাছে বসে রঞ্জন নানারকমের গল্প শুরু করলে। বললে, এইবার একটু ধীরে সুস্থে কথা বলবার ফুরসৎ পাওয়া গেছে। বাড়িতে ঢুকে পর্যন্তই একটার পর একটা যে সব গণ্ডগোল শুরু হলো, ছোটো মায়ের কাছে বসে দুটো যে কথা বলবে তারও সময় ছিল না। একে তো বাড়িতেই গেল মহা বিপদ, তার ওপরে এই সব দাঙ্গা হাঙ্গামার কাণ্ড। ক'দিন যে কি উদ্বেগের ভেতর দিয়েই কেটে গেল! ভাগ্যিস দাঙ্গার আগে এসে পড়েছিল!

ফতিমা বিবি বললেন—"তোর কি আসল কথাটা তাই বল না! পালাবার মতলব তো?"

"আচ্ছা, সে কথা তো পরে বলছি। আগে তাহ'লে আরও একটা গোপন খবর তোমায় বলি। সেই যে অনেক দিন আগে একটা বিশেষ কথা তোমার কাছে লুকিয়ে রেখেছিলুম, তুমি জানতে চাইলে বলেছিলুম যে পরে বলবো, এখনও বলবার সময় হয়নি,—সেটা তোমার মনে পড়ছে নিশ্চয়? এইবার সেটা তোমাকে বলবার সময় হয়েছে। শুনলে রাগ করবে না তো?"

"এমন কি কথা যে শুনলে আমি রাগ করবো? বিলেত যাবার ফন্দি টন্দি নয় তো?"

"না না, তুমি মোটে ধরতেই পারলে না। ও সব মতলব আমি অনেকদিন আগেই ছেড়ে দিয়েছি। তা নয়। বড়ো মা আমার বিয়ে দেবার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়েছিলেন না? তাঁকে সেই

কথাই আমি এবার বলতে এসেছিলুম। তা তিনি তো সে কথা শোনবার আগেই চলে গেলেন। এখন তোমাকেই বলি, আমি একটা বিয়ের ঠিক ক'রে ফেলেছি।"

"সে কি রে? আমাদের কাউকে না জানিয়ে তুই কোথায় বিয়ের ঠিক করলি?"

"শুধু ঠিক করা নয়, সে এক রকম হ'য়েই গেছে ধরে নাও। কিন্তু এ বিয়ে তোমার হয়তো মোটে পছন্দই হবে না। তোমাদের জাতের মেয়ে তো নয়, সে একজন হিন্দুর মেয়ে।"

"অ্যাঁ? কোথাকার কোন একটা কেলে মেয়েকে তুই বুঝি না জানিয়ে বিয়ে ক'রে ফেললি? আমার চেয়েও সে অনেক কালো তো?"

"না গো, কালো কেন হবে? অনেকটা তোমারই মতো গায়ের রং। কলেজে এখনও পড়ছে।"

"কলেজে পড়ছে, তা বুঝতেই পেরেছি। কিন্তু তুই যে বলছিস আমার মতো ফর্শা। সত্যি বল দেখি এটা সত্যি না মিথ্যে?"

"আমি কি তোমায় মিথ্যে কথা বলছি?"

"আচ্ছা বল দেখি, দেখতে একটু বেঁটে মতন হবে তো?"

"বেঁটে কেন হবে? তোমার সব আন্দাজই ভুল হচ্ছে। এ বেশ লম্বাটে গড়ন। তোমার চোখে খারাপ লাগবার মতো মোটেই নয়।"

"যাক বাপু, তাই হ'লেই হলো। দেখতে যদি তেমনি সুন্দরী হয়, তাহ'লে হিন্দুর মেয়ে হ'লেই বা তাতে দোষ কি আছে? তোরা আজকালকার ছেলে, আমাদের পছন্দ মতো বিয়ে না ক'রে যে নিজের মনের মতো দেখে শুনে বিয়ে করবি, এ তো জানা কথা। এতে আমি কিছু দোষ দেখিনা। এই বুঝি তুই ভয়ে ভয়ে আমার কাছে

এতদিন পর্যন্ত লুকিয়ে রেখেছিলি ? এতে আর ভয় করবার কি আছে ? ঘরে এনে তাকে কলমা পড়িয়ে জাতে নিয়ে নিলেই সব গোলমাল মিটে গেল ।”

“কিন্তু সে তো এখানে আসবেনা ! তাকে আলাদা জায়গায় রেখেছি, আলাদা জায়গাতেই তাকে নিয়ে আমার বরাবর থাকতে হবে । তোমার এ বাড়িতে আমার বৌও আসবে না, আমিও আর থাকবো না । এ বাড়িও তোমার, এখানকার যা কিছু সব সম্পত্তিও তোমার রইল । আমার এখানে কিছুই নেই । আমি কার ছেলে, কোথায় জন্মেছি, সব কথাই এখন জানতে পেরেছি । আমি তোমাদের কাছে কোনো কথাই কখনো লুকোইনি, আর তোমরা সবাই মিলে আমার কাছ থেকে এ পর্যন্ত আসল কথাটাই লুকিয়ে রেখেছিলে । আমি যে তোমাদের কেউ নই, আমি যে হিন্দুর ছেলে, এ কথা একবারও কেউ আমাকে বলোনি ।”

ফতিমা বিবির মুখখানা ক্ষণিকের জন্যে মলিন হ'য়ে গেল । কিছুক্ষণ তিনি চুপ ক'রেই রইলেন । তার পরে বললেন—“এত কথা তুই জানলি কেমন ক'রে ?”

“জানতে পারলুম আমার সেই আসল হিন্দু মায়েরই কাছ থেকে । হঠাৎ তাঁর সঙ্গে আমার দেখা হ'য়ে গিয়েছিল, আমার এই কাটা আঙুলটা দেখেই তিনি চিনতে পারলেন ।”

“বেশ তো, তাতে আর কি হয়েছে ? আর একটু বড় হ'লে আমরাও একদিন তোকে এ সব কথা জানিয়ে দিতুম, চিরকাল কিছু আর এ কথা লুকিয়ে রাখতুম না । আমাদের কাছে তুই ভালো ক'রে দুদিন থাকলি কখন যে বলবো ? কিন্তু তোর সেই হিন্দু মা যতই যাই বলে থাকুক, তবুও তুই আমাদেরই ছেলে । এত কাল পরে

তার ছেলে কেমন ক'রে হ'তে পারিস? সে তোকে কেবল পেটেই ধরেছিল, তা ছাড়া আর কিছু নয়। তাতে আর কি হলো? তবুও তুই আমাদেরই ঘরের ছেলে রইলি, আমিই তোর আসল মা। একদিন তার পেট থেকে কবে বেরিয়েছিলি বলেই সে আজ হ'য়ে গেল আপন, আর আমরা এতদিন পর্যন্ত তোকে মানুষ ক'রেও হ'য়ে গেলুম কিনা পর? এই কথা তুই বলতে চাস?"

"আহা, তাই কি আমি বলছি? তুমি আমার যেমন ছোটো মা আছো তেমনি চিরকাল থাকবে।"

"আর সেই নতুন খুঁজে পাওয়া হিন্দু মা-টি হবে বুঝি তোর নতুন বড়ো মা?"

"তিনি বেঁচে থাকলে কি হতো তা আমি বলতে পারি না, কিন্তু তিনিও কিছুদিন আগে মারা গেছেন। তোমার এই নিয়ে এত হিংসে করবার কোনোই দরকার নেই। সে কথা এখন যাক; কিন্তু তোমরা যে আমার কতখানি অনিষ্ট করেছো তাই একবার ভেবে দেখো। আমি হলুম হিন্দুর ছেলে, হিন্দুদের মতোই আমার মনটা তৈরি, হিন্দুর মতোই আমি থাকতে চাই। কিন্তু তোমরাই সেটা হ'তে দিলে না, হিন্দুর ঘর থেকে কেড়ে এনে আমাকে মুসলমান বানিয়ে রাখলে। আর কাউকে এ সব কথা বলা যাবেনা, কিন্তু আমার সব কথাই তোমাকে খোলাখুলি বলা চলে, তাই আজ বলছি। একটু খারাপ শোনালেও এতে যেন তুমি কিছু মনে করোনা। কিন্তু তুমিই তো জানো, কত ছেলেবেলা থেকেই আমি সেই রমজান নামটা বদলে দিয়ে রঞ্জন চৌধুরী হয়েছিলুম। তখন না হয় খুব ছোটো ছিলুম, কিন্তু বড়ো হ'য়েও আমি রঞ্জন চৌধুরী বলেই সকলের কাছে নিজের পরিচয় দিয়েছি। এখানে তোমরাই শুধু জানো যে আমি রমজান, কিন্তু কলেজের বন্ধু-

বান্ধব সবাই জানে যে আমি রঞ্জন। কিন্তু এর পরে আমার দুর্দশা কি হবে বলো দেখি? এই ধরো, তুমি আমার এতখানি আপনার মায়ের মতো হ'লেও সে কথা আমি কাউকে প্রকাশ্যভাবে জানাতে পারবো না যে তুমি আমার মা।"

"কেন? যে হিন্দু মায়ের পেটে হয়, তার বুঝি আর কোনো মুসলমান মা থাকতে নেই?"

"তুমি কিছুই বুঝতে পারছো না। এখানে যে আমার আসল পরিচয়টা নিয়েই কথা হচ্ছে! লোকে যদি জানে যে তুমি আমার মা, আর মুস্তাফা সাহেব ছিলেন আমার বাবা, কারণ তাঁরই সমস্ত বিষয় সম্পত্তি আমি পেয়েছি, তাহ'লে কি আর আমার কথা কেউ বিশ্বাস করবে? বলবে যে মিথ্যে ক'রে হিন্দু পরিচয় দিয়ে আমি সবাইকে ঠকিয়েছি, আর নিজের পরিচয় লুকিয়ে আমি একটি হিন্দুর মেয়েকে বিয়ে করেছি। অথচ এদিকে আমি বাস্তবিকই হিন্দুর ছেলে। সব চেয়ে বেশি মুশকিল হবে আমার বৌকে নিয়ে। সে যদি এ সব শোনে, তাহ'লে কেমন ক'রে তাকে বোঝাবো? সে বলবে, আমার ভালোবাসার পাত্র হ'য়ে তুমি কিনা আমাকে ঠকিয়েছো! অথচ বাস্তবিকই তো আমি কাউকে ঠকাইনি, বাস্তবিকই দেখা যাচ্ছে যে আমি হিন্দুর ছেলে।"

"হিন্দু মেয়ের পেটে জন্মালেই বুঝি হিন্দুর ছেলে হয়? বাপের পরিচয়টা দেখতে হবে না?"

"আহা, সেটা তো জানা কথাই। মা যখন হিন্দু, তখন বাপও ছিল হিন্দু। শুধু হিন্দু বললেই সবটা বলা হয় না, তারা ছিল ব্রাহ্মণ।"

"ওরে বোকা, তুই হিন্দুর ছেলে নয়, তুই হলি মুসলমানের ছেলে।

একজন হিন্দু মেয়ের পেটেই শুধু জন্মেছিলি। কিন্তু উনিই ছিলেন তোর বাবা। ঐ মুস্তাফা সাহেব।”

এবার আবার স্তম্ভিত হ'য়ে গেল রঞ্জন। প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করতে পারলে না, তার পরে ক্রমে ক্রমে সবই বুঝতে পারলে। ফতিমা বিবি যা জানতেন, সব কথাই ওকে বললেন। হিন্দু মহিলাটি কিছু ধনসম্পত্তির মালিক হ'য়ে অল্প বয়সেই বিধবা হয়েছিলেন। তখন মুস্তাফা সাহেবের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে. একসঙ্গে টাকা দিয়ে দুজনে সিনেমার ব্যবসা শুরু করেন। ক্রমে দুজনের মধ্যে স্বামীস্ত্রীর মতোই একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ঘটে যায়। মুস্তাফা সাহেব তাঁকে বিয়েও করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি ছিলেন গোঁড়া হিন্দু, ধর্ম ত্যাগ করতে কিছুতেই রাজি হননি। অগত্যা ওঁদের সম্পর্কটা গোপনেই রাখতে হয়। ফতিমা বিবিও এটা তখন জানতেন না। সন্তান যখন জন্মালো তখন মুস্তাফা সাহেব তাকে কুড়িয়ে পেয়েছেন বলেই নিজের বাড়িতে এনে রাখলেন। ফতিমা বিবি অবশ্য তখনই কিছু কিছু বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু মুস্তাফা সাহেব বলতে চান না দেখে বিশেষ কিছু আর জিজ্ঞাসা করেন নি। এটুকু জেনেই সন্তুষ্ট ছিলেন যে ছেলেটি চিরদিনের জন্য হ'য়ে গেল তাঁরই। তার পর মৃত্যুর সময় মুস্তাফা সাহেব সব কথাই ওঁকে আর রাবিয়া বিবিকে বলে যান।

হিন্দু নয়? ও তবে—মুসলমান? মুসলমান!! হিন্দু মায়ের পেট থেকে ওর জন্ম হ'তে পারে, হিন্দু জাতের রক্তও ওর শরীরে থাকতে পারে। কিন্তু মুসলমান বাপের ঔরসে ওর উৎপত্তি। মুসলমান বাপের বীর্য থেকে পেয়েছে এই মনুষ্যজীবন, মুসলমান পিতৃপুরুষের বীজ-টুকু থেকেই গড়ে উঠেছে ওর এই দৈহিক অবয়ব। ফতিমা বিবি

আজ ওঁর এই জটিল পরিচয়টুকু ওকে জানিয়ে দিলেন। জটিল হলেও অসম্ভবও কিছু নয়, অস্বীকার করবারও কিছু নেই।

লোকবিচারে কথাটা অগৌরবের। লোকের কাছে হয়তো পরিচয়টা কদর্য শোনাবে। ওর নিজের কাছেই কেমন কেমন ঠেকতে লাগলো। লজ্জায় সংকোচে রমজান মনে মনে নিজের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা হারাতে লাগলো। যে পরিচয় কিছুতেই লোকের কাছে ব্যক্ত করা যায় না, সেই পরিচয় হলো কিনা ওর নিজেরই! ও যে সকলের কাছে প্রখ্যাত, সকলের চেয়ে বিশিষ্ট হ'তে চেয়েছিল, আর ওই কিনা আজ হ'য়ে গেল নিজের কাছে পর্যন্ত হেয়! অথচ এই নগ্ন সত্যকে আর তো সন্দেহ করলে চলবে না, একে আর গোপন করলেও চলবে না। এই সত্যকে মাথা পেতে এখন মেনে নিতেই হবে। মুসলমান পিতা আর হিন্দু মাতার থেকে ওর জন্ম,—এই কথাট ওকে স্পষ্ট ক'রে বলতে হবে। না বলতে পারলে যে আরো হীনতা! একদিকে সংকোচ, আর একদিকে এই সত্য। দুইএর মধ্যে একটা অবিরোধ সংগতি ওর কাছে কেমন ক'রে ঘটতে পারে? হে সকল জাতের সকল মানুষের সৃষ্টিকর্তা, হে মূল মানবের অন্তরলোকের পরমেষ্ঠি পরমেশ্বর, হে রহস্যময় রঞ্জনের ভাগ্যবিধাতা, ওকে এবার পথ দেখিয়ে দাও। কেমন ক'রে ও লোকের সঙ্গে কথা বলবে? কেমন ক'রে সত্যকে অকুতোভয়ে অকুণ্ঠিতচিত্তে স্বীকার ক'রে নিজেকে চিরদিনের জন্যে সংকোচমুক্ত করবে?

চিন্তার এই অকূল সমুদ্রে একটা কূল দেখিয়ে দিলেন ফতিমা বিবি। তিনি একটু হেসে বললেন—"হ্যাঁ রে, মাথা ঘামিয়ে অতো কি ভাবছিস বলতো? মুখটা যে তোর কালো হ'য়ে গেল! নামে মুসলমান বললেও কি কাজে অন্য রকম হওয়া যায় না? কাকে তোর

হিন্দু হওয়া বলিস সেটা হয়তো আমি বুঝিনা, কিন্তু নিশ্চয় তুই যেমন হ'তে চাস সেটা নিজের মনে বুঝে রেখেছিস? বেশ তো, যেমন হ'তে সাধ যায় তেমনি হ'য়ে পড়না কেন! কে তোকে আটকাচ্ছে? নামেই কি যত গণ্ডগোল, নামটাই কি তুই চেয়েছিলি? যদি বলিস যে রঞ্জন চৌধুরী একজন মুসলমানের ছেলে, তাহ'লেই কি তোর সর্বনাশ হ'য়ে যাবে? নিজের জোরে তুই দেখিয়ে দিতে পারবি না, যে নামে মুসলমান হ'য়ে তুই এখনকার হিন্দুদের চেয়েও অনেক ভালো হ'তে পারিস?"

এতক্ষণে একটা কুল পাওয়া গেল। সত্যিই তো! ফতিমা বিবি যা বললেন সেটা যে ওর নিজেরই অন্তরের কথার মতো। অথচ নিজের বেলাতে ও সেই নিজের কথাটাই ভুলে যাচ্ছিল! তবে ঐ আদর্শকেও এখন অতিক্রম ক'রে যেতে হবে, ওর চেয়েও কঠিন সংকল্প ওকে গ্রহণ করতে হবে।

একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে রঞ্জন বললে—"তুমি ঠিকই বলেছো ছোটো মা। আজ থেকে অমি হচ্ছি মুসলমান। হিন্দুত্ব এখন তোলা থাক, আমার এখনকার পরিচয় এই যে আমি হচ্ছি মুসলমান। তা না হ'লে সকলকেই ঠকানো হয়। আগে না বুঝতে পেরে তাই করেছি, কিন্তু এখন বুঝতে পারবার পরে আর তা করা যায় না। আমার হিন্দু মা বেঁচে থাকলেও তোমাকে ফাঁকি দিয়ে তাকে মা বলতে কখনই পারতুম না। মুসলমানিকে ফাঁকি দিয়ে আমার হিন্দুয়ানি করা চলবেনা। আগে হই পুরোপুরি মুসলমান, তার পরে যেমন আমি হ'তে চাই তা হ'তে পারবো। সত্যকে আগে স্বীকার ক'রে নিই তবে তো সে কথা! হিন্দু হ'তে আমি হয়তো খুবই ভালোবাসি কিন্তু গোঁজামিল দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সেটা হয় না। আর আমি

কিছু লুকোবো না। যাকে বিয়ে করেছি তাকেও এবার বলবো যে আমি মুসলমান।"

"নিশ্চয় বলবি। যা সত্যি কথা তা কার ভয়ে তুই বলবি না? আর যাকে তুই বিয়ে করেছিস কিংবা করবি, তাকে আলাদা ক'রেই বা রাখবি কেন? তাকে তুই এইখানে আমার কাছে নিয়ে আয়, আমার সঙ্গে থেকে তোর ঘর করতে শিখুক। কলেজ থেকে তাকে ছাড়িয়ে দে, বিয়ে করা বৌ আর কেন কলেজে পড়বে? এখন তাকে অন্য রকমের পড়া পড়তে হবে। তোর নিজের যে বৌ হলো, সে কেন তোর মতে চলবে না? তবে আর তার ভালোবাসা কিসের? যাকে স্বামী বলে স্বীকার ক'রে নিয়েছে, সে হিন্দু হ'লেও তার ঘরে যাবে; আর মুসলমান হ'লেও তার ঘরে যাবে। তবেই না তার ভালোবাসা!"

"আর যদি সে এখানে আসতে না চায়?"

"তাহ'লে বুঝবো, সে তোকে সত্যিকার ভালোবাসে না।"

"ভালো কিন্তু সে সত্যিই বাসে, এটা আমি বরাবরই জানি। নইলে কি আর বিয়ে হতো?"

"তবে নিশ্চয়ই সে আসবে। তুই দেখে নিস, যে তোকে সত্যিই চায় সে তোর সঙ্গে নিশ্চয়ই আসবে।"

তখন মায়েতে আর ছেলেতে অনেক রকমের পরামর্শ হলো। কেমন ক'রে তাকে আনা হবে, কোন ঘরে তাকে থাকতে দেওয়া হবে, ঘরে কি কি সরঞ্জাম এনে রাখা হবে, কি কি জিনিস সে পছন্দ করে, এমনি কত রকমের কথা। সব কথা হ'য়ে যাবার পরে রঞ্জন বললে —"তবে আজই আমি চলে যাইনা কেন?"

"আবার তোর সেই পালাবার মতলব?"

"না না, এখন আর তাহ'লে পালাবো কেন? আজই গিয়ে আজই তাকে অন্তত একবারের জন্যেও এখানে আনবার চেষ্টা করবো।"

"চেষ্টাই বা বলছিস কেন, আর একবারের জন্যেই বা বলছিস কেন? আজই তাকে এখানে তুই এনে ফেল দেখি, তার পরে দেখবি সে আর নিজেই এখান থেকে যেতে চাইবে না। স্বামীর ঘর দেখতে পেয়ে কেউ কি আবার সে জায়গা ছেড়ে চলে যেতে চায়? আর আমিই বুঝি তাকে ছেড়ে দেবো? আমার ছেলের বৌ হ'য়ে সে আমার কাছে আসছে, আমি কি তাকে এক কথায় নিজের ক'রে নিতে পারবো না? তুই তখন দেখবি, আমি কি করি। তোর চেয়েও অনেক বেশি ক'রে আমাকেই সে তখন চাইবে। নিয়ে আয় তাকে, ঘরে একটা বৌ পেয়ে বাঁচি। বড়দিদি চলে যাবার পর থেকে সারা বাড়িটা খাঁ খাঁ করছে। একা একা কি এখানে থাকা যায়? বৌ এলে আমার তবু একটা সঙ্গী হবে।"

"তাহ'লে আজই আমি চলে যাই?"

"তা যা, কিন্তু আজই বৌকে নিয়ে ফিরে আসা চাই।"

"নিশ্চয়।"

তখনই রঞ্জন ভবানীপুরের দিকে উর্ধশ্বাসে ছুটলো।

ষোলো

যখন সে ধীরার কাছে গিয়ে পৌছলো, তখন পরেশও সেখানে বসে রয়েছে। ড্রইং রুমে ঢুকেই পরেশকে দেখতে পেয়ে সে যেন একটু থমকে গেল। তাড়াতাড়ি ধীরাকে বললে—"শুনে যাও ধীরা, তোমার সঙ্গে একটা দরকারী কথা আছে।"

ধীরা ওর সঙ্গে চলে গেল শোবার ঘরে। তারও মুখখানা হঠাৎ ভার হ'য়ে উঠেছে, কেমন একটা থম্‌থমে ভাব। রঞ্জন কিন্তু এটা লক্ষ্যই করলে না। নিজের আনন্দে শোবার ঘরে ঢুকেই পরম আগ্রহের সঙ্গে ও ধীরাকে জড়িয়ে ধরে সজোরে একবার আলিঙ্গন করলে। তারপরে বললে—"নিশ্চিন্ত হলুম ধীরা। অনেকদিন তোমাকে না দেখে ভারী আমার কষ্ট হচ্ছিল। চলো, বিছানায় একটু বসবে চলো। আজ খুব আশ্চর্য একটা কথা বলবো, শুনলে তুমি অবাক হ'য়ে যাবে।" ধরে নিয়ে গিয়ে ও ধীরাকে খাটের ওপর বসিয়ে দিলে।

"আশ্চর্য কথা তোমার পরে শুনবো। আগে আমার কথার জবাব দাও। এতদিন তুমি কোথায় ছিলে সেইটেই আমি জানতে চাই। আমাকে এমন ক'রে ফেলে রেখে দুদিনের মধ্যে আসছি ব'লে সেই যে তুমি চলে গেলে—"

"বলছি বলছি, সবই আমি বলছি। তোমার ওসব কথার জবাব পরে দিচ্ছি। আগে তুমি আমার আসল কথাটার জবাব দাও দেখি। মনে করো, আমি যদি হিন্দু না হ'য়ে মুসলমান হই, তাতে তোমার খুব বেশি আপত্তি হবে কি?"

"ও আবার কি ঠাট্টা? তুমি তো জানো, ওদের জাতের নাম পর্যন্ত শুনলে ভয়ে আজকাল আমার বুকের ভেতর গুর্‌গুর্‌ ক'রে ওঠে! মাগো, তুমি কেন মুসলমান হ'তে যাবে?"

"কিন্তু তাতেই বা তোমার ক্ষতি কি আছে? মনে করো আমি যদি সত্যিই মুসলমান হ'য়ে গিয়ে থাকি! তাহ'লে তুমি কি করবে? অবশ্য তবুও আমি সেই মানুষটাই থাকবো। মুসলমানই হই আর যাই হই, আমিও তোমাকে ছাড়তে পারবো না, তুমিও আমাকে ছাড়তে পারবে না। কেমন, এই তো ঠিক ক[illegible]? এইটুকুই আমি তোমার মুখ থেকে একবার শুনতে চাই। আ[illegible] জানি যে তুমি এই উত্তরই দেবে, তবু তুমি একবার নিজের মুখে বলো। নইলে আমার যে দুর্ভাবনা হয়েছে সেটা কাটছে না।"

"কী সর্বনাশ! এ সব কি কথা বলছো তুমি? এতদিন পর্যন্ত তবে তুমি ঐ মুসলমানদের মধ্যেই ছিলে নাকি? তারা জোর ক'রে ধরে তোমায় মুসলমান ক'রে দিয়েছে?"

"না ধীরা, তা নয়। তুমি ভয় পাচ্ছো কেন? জোর ক'রে ধরে কি কারো জাত বদলানো যায়? সে কথা নয়। তবে তোমার কাছে আমারই একটা অন্যায় হ'য়ে গেছে। আমার জন্মের পরিচয়টা এত কাল পর্যন্ত আমি তোমাকেও বলতে পারিনি। কেন যে পারিনি সেটা বুঝিয়ে বললেই তুমি বুঝতে পারবে। আমি জানতুম যে আমাকেই যখন ভালোবেসেছো, আমাকেই যখন চেয়েছো, তখন আমি যে জাতই হই, সে নিয়ে কোনো কথাই নেই। সে বিষয়ে পরে বললেও চলবে। কিন্তু এখন সব কথা আমাকে খুলে বলতেই হবে। আমার মা তোমাকে দেখতে চাইছেন। তাঁর কাছেই এবার থেকে থাকতে হবে, তার জন্যে প্রস্তুত হ'তে

হবে। এর মধ্যে অনেক ব্যাপার আছে। ছেলেবেলায় আমি আসলে মুসলমানেরই ঘরে মানুষ হয়েছি। কিন্তু ওদের রীতিনীতি আমার পছন্দ হতো না, তাই আমি মনে প্রাণে হিন্দু হ'য়ে থাকতুম। তারও একটা কারণ আছে। আমার মা ছিলেন হিন্দুর মেয়ে, কিন্তু আমার বাবা ছিলেন মুসলমান।"

"অ্যাঁ, বলো কি! তুমি বলো কি!" ভয়ে ঘৃণাতে ধীরার মুখখানা বিকৃত হ'য়ে গেল, তার চোখ দুটো আতংকে বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো। রঞ্জন তাই দেখে একটু যেন থতমত খেয়ে গেল।

দারুণ ঘৃণার ভঙ্গিতে মুখটা বিকৃত ক'রে ধীরা খাট থেকে নেমে দাঁড়ালো। বললে—"ঠিক ক'রে বলো, তুমি আমাকে ঠাট্টা করছো, না সত্যি কথা বলছো? এ সব কথা নিয়ে চালাকি নয়।"

রঞ্জন বললে—"ঠাট্টা নয় ধীরা, সত্যি কথাই বলছি। নিজেকে মুসলমান বলাই আমার উচিত।"

ধীরা হঠাৎ অমানুষিক তীক্ষ্ণ কণ্ঠে কেমন একটা চীৎকার ক'রে উঠলো। ব্যাপার কি জানতে পরেশ পাশের ঘর থেকে ছুটে এলো।

পরেশকে দেখে ধীরা যেন একটু ভরসা পেলে, তার দিকে তাড়াতাড়ি সরে গেল। বললে—"শুনুন পরেশবাবু শুনুন, কি ভয়ানক কথা আমায় বলছে শুনুন।"

ততক্ষণে রঞ্জন নিজেকে সামলে নিয়েছে। সে বললে- "আমি মুসলমানই হই আর যাই হই, আমাকে তোমার অন্তত ভয়টা, কিসের. আর এমন ঘৃণাই বা কিসের ধীরা? আমাকে না তুমি ভালোবাসো?"

পরেশ পার্টিশনের আড়াল থেকে ওদের কথাবার্তা কিছু কিছু শুনেছিল। সে বললে—"তুমি কি ধীরা দেবীকে পরীক্ষা করবার জন্যে এই সব কথা বলছো?"

"তুমি চুপ করো পরেশ। ধীরাকে আমি আজ এমনি ক'রে মিছে পরীক্ষা করতে যাবো, তাই কখনো হ'তে পারে ?"

"কিন্তু তোমার মতো লোক যে সত্যিই মুসলমান, তাই বা কেমন ক'রে হ'তে পারে ?"

"কেন হ'তে পারে না ? মুসলমান কি মানুষ হয় না ? মানুষ কি মুসলমান হয় না ?"

"না না, ঝগড়ার কথা তো হচ্ছে না। আসলে উদ্দেশ্যটা তোমার কি, তাই বলো না !"

"উদ্দেশ্য আবার কি ? আমি একজন মুসলমান। ধীরা আমার স্ত্রী, তাই ওকেও হ'তে হবে মুসলমান। আজই আমার বাড়িতে গিয়ে ওকে উঠতে হবে। সেটা মুসলমানেরই বাড়ি।"

"শোনো ভাই রঞ্জন, তুমি উত্তেজিত হয়েছো। তোমার যুক্তিটা কিন্তু ঠিক হচ্ছে না। তুমি হিন্দু হ'য়ে হিন্দুর দেবতাকে সাক্ষী রেখে ওঁকে বিয়ে করেছিলে। এখন যদি বলো যে তুমি মুসলমান, তাহ'লে সেই চুক্তিটা আপনা থেকেই ভেঙে যায়। তুমি অবশ্য মুসলমান হ'তে পারো, কিন্তু তাহ'লে উনি তোমার স্ত্রী নাও হ'তে পারেন।"

"কেন, কেন, কেন ? চুক্তিটা হয়েছিল কি আমার জাতের সঙ্গে ? ধীরা এখন ভয় পেয়ে গেছে, কিন্তু একটু স্থির হ'য়ে পরে এই কথাই ও নিশ্চয় বলবে।"

"ধীরা দেবী হয়তো মুসলমানের স্ত্রী হ'তে অনিচ্ছুক।"

"মানুষকে তোমরা ভুল বুঝোনা পরেশ। মুসলমান হ'লেই কেউ মানুষ থেকে স্বতন্ত্র হ'য়ে যায় না। কে হিন্দু আর কে মুসলমান ? তুমিই কি বলতে পারো যে তোমার জাতের রক্তের মধ্যে মুসলমানের রক্ত কখনো একটুও মিশে যায়নি ?"

ধীরা এতক্ষণ পর্যন্ত চুপ ক'রে ছিল। এইবার সে মহা আতংকিত হ'য়ে ব'লে উঠলো—"বোলো না বোলো না, তাই ব'লে অমন সব ভয়ংকর কথা তুমি তর্ক করবার জন্যেও বোলো না। শুনেই তোমাকে আমার ভীষণ ভয় করছে।"

"কি করবো বলো ধীরা, ভয় করলেও এইটেই হলো সত্যি কথা। আমি হচ্ছি মুসলমান।"

"কী সর্বনাশ! তবে তুমি সত্যিই একথা এতদিন চেপে রেখেছিলে? আমাকে তাহ'লে তুমি মিথ্যে কথা ব'লে বরাবর ফাঁকি দিয়েছো? ছি ছি ছি, তুমি বলতে চাও যে একজন মুসলমানের সঙ্গে এক ঘরে এক বিছানায় এতদিন পর্যন্ত আমি অম্লান বদনে কাটিয়েছি?"

"তাতে এত ছি ছি কিসের ধীরা? যার সঙ্গে কাটিয়েছো সে তো সেই আমি! যাকে তুমি ভালোবেসেছো, সে তো সেই আমিই! চেয়ে দেখো, মানুষটা একটুও বদলে যাইনি।"

"তুমি কি আমাকে এমনি ক'রে ঠকিয়েছো?"

"তোমাকে আমি ঠকাইনি ধীরা। এমন কথা স্বপ্নেও আমি ভাবিনি যে আমি হিন্দু হ'লেই তুমি আমাকে ভালোবাসবে, কিন্তু মুসলমান হ'লে আর বাসবে না। তোমার বাবার কাছে কোনো পরিচয় আমি দিইনি, তবুও তুমি আমার সঙ্গে চলে এলে। আমি তোমাকে ঠকাইনি ধীরা। চলো তুমি আজ আমার আপন বাড়িতে। সেখানে আমার মা তোমার প্রতীক্ষায় বসে রয়েছেন, তোমার কথা শুনে তিনি তোমাকে দেখবার জন্যে ব্যস্ত হয়েছেন।"

"কী সর্বনাশ! আমায় কিনা শেষ পর্যন্ত যেতে হবে মুসলমানের ঘরে! পরেশ বাবু, শুনছেন এ সব কি ভয়ানক কথা? আগেই আপনাকে বলিনি, যে ইনি যখন আসতেই এত দেরী করছেন, তখন

নিশ্চয় কিছু একটা কাণ্ড বাধিয়েছেন, নিশ্চয় আমি এবার বিপদে পড়বো? এই তো এবার সবই শুনলেন, আমি এখন কি করি বলুন তো? কি বিপদ আমার হলো বলুন তো?"

"পরেশ বাবু কি বলবেন? পরেশ বাবু তোমার সুখ দুঃখের ভাগী নন। আমি যাই হই, আমিই তোমার অতি আপন। আমাকে যদি চাও তাহ'লে আমার বাড়িতেই তুমি যাবে। মনে নেই সে কথা, একদিন তুমি কত আগ্রহ ক'রে বলেছিলে যে যেখানেই তোমাকে নিয়ে গিয়ে রাখি, সেখানেই তুমি থাকবে? মনে নেই, সেই হর্টিকালচার্যাল গার্ডেন্স্-এ বসে বসে আমাকে কোন প্রতিজ্ঞা তুমি করিয়ে নিয়েছিলে?"

"ও সব কথা এখন বলে কোনো লাভ নেই। আমার যে ভয়ানক ভয় করছে! তোমার কথা শুনতেই ভীষণ ভয় করছে। ছি ছি, তুমি মুসলমান?"

"বুঝতে পেরেছি ধীরা। আগে যা ছিল তা এখন মরে গেছে। সে জিনিস মরে গেছে। তোমার কোনো দোষ দেবো না। তোমার সেই ভালোবাসা এখন ফুরিয়ে গেছে।"

"তুমি যাও যাও, নিজের লজ্জা ঢাকতে আমাকে আর অমন ক'রে বিদ্রূপ করো না। কি ভয়ংকর মানুষ তুমি!"

"তা বটে। ভয় তো এখন তোমার করবেই। প্রেম বেঁচে থাকলে যাকে একদিন ভালো লাগে, সেটা মরে গেলে তখন তাকে অমনি ভয়ই লাগে। তা হোক, পৃথিবীতে মরা মাত্রই তো স্বাভাবিক! সব জিনিসই মরে যায়। আর আমার কিছু বলবার নেই। আমি এখান থেকে চলেই যাচ্ছি।"

"তুমি কেন চলে যাবে? তোমার ঘর, তোমার জায়গা, তোমারই এখানে অধিকার। তুমি তোমার জায়গায় থাকো, আমিই চলে যাচ্ছি।"

"কোথায় কার সঙ্গে যাবে তুমি ধীরা? পরেশ বাবুই বুঝি এখন তোমার প্রধান সহায়?"

"বলো বলো, তোমার যা খুশি তাই বলো। একটুও আমার গায়ে লাগবে না। কিন্তু তুমি এমন হীন হ'লেই যে আমিও হীন হ'য়ে যাবো এ কথা ভেবো না।"

"আমি তো হীন বটেই। কিন্তু তোমার বাবার কাছেই তাহ'লে ফিরে যাচ্ছো তো? সেটা জানলেও আপাতত আমি নিশ্চিন্ত হ'তে পারি।"

"সে আমার যখন খুশি তখন যাবো। তোমায় সেজন্যে ভাবতে হবে না। এখন আমি যাচ্ছি যমুনা দিদির সঙ্গে পাশের পাঞ্জাবী বন্ধুদের বাড়ি। একটু সামলে নিয়ে তার পরে যাবোই তো বাবার কাছে।"

"তোমার জিনিসপত্র?"

"তোমার দেওয়া কিছুই আমি ছুঁবো না। ও সব তোমার জিনিস তোমারই থাক।"

"মানুষ মরে গেলে এত শিগ্‌গির কিন্তু ভোলা যায় না। ভালোবাসা মরে গেলে দেখছি তার চেয়েও অনেক তাড়াতাড়ি ভোলা যায়। নয় ধীরা?"

ধীরা এ কথার কোনো জবাব দিলে না।

সতেরো

ঝগড়া কিংবা তর্ক খানিকটা করলে বোধ হয় তখন মনের তেজ আরো কিছু বেড়েই যায়। রাস্তায় বেরিয়ে যেতে যেতে হঠাৎ রঞ্জনের খেয়াল হলো যে চ্যাটার্জি সাহেবের সঙ্গে একবার দেখা ক'রে গেলে বেশ হয়। তিনি যেদিন ওর পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন, সেদিন তাঁকে কিছুই ও বলেনি। এবার নিজের সমস্ত পরিচয় খোলাখুলি তাঁকে জানিয়ে দিয়ে তার পরে ও বাড়ি ফিরবে। কল্পনা করতে করতে চলল, ওর এই সব সত্যিকার পরিচয় শুনে তিনি কতই ঘৃণা বিদ্রূপ করবেন, কত রকমের চোখা চোখা কথা ব'লে ওকে মর্মান্তিক ভাবে টিটকিরি দেবেন। কিন্তু সেটা তো ওর ন্যায্য প্রাপ্য! সেই প্রাপ্যটুকু হাত পেতে নিয়ে নেবার জন্যই ও সাহস ক'রে চলেছে। সত্যকে অনায়াসে সহ্য করতে পারবে কিনা, এইগুলোই তো হলো তার পরীক্ষা! একটা মস্ত পরীক্ষা কেটে গেছে, আরো একটা রয়েছে ওর সামনে; দুটোতেই ওকে অক্ষতভাবে উত্তীর্ণ হ'তে হবে। পরীক্ষাই তো ওর কাম্য। সত্যের পরীক্ষায় মেকি জিনিসগুলো মিলিয়ে যায়, সভ্যতার শৌখিন ঢাকনিগুলো খুলে যায়,—অমন যে মনোবিলাসী ভালোবাসার ফাঁকি, তাও চূর্ণবিচূর্ণ হ'য়ে যায়। সত্য বড়ো মর্মান্তিক রকমের কঠোর। কিন্তু সেই তো ভালো! ওর পরম সৌভাগ্য যে ও এত বড়ো একটা কঠোর সত্যের সামনাসামনি দাঁড়িয়েছে। নির্লজ্জ নিরাবরণ সত্যকে ও সাহসের সঙ্গে আহ্বান করতে পারছে। বুক ফুলিয়ে এবার দেখে নেবে তার কতখানি নির্যাতন।

ভাবতে ভাবতে রঞ্জন আলিপুর পার্কে চ্যাটার্জি সাহেবের

বাড়িতে গিয়ে যখন হাজির হলো, তখন দেখলে যে তিনি বাড়ি নেই। খবর নিয়ে জানলে, রূপেন সাহেবও তখন বাড়িতে নেই। ড্রইং রুমে একবার ঢুকে দেখে, শুধু নীরাই সেখানে একা বসে আছে। আপন মনে সে কি একটা বই পড়ছে।

নীরাকে দেখে ও ফিরে চলে যেতে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়ালো। নীরসকণ্ঠে বললে—"চ্যাটার্জি সাহেবের আসতে অনেক দেরী হবে বুঝি? তাঁর সঙ্গেই একবার দেখা করতে এসেছিলুম। থাক, আজ তবে যাই, অন্য আর একদিন আসবো।"

নীরা বইখানা বন্ধ ক'রে রেখে শান্তভাবে বললে—"বাবা বাড়ি নেই বলে এতটা দূর এসেই আপনি আবার চলে যাবেন? কেন? আমার কাছেই একটু বসুন না!"

"না নীরা, এখানে বসা আমার উচিত নয়। আমি হয়তো তার উপযুক্ত নই। আমার আসল পরিচয়টা তুমি ঠিক জানোনা।"

"জানি। আপনি বসুন।"

"জানোনা জানোনা, কিচ্ছুই জানোনা। আমার সত্যিকার পরিচয় শুনলে এখনই হয়তো আঁৎকে উঠবে। তোমার দিদি অন্তত সেই রকমই আঁৎকে উঠেছিল।"

"আমি সবই জানি। আপনি মুসলমান। আর দিদি যে আপনাকে একদিন দুঃখ দেবে, সে তো আমি জানতুমই।"

নীরার কথা শুনে রঞ্জন অবাক হ'য়ে গেল। বললে- "এ খবর তুমি কার কাছ থেকে পেলে? আমি যে বরাবর সোজাই চলে আসছি।"

"কারো কাছে শুনে নয়, আমি নিজেই জানি। আর সেটা আজ নয়। অনেক দিন থেকেই।"

"আশ্চর্য কথা! তাই কখনো হয়?"

"কেন, মানুষকে চেনবার চেষ্টা করলে চিনতে কি খুব বেশী দেরী লাগে রঞ্জন বাবু? মনে পড়ে কি, আমি সেই প্রথম দিনেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে চৌধুরী হিন্দু না মুসলমান? তার কোনো জবাব আপনি তখন দেননি? তর্ক করতে গিয়ে আপনার মুখখানা লাল হ'য়ে উঠলো?"

"তাতেই ধরে নিলে যে আমি মুসলমান?"

"শুধু তাতেই কি আর জানা যায়? তার পরে আরো অনেক কিছু খোঁজ নিতে হয়েছে বৈকি। আমি আপনাদের বাগমারির বাড়িটা পর্যন্ত দেখে এসেছি, ফতিমা বিবির সঙ্গে একদিন সে বাড়িতে গিয়ে দেখাও করে এসেছি। তিনি বুঝি কোনো দিন বলেননি যে একজন হিন্দুর মেয়ে রমজান চৌধুরীর নাম নিয়ে খোঁজ-খবর করছিল?"

"কৈ, না তো!"

"সেটা তিনি ভালোই করেছেন, আমি তাঁকে বারণ ক'রে দিয়েছিলুম। তিনি ভারী দয়াবতী, একদিনেই আমি তা বুঝতে পেরেছি। তার পরে আরো কতদিন কত রকম উপায়ে আপনার খবর নেবার চেষ্টা করেছি। দিদির ওখান থেকে এই সেদিন যখন বাগমারি গিয়ে আর ফিরতে পারলেন না, তখন আমার মনেও ভাবনা হলো। রূপেন দা'কে নিয়ে মোটরে চড়ে আপনাদের সেই পাড়াতে একদিন ঘুরেও এলুম। দেখলুম যে সেখানে কোনো গণ্ডগোল নেই, কিন্তু আপনি আটকে পড়েছেন। তারপরে আবার একটু অ্যাডভেঞ্চার ক'রে আসবার ইচ্ছে হলো। নিজেই একদিন ওদিকে হেঁটে গেলুম। ইচ্ছে করেই আপনার বস্তির লোকদের হাতে ধরা পড়লুম। মনে করলুম যে তারা আপনার কাছে আমাকে টেনে নিয়ে যাবে। কিন্তু আপনারই ভয়ে তাড়াতাড়ি তারা আমাকে হিন্দু পাড়াতে আবার ফিরিয়ে রেখে গেল।"

"তাই নাকি ?" এত কাণ্ড ক'রে তুমি আমার এই সব সন্ধান নিয়ে বেড়িয়েছো ? অনেক কথাই তুমি জেনেছো দেখছি, কিন্তু তবু সবটা এখনও জানতে পারোনি। আরো কিছু জানতে বাকী আছে নীরা। আমার বাবা ছিলেন মুসলমান, কিন্তু মা ছিলেন হিন্দু। এটা তুমি জানো কি ?"

"হাঁ, তাও জানি। বুঁচোর বাড়ির পাশে যিনি থাকতেন, তিনিই আপনার মা। আমি অবশ্য নিজে জানতে পারিনি, তাঁর কাছে যে নার্স থাকতো তার মুখেই শুনেছি। বিকারের ঘোরে তিনি আপনার আঙুল কেটে নেবার কথা, আরো অনেক রকমের কথাই বলতেন। আমি ও পাড়ায় প্রায়ই যাতায়াত করতুম কিনা, নার্সটির সঙ্গে আমার খুব আলাপ হয়েছিল।"

"তবেই এখন দেখতে পাচ্ছো, আমি হিন্দুও নই, আর মুসলমানও নই। দুইএর বাইরে। তাহ'লে আমাকে তোমার ঘৃণা করাই তো উচিত। এখানে বসতে বলা আর মোটেই উচিত নয়। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আমার এই সব জাতটাতের পরিচয়গুলো জানতে তুমি এতখানি কষ্ট কেন করেছিলে ? তোমার বাবা বুঝি তোমাকে এই সব খোঁজ নিতে বলেছিলেন ?"

"আমি তো আপনার জাতের পরিচয়টুকুই নিতে চাইনি, আমি চেয়েছিলুম মানুষটার পরিচয় নিতে। আপনি নিজেই একদিন বলেছিলেন, আমি একটা জাত নই, আমি একটা মানুষ। তাই একবার খোঁজ নিয়ে দেখছিলুম যে কেমন ধরণের মানুষ।"

"তবে দেখলেই তো যে কত ভয়ানক ? সে কথা বলতে কোনো দ্বিধা করবার দরকার নেই। মানুষটাকে কেমন দেখলে, এবার সেটা স্পষ্ট ক'রেই শুনিয়ে দাও। আমি তাতে একটুও দুঃখিত হবো না।"

"শুনবেন তবে? প্রথমে ভেবেছিলুম যে আপনি বুঝি কোনো একটা মতলব নিয়ে জেনেশুনেই আমাদের ঠকাচ্ছেন। তার পরে দেখলুম যে আপনি নিজেই ভালো ক'রে বোঝেন না, আপনি কি জিনিস হ'তে চান। হিন্দু হ'লেও আপনি যে, হিন্দু না হ'লেও আপনি সেই। ঐ দুটো বাঁধাবাঁধি জাতের পরিচয়ের আপনি বাইরে। আপনি সত্যিই কেবল একজন মানুষ। আপনি হ'তে চান খাঁটি মানুষ। আর যাই হোন, অন্তত আপনি মিথ্যেবাদী নয়।"

"যাক, তবু তুমি আমাকে একটু মিষ্টি কথা বললে। ও কথা এখন যেতে দাও। কিন্তু এত গোয়েন্দাগিরি ক'রে আমার যে পরিচয়টা তুমি জানতে পারলে, সেটা তখনই তোমার দিদিকে জানিয়ে দিলে না কেন? তাহ'লে সে তো এর আগের থেকেই সাবধান হ'তে পারতো! নিজে জানলে, অথচ দিদিকে জানালে না?"

"দিদিকে জানাবার জন্যে আমি বুঝি দিনের পর দিন অমনি ক'রে সারাক্ষণ আপনার পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়িয়েছি? সে বুঝি দিদিকে জানাবার জন্যে? আপনি বুঝি কিছু বুঝতে পারেন না? এখনও আপনি বুঝতে পারলেন না?" নিদারুণ অভিমানে কাঁদো কাঁদো মুখে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে কাঁপতে নীরা রঞ্জনের খুবই কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। রঞ্জনের গায়ে তার গায়ের স্পর্শও একটু ভালো ক'রেই লেগে গেল।

সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ রঞ্জনের বার বার শিউরে উঠলো। নীরার হাত দুটো সে তখন সজোরে দুই হাত দিয়ে চেপে ধরলে। মুখ দিয়ে কোনো কথাই বেরোয় না। অনেক কষ্টে খুব অস্পষ্টভাবে ফিস্‌ফিস্ ক'রে শুধু বললে—"তুমি কি বলতে চাও নীরা? তুমি কি বলতে চাও?"

নীরা এর কোনো জবাবই দিলে না। পরম নিশ্চিন্তভাবে এবার আরো কাছে ঘেঁষে গিয়ে মাথাটি রাখলে ওর বুকের ওপর। সে একটু বেঁটে মানুষ, রঞ্জন তার চেয়ে অনেকখানি লম্বা। মাথাটা রঞ্জনের বুকের মধ্যে অনায়াসে আশ্রয় পেয়ে গেল।

তখন নীরার মুখখানা রঞ্জন জোর ক'রে তুলে ধরলে। চোখের দিকে চেয়ে দেখলে, চোখের পাতায় পাতায় বিন্দু বিন্দু অশ্রু দুলছে, বর্ষণান্তের বনপল্লবের মতো।

ওর মুখের দিকে সে চেয়ে দেখলে, সেখানে অশ্রুর ভেতর দিয়ে ফুটে বেরুচ্ছে এক অপরূপ স্মিত হাসি। সে হাসি যেন কোন সুদুর্লভ সাফল্যের। দীর্ঘকালের সংগ্রামের অবসানে বিজয়লাভের মহা উল্লাসে সেই হাসি যেন দীপান্বিতার মতো আলোয় আলোয় আলোকোজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে।

নীরা এবার নিজেই মাথা তুলে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো। রঞ্জনের হাতখানা ধরে বললে—"চলুন, এবার একটু বসবেন চলুন তো! এসে পর্যন্ত দাঁড়িয়েই আছেন, বসতে বললেও বসছেন না!"

ওরা দুজনে পাশাপাশি বসলো একটা সোফাতে, হাতের সঙ্গে হাত আর আঙুলের সঙ্গে আঙুলগুলো জড়িয়ে। তখন অনেক কথাই বললে নীরা। একবার হাসতে হাসতে সে বললে- "আমি কিন্তু দিদির মতো অতো রকমের কথা গুছিয়ে বলতে পারবো না। একেই তো আমি দিদির মতো সুন্দরী নই, তার চেয়ে অনেক কালো কদাকার বিশ্রী। তার ওপর ভালো কথা বলতেও জানি না। কিন্তু এটুকু আমি ঠিক জানতুম যে আপনাকে একদিন আমি পাবোই।"

"আমি এখনো ঠিক বুঝতে পাচ্ছি না নীরা। তোমার সম্বন্ধে এমন কথা আমি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবিনি।"

"ভেবেছিলেন বৈকি। আমি জানি। নিজের মনের কাছে সেটা তখন কিছুতে স্বীকার করতে চাননি। আপনি নিজে না জানলেও আপনার চোখে তেমন ধরণের জিনিস আমি অনেকবার দেখেছি। আমার চাঁদের আলো ঠিকই উঠেছিল, কেবল দিদির রূপের জৌলুষটা মেঘের মতো তাকে আড়াল ক'রে রেখেছিল। এই সবে দিদির কাছ থেকে আসছেন, তাই এখনও সেটা বুঝতে পারছেন না। দু'দিন পরে নিশ্চয় বুঝবেন। সুন্দরী না হ'লেও আমিই কেবল আপনাকে সেই জিনিস দিতে পারি, যা আপনি পেতে চান। এখান থেকে আমায় আজই আপনার সঙ্গে নিয়ে চলুন।"

"তোমার দিদি কিন্তু মনে মনে তাহ'লে খুবই কষ্ট পাবে।"

"আপনিই শুধু তাই ভাবছেন। কিন্তু সে আগে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, তবেই আমি কুড়িয়ে নিয়েছি। দেখুন, যে যখন যা কথা বলে সবই আমার মনে থাকে। সেই বাগানে বসে দিদি যেদিন আপনাকে বললে যে ভালোবেসে তার পরে তাচ্ছিল্য করলে তার সহ্য হবে না, সেই দিনেই আড়াল থেকে সে কথা শুনে আমি হাসলুম। ভালোবাসতে গিয়ে যে আগের থেকে তাচ্ছিল্যের ভয় করে, তার ভালোবাসা বেশি দিন টেঁকে না।"

"তুমি বুঝি তাচ্ছিল্যকে একটুও ভয় করো না?"

"একটুও না। করুন না আপনার যত খুশি তাচ্ছিল্য! আমি জানবো যে সেই আঘাতও আপনি আমাকেই দিচ্ছেন। আর কাউকে না। তাচ্ছিল্যকেও কিন্তু ঘুরিয়ে আগ্রহ ক'রে নেওয়া যায়। ভালোবাসাও একটা আর্ট, আর সেটা আমাদেরই জাতের শেখবার জিনিস।"

"কিন্তু আমার সব পরিচয় জেনেও নিজেকে আমার হাতে ছেড়ে দিতে তোমার ভয় হচ্ছে না? আমি তো নেহাৎ সাদাসিধে ভালো মানুষটি নই।"

"শুধু আমার কেন, দিদিরও হয়তো তখন ভয় হতো না, যদি বিয়ে করবার মতলবটার আগেই তাকে পরিচয় জানিয়ে দিতেন। তখন কি সে ভয় পেয়ে পিছিয়ে যেতো? ও একটা কোনো কথাই নয়। আর পুরুষ মানুষ একটু এমনি কড়া ধরণের হওয়াই তো দরকার। আমাদের কাছেও যদি তারা কেবল দেঙ্গে দেঙ্গেই বলতে থাকে, সেটা আমরা খুব পছন্দ করি না। একটু লেঙ্গে লেঙ্গে বলাই আমরা চাই। জোর ক'রে কেড়ে নেবে, আবার হয়তো তাচ্ছিল্য ক'রে ফেলে দেবে। আমার কিছু ক্ষমতা থাকে তো সেটাও মানিয়ে নেবো। তবেই না?"

"কিন্তু তবুও কথাটা তুমি ভালো ক'রে বুঝে দেখো নীরা। তুমি হ'লে হিন্দুর মেয়ে, আর আমি হলুম মুসলমান।"

"আবার সেই কথা? জাতে আপনি হিন্দু না মুসলমান, এইটেই কি হলো শেষ কথা?"

"শেষ কথা? কী তবে তোমার শেষ কথা?"

"তাই বলবো বলেই তো তোমার সঙ্গে আমি যেতে চাইছি। নিয়ে চলো আমাকে তোমার বাড়িতে। আমি যে চাই তোমাকে, তোমাকে, শুধু তোমাকে। হিন্দুও নয়, মুসলমানও নয়, রঞ্জন বাবুও নয়, রমজান চৌধুরীও নয়, শুধু তোমাকেই আমি চাই। তোমার কাছেই আমি থাকতে চাই। এই দেখ, বলতে বলতে আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠছে।"

ওদের যখন পাশাপাশি বসে এই সব কথাবার্তা চলেছে, তখন হঠাৎ সেই ঘরের মধ্যে এসে ঢুকে পড়লেন স্বয়ং চ্যাটার্জি সাহেব হাতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ওদের বসে থাকতে দেখেই তিনি অবা হ'য়ে গেলেন। কি যে করবেন কিছু স্থির করতে পারলেন না। থেকে মাথা পর্যন্ত তাঁর থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো। মুখ দিে বোমা ফাটার মতো শুধু একটা প্রচণ্ড আওয়াজ বেরিয়ে এ—

—"নীরা !!"

রঞ্জন তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ালো। নীরার হাতখানা সে ধরে থেকে বললে—"ভেরি সরি। কিন্তু নীরাও যে আমার সঙ্গে আজ এখ থেকে চলে যেতে চাইছে !"

চ্যাটার্জি সাহেব প্রচণ্ডস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—"বেরিয়ে যা বেরিয়ে যাও, পাজি জোচ্চোর—"

"খবরদার ! গালাগালি দেবেন না বলছি। জেনে রাখুন আ আর হিন্দু নই, আমি মুসলমান। আমি রঞ্জন নয়, আমি রমজা গালাগালি দিলে আমি তার শোধ নিতে জানি।"

"ও। তাই বুঝি এখন হিন্দু থেকে মুসলমান হবার দরকার হলো

"হাঁ, তাই। এতদিন পর্যন্ত আমি হিন্দুই তো ছিলাম, f আপনারাই পাঁচজনে তা আমাকে কিছুতে থাকতে দিলেন না। হি সঙ্গে মিশে যাবার জন্যে যে আমার কতখানি আগ্রহ ছিল তা দেখে পেলেন না। এবার তাই মুসলমান হয়েই নীরাকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি

"দরোয়ান ! দরোয়ান !"

"চলে এসো নীরা। নইলে এখনই একটা বিশ্রী কাণ্ড হ'য়ে যাবে এখানে থেকে আপাতত আর কোনো লাভ নেই। হিন্দু মুসল যখন এক হ'য়ে মিলে যাবে, আলাদা আলাদা বলে কিছুই

াকবেনা, তখন আমরা আর এখানে ফিরে আসবো। আসবোই

নিশ্চয় একদিন, কিন্তু সে আজ নয়।”

নীরার হাত ধরে রঞ্জন বেরিয়ে চলে গেল।

চ্যাটার্জি সাহেব হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

এক

রাত তখন আন্দাজ বারোটা।

এখন থেকে প্রায় পঁচিশ বছর আগে সেই গভীর রাত্রে মুস্তা
চৌধুরী সাহেব একা একা বাড়ি ফিরছিলেন তাঁর সিনেমা হাউস থেকে
শহরতলীর বাগমারি অঞ্চলে একটা নতুন সিনেমা গৃহের তিনি মালি
রোজই রাত্রে সিনেমা শেষ হবার পরে বিক্রির টাকাকড়ি বুঝে
দরজায় তালা দিয়ে টাকার থলি আর চাবির গোছা সঙ্গে নিয়ে
বাড়ি ফেরেন, এই বস্তি অঞ্চলের আঁকাবাঁকা সরু গলিগুলোর ভিতর দি
বেশ খানিকটা শর্টকাট ক'রে। এই পথটি তাঁর খুবই পরি
বস্তিটাও তাঁর নিজেরই জমিদারীর মধ্যে, সুতরাং এখানে
কোনো ভয়ডর নেই। কিন্তু তবু সেদিন তিনি অতি সন্ত
ফিরছিলেন, এক অভাবনীয় সামগ্রী দুই হাত দিয়ে জ
তাঁর কোলে কাপড়চোপড় দিয়ে জড়ানো এক সদ্যোজাত
চারিদিকে এমন সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলেছেন, কেউ যেন না
এই অবস্থায় দেখতে পায়।

মুস্তাফা সাহেবের তখন পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়স হ
তবু কিন্তু মানুষটি খুব শৌখিন। অবশ্য বাবুগিরি করবার মতো
সম্পদও তাঁর আছে। ঐ অঞ্চলে তিনি অনেকখানি জমির ম
ঐ বস্তির জমিটা ইজারা নিয়ে মুসলমান প্রজারা বাস করে
পূর্বপুরুষদের আমল থেকে। বস্তির মধ্যে বিস্তর খোলা

আর টিনের চালের ঘর। সকলের কাছ থেকেই তিনি খাজনা পান। তারা আবার পাঁচ জনকে তাদের ঘর ভাড়া দেয়।

বস্তি পার হয়ে মুস্তাফা সাহেবের ফটকওয়ালা মস্ত দালান-বাড়ি। বাড়িখানি একতলা, দোতলা তিনতলা তিনি পছন্দ করতেন না। কংক্রিট দিয়ে গেঁথে বাড়িখানি আগেকার ফ্যাশানে তিনি চকমিলান ক'রে গড়েছিলেন। সামনের দিকে বাইরের মহল, ভেতরের দিকে অন্দরমহল। ভেতরে বাইরে মস্ত মস্ত বারান্দা। মাঝখানে প্রকাণ্ড উঠোন, সেখানে সুন্দর একটি ফুলের বাগান।

মুস্তাফা সাহেবের দুই স্ত্রী, রাবিয়া বিবি আর ফতিমা বিবি। অন্দরের দুই মহলে তাঁরা একটু আলাদা আলাদা থাকেন। যদিও তিনি ছেলে হবার কামনাতেই দুটি বিবাহ করেছিলেন, কিন্তু তবু তাঁর সন্তানাদি কিছুই হয়নি। তাতে যে তিনি খুব দুঃখিত, এমন ব'লে মনে হয়না। নানারকমের বই পড়া, বাগানের চর্চা করা, কুকুর পোষা, পাখি পোষা, এই সব নিয়ে আনন্দেই কাটিয়ে দেন। আচার ব্যবহারেও বেশ সরল। শিক্ষিত বাঙালী ভদ্রলোকের মতোই বেশভূষা করেন, দেখলে বোঝা যায়না হিন্দু না মুসলমান। সকল জাতের সঙ্গেই মেশেন, নানারকমের বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে নিমন্ত্রণ ক'রে এনে প্রায়ই তিনি খাওয়ান। নিজের ধর্মকে অবশ্য যথেষ্টই শ্রদ্ধা করেন, কিন্তু অতিরিক্ত গোঁড়ামি কিছু নেই। মেয়েদের পর্দা সম্বন্ধেও তাঁর খুব কড়াকড়ি নেই। দুই স্ত্রীকে তিনি একেবারে অশিক্ষিতা ক'রে রাখেননি। তাঁরা বইটইও পড়েন, আর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা বাড়িতে এলে তাদের সামনেও বেরোন। তবে রাবিয়া বিবি হলেন একটু সেকেলে ধরণের। আর ফতিমা বিবি অনেকটা আপ-টু-ডেট। দেখতেও তিনি সুন্দরী, আর বেশ বুদ্ধিমতী।

নিজেই বাড়ির কর্তা, নিজের বাড়িতেই ফিরে চলেছেন। কিন্তু সেদিন রাত্রে বাড়ি ফেরার মুখে মুস্তাফা সাহেব ভারী বিব্রত হ'য়ে পড়েছিলেন। শিশুটিকে নিয়ে যাচ্ছেন যেন কতই সংকোচের সঙ্গে। মাঝে মাঝে তাড়াতাড়ি চলেন, আবার মাঝে মাঝে থেমে দাঁড়ান। শিশু যেমনি এক একবার কেঁদে উঠছে অমনি ব্যস্তবাস্ত হয়ে চারিদিকে চাইছেন।

অনেকক্ষণ কেঁদেও কিছুতেই শিশুর কান্না থামলো না। মুস্তাফা সাহেব চারিদিকে একবার চেয়ে দেখলেন। কেউ কোথাও নেই। তখন তিনি গ্যাস পোষ্টের কাছে গিয়ে আলোর দিকে তুলে ধরে শিশুর কান্নার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তার ক্রন্দনরত মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখলেন। মুখখানা ধব্‌ধবে ফর্সা, এমন কি তাঁর নিজের গায়ের রঙের চেয়েও অনেক বেশি ফর্সা। মাথায় এর মধ্যেই কোঁকড়ানো ধরণের পাতলা পাতলা কিছু চুল গজিয়েছে। নাকটি সুন্দর টিকোলো, মনে হলো ঠিক যেন ওঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী ফতিমা বিবির নাকের মতো। আর ঠোঁট দুটি বসরাই গোলাপের পাপড়ির চেয়েও টুক্‌টুক্ করছে লাল।

সেই গোলগাল কচি মুখখানি দেখে মুস্তাফা সাহেবের বুকের মধ্যে অপ্রত্যাশিত এক ঝলক স্নেহের ঢেউ অকস্মাৎ উদ্বেল হয়ে উঠলো। যত কিছু তাঁর দ্বিধা সঙ্কোচ নিমেষের মধ্যে ঘুচে গেল। এ যে জীবন্ত একটি ফুল! বেহেস্তের কোন গোলাপ গাছ থেকে ঝরা, এসরাজের সুরে ভরা, সদ্যফোটা শিশিরে ভেজা এ যে অপূর্ব একটি গোলাপ! এমন আশ্চর্য প্রাণবন্ত ফুল কি কোনো দুনিয়ার বাগানে ফোটে!

শিশুটিকে তিনি কোলের মধ্যে আবার দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে

নিলেন। এবার তার কান্না থামলো। আর কোনোরকম নাড়াচাড়া না ক'রে ঠিক তেমনিভাবে অতি সন্তর্পণে তাকে বুকে নিয়ে তিনি বাড়ির মধ্যে ঢুকলেন। ওভারকোটে যে কেমন ক'রে অনেক রক্তের দাগ লেগে যাচ্ছে সেদিকে তখন ভ্রূক্ষেপ নেই।

বাড়ি ঢুকেই তিনি ফতিমা বিবিকে ডাকতে লাগলেন। রাবিয়া বিবির কিছু বয়সও হয়েছে, আর শরীরও ভালো নয়। রাত ঠিক সাড়ে ন'টার মধ্যেই তিন শুয়ে পড়েন। কিন্তু ফতিমা বিবির বয়সটা তখন সবেমাত্র ত্রিশের কোঠায় পড়েছে। তিনি খাস কলকাতা শহরের মেয়ে, আর তাঁর প্রাণে শখও আছে প্রচুর। তিনি শখ ক'রে এই বয়সে সেতার বাজানো শিখছেন, অনেক রাত পর্যন্ত জেগে বসে আপন মনে সেতারের গৎ বাজান। মুস্তাফা সাহেব প্রত্যহ ফিরে এসে তাই শুনতে শুনতে নিজের খাওয়াদাওয়া সারেন।

ডাক শুনে ফতিমা বিবি সেতার ফেলে উঠে দাঁড়ালেন। ততক্ষণে মুস্তাফা সাহেব ঘরের মধ্যে ঢুকেছেন। ফতিমা বিবি চেয়ে দেখেন তাঁর হাতে রক্তমাখা কাপড় জড়ানো একটা শিশু।

"একি! একি কাণ্ড! তোমার জামাটা যে রক্তে মাখামাখি হ'য়ে গেল! কোথায় পেলে একে?"

"বলছি, আগে একে তুমি ধরো। সাবান দিয়ে এখনই ভালো ক'রে গোসল করাতে হবে।"

"তা না হয় ধরছি, কিন্তু কোথায় একে পেলে আগে বলো।"

"কোথায় আর পাবো, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছি।"

"ছি ছি,—কোন ছোটলোকেদের ছেলে, খেতে দিতে পারবে না তাই হয়তো রাস্তায় কেউ ফেলে দিয়েছে! আর তুমি অমনি তাকে কুড়িয়ে নিজের ঘরে আনলে। তোমার যেমন আক্কেল!"

"যাদেরই ছেলে হোক, সে কথা পরে ভাবা যাবে। আজকের রাতটা তো বাঁচুক। তুমি একবার এর দিকে চেয়ে বলো দেখি, ছোটো-লোকদের ছেলের কি এমন সুন্দর রং হয়? দেখো দেখি ওর নাকের দিকে চেয়ে। বিলকুল যেন ঠিক তোমারই নাকের মতো। এমন ছেলে যদি রাস্তার পড়ে থাকে, তাহ'লে কি সেখানেই ফেলে রেখে চলে আসা যায়!"

ফতিমা বিবি ঘাড় বেঁকিয়ে শিশুর মুখের দিকে একবার চাইলেন। সত্যিই ফুটফুট করছে ওর রং। দুধের মতো সাদা মোমের একটা পুতুলের গায়ে কে যেন জায়গায় জায়গায় গোলাপী গুলাল ছড়িয়ে দিয়েছে।

তাড়াতাড়ি একটা গরম চাদর খুঁজে এনে শিশুকে তিনি তার মধ্যে জড়িয়ে নিলেন।

গরম জলের বালতি এসে পড়লো। জলে সাবান গুলে শিশুকে স্নান করাবার জন্যে যেমনি তার কাপড়ের আবরণগুলো উন্মোচন করা হলো অমনি সে হাত দুটোকে মুঠো ক'রে তারস্বরে ককিয়ে উঠলো।

মুস্তাফা সাহেব বললেন—"আরে রও রও, ওর কোথায় বুঝি চোট লাগলো।"

"কোথায় আবার চোট লাগবে? ছেলেপুলে একটু কাঁদবে না?" —এই ব'লে ফতিমা বিবি মস্ত এক হীরের নাকছাবির ঝলক দিয়ে টিকোলো নাকটি ঘুরিয়ে এনে ভৎর্সনাপূর্ণ হাসির ঝংকারে ওঁকে খুবই অপ্রস্তুত ক'রে দিলেন।

কিন্তু ভালো ক'রে আবরণমুক্ত করবার পরে দেখা গেল যে শিশুর কেঁদে ওঠবার কারণ আছে। তার বাঁ হাতের একস্থান দিয়ে রক্ত ঝরছে। অনুসন্ধান করতে গিয়ে বেরিয়ে পড়লো যে তার ঐ হাতের

কড়ে আঙুলের আধখানা কে যেন কেটে নিয়েছে। সেইখান থেকেই রক্ত ঝরছে, আর সেইজন্তেই ছেলে অতো কাঁদছে।

"সত্যি বলো তো একে তুমি কোথায় পেলে? আহা, আঙুলটা কে ওর এমন ক'রে কাটলে?"

মুস্তাফা সাহেব হঠাৎ একটু চমকে উঠে তখনই সামলে নিলেন। থতমত খেয়ে বললেন—"রাস্তায় হয়তো ইঁদুরে টুঁছুয়ে আঙুলটা কেটে নিয়েছে। সেইজন্তেই অমন ক'রে কাঁদছিল। আমি কি আর তাই দেখতে গেছি?"

মুস্তাফা সাহেবের তখনই যেন মহা দুর্ভাবনা এসে পড়লো। তাড়াতাড়ি কয়েক পোঁচ টিংচার আইডিন লাগিয়ে তিনি আঙুলের মাথায় ছোট ক'রে একটি ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিলেন। গরম জলের মধ্যে ডুবিয়ে ধরতেই শিশুর ভারী আরাম হলো, কান্না থামিয়ে তখনই সে ঘুমিয়ে পড়লো।

পরের দিন সকালে ফতিমা বিবি আবার জিজ্ঞাসা করলেন—"ছেলেটিকে কোথায় পেয়েছো, সত্যি ক'রে বলোনা!" মুস্তাফা সাহেব বললেন—"যেখানেই পাই, সে কথা এখন নাই শুনলে! মনে করো কুড়িয়েই পেয়েছি।"

ফতিমা বিবি বললেন—"সেজন্তে নয়। কেউ আর কেড়ে নেবেনা তো? তাহ'লে আমাকে ছেলেটি একেবারেই তুমি দিয়ে দাও, আমি নিজের মতো ভেবেই একে মানুষ করি।"

"এই দেখ তোমার বোকামি! তোমায় ছাড়া আর কাকে আমি সেধে সেধে দিয়ে দিতে যাচ্ছি?"

"বেশ, আমারই যদি ছেলে হলো, তাহ'লে আরো এক কাজ করো। আমাকে তুমি মাস দুয়েকের জন্তে রাঁচিতে আমার বোনের

কাছে ফিরে চলো। তুমি সেখানে থাকতে না পারো, আমাকে পৌঁছে দিয়েই চলে এসো। সেখানেই আমার এই ছেলে পয়দা হোক, তার পর আমি ফিরবো। বুঝলে? নইলে একটা বড়ো গোল বাধবে, লোকে মুখ বেঁকিয়ে বলবে আমার নিজের পেটের ছেলে নয়। সে আমি সহ্য করতে পারবোনা। আজই টিকিট কাটিয়ে আনো, রাতা-রাতি একে নিয়ে সেখানে চলে যাই।"

সেই ব্যবস্থাই করা হলো। রাবিয়া বিবি অবশ্য ফতিমার এই উদ্ভট রকমের খামখেয়ালিতে যথেষ্ট আপত্তি করেছিলেন। কোথাকার কোন জাতের ছেলে তার ঠিক নেই, নিশ্চয়ই কোনো মন্দ লোকের পাপ কাজের ফলে হয়েছিল, লুকিয়ে তাই রাস্তায় ফেলে দিয়ে গেছে। সেই ছেলেকে কখনো কি ভদ্রলোকের ঘরে রাখতে আছে, না নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিতে আছে? ভদ্র সমাজে যথেষ্টই ওঁদের মানসম্ভ্রম, কেউ যদি এ কথা জানতে পারে তাহ'লে এর পরে মুখ দেখাবার কোনো উপায় থাকবেনা। আর রাবিয়া বিবির বাপেরা হলো বসিরহাট অঞ্চলের বহুকালের বনেদি জমিদার, তারা শুনলে ছি ছি করবে। ফতিমা বিবির বাপেরা না হয় আজকালকার সাহেবিয়ানা শিখে মানসম্ভ্রমের কোনো পরোয়া রাখেনা, কিন্তু সমাজের মধ্যে থাকতে হ'লে খানিকটা রেখে ঢেকেও তো চলতে হবে।

মুস্তাফা সাহেব রাবিয়া বিবিকে একটা দার্শনিক যুক্তির দ্বারা নরম করবার চেষ্টা করলেন। আমরা যাকে পাপ কাজ বলি, জগতের শিশুরা তার থেকেই জন্মায়। এমন কি বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর মনের মধ্যেও অনেক পাপ লুকিয়ে থাকে। অথচ তাদের থেকেই কত নিষ্পাপ শিশুর জন্ম হয়। যারা পাপ কাজ করে সেটা তাদেরই নিজস্ব কলঙ্ক, কিন্তু শিশু জন্মায় খোদ খোদাতালার মেহেরবানিতে। যেখানে যেমন

ভাবেই জন্মাক, শিশু মাত্রেই নিষ্পাপ। সৃষ্টিকর্তার কাছে তার কোনো জাতও নেই, আর তার কোনো ধর্মও নেই। যাদের ঘরে সে আসে তারাই তার একটা নাম-ধাম-পরিচয় বানিয়ে দেয়। এটা একবার পরীক্ষা ক'রে দেখাই যাকনা, ওঁদের ঘরে থেকে পরিচয়বিহীন শিশুটি ঠিক ওঁদেরই মতো তৈরি হয় কিনা। অধর্মের সৃষ্টিকে ধর্মযুক্ত করা তো আরো গৌরবের কথা।

এই সব অকাট্য যুক্তি শুনিয়ে বিশেষ কিছুই ফল হচ্ছিলনা। কিন্তু ফতিমা বিবি তাঁর একমাত্র যুক্তির দ্বারা সব ঠাণ্ডা ক'রে দিলেন। তিনি বললেন, আল্লা যখন তাঁর ঘরেই পৌঁছে দিয়েছেন, তখন ও ছেলে তাঁরই। তাঁর ইচ্ছায় কেউ বাধা দিলে তিনি নাইবেনও না, খাবেনও না, ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে দেয়ালে মাথা ঠুকে খুনখারাবি করবেন। এই কথায় সবাই ভয় পেয়ে গেল। দেয়ালে মাথা ঠোকা তাঁর একটা মারাত্মক রোগ, সত্যিই তিনি রেগে উঠলে মাঝে মাঝে তুমুল কাণ্ড করতেন।

শিশুটিকে নিয়ে রাত্রের ট্রেনে ফতিমা বিবি রাঁচি গেলেন। সেখানে বোনের ঘরে থেকে মহা আনন্দে দু মাস কাটিয়ে এলেন। ইতিমধ্যে চারিদিকের আত্মীয়-মহলে সংবাদ রটে গেছে যে ফতিমা বিবির এতদিন পরে একটি ছেলে হয়েছে। রমজানের চাঁদের মতোই তার আবির্ভাব বলে নাম রাখা হলো রমজান। চাঁদের মতোই তার অপরূপ কান্তি। হবেই তো, ফতিমা বিবির মতো অমন সুন্দরীর গর্ভের সন্তান। একটি আঙুলে কেবল একটু খুঁত আছে, কিন্তু সে ধর্তব্যই নয়। মুস্তাফা সাহেব প্রতি সপ্তাহে একবার ক'রে গিয়ে দেখে আসতেন। রাঁচির হাওয়া খেয়ে ছেলে দুই মাসের মধ্যেই বেশ পুষ্ট হ'য়ে উঠলো। সেখানে ওর জন্যে স্বতন্ত্র শিক্ষিত আয়া নিযুক্ত রাখা হয়েছিল। ওকে রোজ

বিবেতের আমদানি টিনের দুধ খাওয়ানো হতো। গরুর দুধ নাকি ওর তেমন সহ্য হতোনা। মায়ের স্তনে দুধ ছিল না, তাই শিশুকে বাঁচাবার জন্যে আরো অনেক কৃত্রিম উপায় খুঁজে বের করতে হয়েছিল।

কলকাতায় ফিরে এসেই ছেলের হঠাৎ নিউমোনিয়া হলো। তাই নিয়ে আবার এক তুমুল কাণ্ড। বড়ো বড়ো ডাক্তারের ভিড় জমে গেল। শিক্ষিত নার্স এনে রাখবারও ব্যবস্থা হয়েছিল, কিন্তু রাবিয়া বিবি তা হ'তে দিলেন না। নিজেই তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ ক'রে এই ছেলের সেবাতে লেগে গেলেন। ঘরের লোক যেমন প্রাণ দিয়ে সেবা করবে, বাইরের নার্স হাজার শিক্ষিতা হ'লেও কি তাই কখনো পারে? তাঁর সেবাযত্নের গুণে ছেলে সত্যিই ধীরে ধীরে সুস্থ হ'য়ে উঠলো।

তার পর থেকে দেখা গেল যে ছেলেটি ফতিমা বিবির হ'লেও তাকে ভালো ভাবে মানুষ করতে পারেন কেবল রাবিয়া বিবি। সকল সময়েই তিনি উৎকর্ণ আর উৎকণ্ঠিত আছেন, পাছে ছেলের কিছু অযত্ন হয়। ছেলে একবার কাঁদলেই অমনি তিনি ফতিমার মহলে ছুটে যান। "অমন ক'রে ওকে কাঁদাচ্ছিস কেন? এই সেদিন তো অমন নিউমোনিয়া থেকে সেরে উঠলো, আবার কেঁদে কেঁদে একটা শক্ত ব্যারাম হোক। ছেলেকে যে মানুষ করতে জানেনা, তার আবার ছেলে হবার শখ কেন?"—এই ব'লে তিনি ফতিমার কোল থেকে রোরুদ্যমান ছেলেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যান। নিজেই তাকে খাওয়াবেন, নাওয়াবেন, ফাঁক ফাঁক চুলেই চিরুনি দিয়ে একটু টেরি কেটে দেবেন, তাকে বেজায় চটিয়ে দিয়ে জোর ক'রে কোনোগতিকে চোখে সুর্মা পরিয়ে দেবেন, তারপর কোলে শুইয়ে চাপড়ে চাপড়ে ঘুম পাড়াবেন। অসীম তাঁর ধৈর্য, অক্লান্ত তাঁর অধ্যবসায়। রাত্রে যদি

ছেলে না ঘুমোয়, তবে তিনিও মোটে ঘুমোবেন না, সারারাত বুকে নিয়ে পায়চারি ক'রে বেড়াবেন। তবু প্রাণান্তে কতিমার ঘরে নিয়ে যেতে দেবেন না। এখন আর সারা রাত জাগলেও তাঁর বাতের অসুখ বাড়ে না।

দুই মায়ের খবরদারির আতিশয্যে ছেলে ক্রমশ বড়ো হ'তে লাগলো। তার জন্যে এসে পড়লো কত রকমের সাজসজ্জা, কত বাহুল্যের আসবাবপত্র। দুই মায়ের মাথার মণি ঐ একটিমাত্র ছেলে। ওকেই একমাত্র কেন্দ্র ক'রে ওঁদের দিন আর রাত্রি কোনখান দিয়ে কেটে যায় তা কেউ জানতেই পারেন না। ওকে নিয়ে পরস্পরের মধ্যে নিত্য নিত্য কতই মনোমালিন্য, আবার কতই অকুণ্ঠ সহযোগিতা। ওকে নিয়েই দুই মায়ের কাজের যেন আর অন্ত নেই।

মুস্তাফা সাহেবেরও জীবনে একটা নতুন রকমের প্রেরণা এসে গেছে। তিনি আর এখন একটি পয়সাও বাজে খরচ করেন না। ছেলের জন্যে সঞ্চয়ের দিকেই এখন তাঁর মন। সেই কোন অজানিত মায়ের গর্ভের সন্তানটি এমনি ক'রে পরম সমাদরে থেকে তিন জনের মনে তিনটি স্নেহের শিকড় বসিয়ে দিয়ে দিনে দিনে বাড়তে লাগল।

দুই

লেখাপড়া শেখবার মতো বয়স হ'তে না হ'তেই রমজানের বাংলা ইংরেজি অক্ষর পরিচয় শুরু হ'য়ে গেল। প্রথম হাতেখড়িটা করালেন ফতিমা বিবি। তারপর ভালো ভালো মাষ্টার নিযুক্ত হলো, এবং একটু বড়ো হতেই কাছাকাছি একটা ভালো স্কুলে ভর্তিও ক'রে দেওয়া হলো।

রমজান প্রত্যহই স্কুলে পড়তে যায়। স্কুল পাঠশালার জীবনে সব চেয়ে উপভোগ্য বন্ধুসংশ্রব। রমজান ভারী মিশুক ছেলে, সব ছেলের সঙ্গেই তার গলায় গলায় ভাব। বন্ধুদের সঙ্গে মিশবার আনন্দেই সে ক্লাশ বসবার অনেক আগের থেকে স্কুলে গিয়ে উপস্থিত হয়, আর ছুটির ঘণ্টা পড়লেই চিলের মতো তীব্র চীৎকার ক'রে বইখাতা নিয়ে পড়ুয়াদের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে আসে। বাল্যকালে স্কুলে যাবার যে আনন্দ, তেমন আর জগতে কোথাও নেই।

কিন্তু ক্রমশ একটা জায়গাতে রমজান বারে বারে মানসিক কিছু আঘাত পেতে লাগলো। সে এখন খানিক বড়ো হয়েছে, বলতে গেলে কিছু সেয়ানাও হয়েছে। স্পষ্ট ক'রে কেউ কিছু না জানালেও সংসারের ভাবগতিক আপনা থেকেই খানিকটা বুঝে নিতে পারে। জলতেষ্টা পেলেই জলের ঘরে জল খেতে গিয়ে দেখে, ওর জন্যে আলাদা ব্যবস্থা, আর অন্য ছেলেদের জন্যে আলাদা ব্যবস্থা। ওর জন্যে একটা আলাদা গ্লাস রাখা থাকে, সে গ্লাসে অন্য কোনো জাতের ছেলে জল খায়না। ওর কেনা আইসক্রীম কিংবা আলুকাবলির ভাগ দিতে গেলে বন্ধুরা প্রায়ই তা হাত পেতে নিতে চায়না, সন্ত্রস্ত হ'য়ে

চারিদিকে তাকায়। বন্ধুত্বের ক্ষেত্রে যে সরল হৃদ্যতাটুকু গড়িয়ে ওঠে, তা এই সব নিয়ে বারে বারে যেন মুষড়ে যায়।

রমজান থেকে থেকে ভাবতে শুরু করে, কিসের কারণে এতটা স্বাতন্ত্র্য? ছোটো-বড়োর ইতরবিশেষ নিয়ে সংসারে যে একটা প্রভেদবোধের অস্তিত্ব রয়েছে, ছেলেদের স্বভাবত সেই দিকেই খুব নজর যায়। কে ছোটো আর কে বড়ো, এই নিয়ে তাদের মনে নিখুঁত বিচারের আর অন্ত থাকেনা। রমজান গভীরভাবে ভাবতে শুরু করে, ও বুঝি ক্লাসের অন্য সব ছেলেদের চেয়ে অনেক ছোটো দরের।

ছুটি হ'লে প্রায়ই ও বন্ধুদের সঙ্গে তাদের বাড়ি বেড়াতে যায়। ইচ্ছে ক'রেই তাদের বাড়িতে গিয়ে ওর জলতেষ্টা পেয়ে যায়, ও সেখানে গিয়েই জল খেতে চায়। ওকে জল এনে দেয় তারা স্বতন্ত্র একটা কাচের গ্লাসে। নিজেদের জল খাবার সাধারণ কাঁসার গ্লাসে ওকে কখনও কেউ জল খেতে দেয়না। এটা সে অনেকবার ইচ্ছে ক'রেই পরীক্ষা ক'রে দেখেছে।

ওর বাড়িতেও অনেক বন্ধু বেড়াতে আসে। একদিন ও তাদে বললে—"ভাই তোরা কাঁচা আমের সরবৎ খাবি? মা আজ খুব সুন্দর সরবৎ বানিয়েছে।" বন্ধুরা সবাই বললে খাবো। কিন্তু ও যখন গ্লাসে গ্লাসে সরবৎ ভরিয়ে ওদের চাকরের হাত দিয়ে তাদে কাছে আনালে, তখন বন্ধুরা সবাই মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। দু একজন তাড়াতাড়ি গ্লাস তুলে নিয়ে চোঁ চোঁ ক'রে খেয়ে ফেললে, কিন্তু দেখেই মনে হলো তারা যেন মরিয়া হ'য়ে সরবৎ খাচ্ছে তাদের দেখাদেখি আরো কয়েকজনে খেলে বটে। কিন্তু দেখেই বোঝা গেল, সবাই মনে করছে যেন একটা মহা অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছে।

রাজিয়া বিবি বাইরে এসে দাঁড়িয়ে সমস্তই দেখছিলেন। তিনি

এতে অসন্তুষ্ট হলেন। রমজানকে বলে দিলেন—"আর কখনো তোর বন্ধুদের এখানে সরবৎ খেতে বলবিনা।"

"কেন মা?"

"দেখছিস না, ওরা যে হিন্দু, আর আমরা যে মুসলমান।"

"তাতে সরবৎ খাওয়ানোতে কি দোষ হলো?"

"যা বলছি তাই শোন। ওরাও যেমনি তোর হাতের জল খাবে না, তুইও তেমনি ওদের হাতে জল খাবিনা।"

এ নিষ্পত্তি ওর মনঃপুত হলোনা। অন্ততপক্ষে ওর আসল প্রশ্নটার এতে কোনো মীমাংসা হলোনা।

একদিন রাত্রে ওদের বাড়িতে একটা ভোজ ছিল। তার পরের দিন সকালে যখন মাসোহারা করা মেথরানী বাইরের উঠোন ঝাঁট দিতে এলো, তখন ফতিমা বিবি তাকে ডেকে বললেন—"ওরে মেথর বৌ, আমাদের ঘরে অনেক খাবার তৈরি হয়েছিল, তুই যদি কিছু নিতে চাস তো নিয়ে যা।"

মেথরানী অমনি মুখ বেঁকিয়ে বললে—"তোমাদের ঘরের খাবার আমি লিবো নাই। আমি যে হিন্দু আছি।"

কথাটা রমজানের মনে প্রচণ্ড একটা আঘাত দিলে। হিন্দু হওয়ার মাহাত্ম্য কি এতই বেশি যে একজন মেথরানীও তাই নিয়ে ওর মায়ের মুখের সামনে আস্ফালন করতে কুণ্ঠা বোধ করে না?

একদিন রমজান দেখলে, পাড়ার হিন্দুস্থানী ছেলেরা একত্রে জড়ো হ'য়ে কি একটা নতুন ধরণের খেলা করছে। রমজান কৌতূহলী হ'য়ে তাদের কাছে দাঁড়িয়ে খেলা দেখতে লাগলো। মাঝখানে একটি ছেলে চৌকা পেতে জলসত্র সাজিয়ে বসে আছে, কাপড় দিয়ে তার চোখ বেঁধে দেওয়া হয়েছে। এক একটি ছেলে তার কাছে এগিয়ে

যাচ্ছে আর বলছে—"ভেইয়া ভেইয়া পানি পিলাও।" সে অমনি জিজ্ঞাসা করছে—"কৌন জাত?" কেউ তার জবাবে বলছে দুসাদ, কেউ বলছে চামার, কেউ বলছে মুসলমান। সবাইকে সে দূর দূর ক'রে তাড়িয়ে দিচ্ছে। সবাই হেসে তার মাথায় এক একটা চাঁটি মেরে পালিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যেমন একজন বললে 'ব্রাহ্মণ'—অমনি সে চোখ খুলে চৌকামৌকা ক'রে তাকে জল পান করানোর অভিনয় করতে লাগলো। তার খেলার পালা তখন শেষ হ'য়ে গেল। তখন আবার ঐ স্বীকৃত ব্রাহ্মণের জল পান করানোর পালা।

লোকে কাদের জাতকে মনে করে বড়ো, আর কাদের জাতকে মনে করে ছোটো, এটা জগতের ভাবগতিক থেকে সে অনুধাবন ক'রে নিলে। সে তখন ফোর্থ ক্লাশে উঠেছে, আর চার বছর বাদেই ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয়ার কথা। ছোটো বড়োর এ পার্থক্যটা তখন তার মনে অতিমাত্রায় প্রখর হ'য়ে উঠে কাঁটার মতো বিঁধছে। ও ভাবলে, বাবা কেন যে ওর নাম রেখেছিল রমজান, তাই এত রকমের মনোকষ্টে ওকে পড়তে হয়েছে। ঐ নামটার বদলে যদি ওর নাম রাখা হতো চন্দ্রকান্ত কিংবা কেবলরাম, তাহ'লেও দিব্যি চলে যেতো। খেলামেশা কিংবা জল খাওয়া প্রভৃতি নিয়ে কোনো রকমের দ্বিধাই আর উঠতো না। ও স্থির করলে কোনোগতিকে ওর নামটাকে এবার পালটে নিতে হবে। তাহলেই আর ঐ সব কোন্দো... ঝঞ্ঝাটের কারণ থাকবে না।

এই ঐকান্তিক কামনার কথাটা ও একদিন ফতিমা বিবির কাছে বলে ফেললে। তাঁর মনটি স্বভাবতই ছিল উদার, আমোদপ্রিয়, আর সব কিছুতেই একটা নতুনত্বের পক্ষপাতী। তাঁর কাছে রমজানের সব রকম মনের কথাই অনায়াসে বলা চলতো। কোনো বিষয়েই

তাঁর তরফ থেকে বাধানিষেধের কোনো বালাই ছিলনা। তিনিও এই অদ্ভুত খেয়ালের কথা শুনে কিছুমাত্র রাগ না ক'রে বরং আমোদ পেলেন। বললেন—"বেশ তো, কি নাম থাকলে তোর পছন্দ হয় তাই বল।"

ও বললে—"রমজান চৌধুরীর বদলে আমার নাম হোক রঞ্জন চৌধুরী। ইংরেজিতে লিখতে বেশ মজা, এম-এর বদলে, শুধু এ বসিয়ে দিলেই হলো।"

"রমজান থেকে তুই হ'য়ে যাবি রঞ্জন? তা বেশ বেশ, নামটি কি চমৎকার বেছে নিয়েছিস।"

"তবে আজ থেকে তুমি আমায় রঞ্জন বলেই ডাকবে, কেমন?"

"আচ্ছা বেশ, আমি না হয় তোকে তাই বলেই ডাকবো, কিন্তু যখন আর কেউ কাছাকাছি থাকবে না তখন। নইলে কেউ শুনতে পেলে তোকেও খুন করে ফেলবে, আর আমাকেও কবরে পুঁতে ফেলবে। ও নামটা কেবল আমাদের দুজনের মধ্যেই জানা রইল।"

"আচ্ছা ছোটো মা, বাবাকে ব'ল স্কুলে আমার আগেকার নামটা বদলে ঐ নামটা লিখিয়ে দিলে হয়না?"

"দূর বোকা ছেলে, তাই কখনো হয়। স্কুলের মাষ্টাররা সে কথা মানবে কেন?"

রমজানের মনটা খুব দমে গেল। সত্যিই তো, ওর বাবাই বা সে কথা বলবে কেন, আর মাষ্টাররাই বা তা শুনবে কেন? থাকে আর কেউ না মানুক, ক্লাসের বন্ধুরা তো মেনে নেবে। তাহ'লেই হলো।

পরের দিন ও ক্লাসের ছেলেদের বললে—"আজ থেকে তোরা আমাকে রঞ্জন চৌধুরী বলে ডাকবি। আমার ছোটো মা নতুন ক'রে আমার ঐ নামটা রেখেছে।"

"ধেৎ, তাই কখনো হয়? ও যে একটা হিন্দু গোছের নাম হ'য়ে গেল।"

"হলেই বা। মনে কর না, এবার আমি তোদের মতো হিন্দু হ'য়ে গেছি।"

"ধেৎ, হিন্দু অমনি হ'লেই নাকি হয়? হিন্দু কখনো হওয়া যায় না, হিন্দু যারা থাকে তারা গোড়া থেকেই থাকে।"

রমজানের মনটা আবার দমে গেল। এদের কাছেও নাম বদলানো তাহ'লে চলবে না। এরা সবাই আগেকার সেই পুরোনো নামটাই জেনে রেখেছে। ঐ নামটাকে ও নিজের জীবন থেকে একেবারে ছেঁটে ফেলতে চায়। কিন্তু তার কি কোনোই উপায় নেই?

রমজান পড়াশুনায় বেশ পটু। পরীক্ষায় সে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করতে লাগলো, ক্লাশের পর ক্লাশ প্রমোশন পেয়ে উঠতে লাগলো। কিন্তু যতই মেধাবী হোক, আর হিন্দু ছেলেদের মতো যতই চালচলন করুক, সে যে মুসলমানের ছেলে এ কথা কিছুতেই কেউ ভুলে গেল না। যে কেউ ওর সঙ্গে যতখানিই অন্তরঙ্গতা করুক, তবু ঐ মারাত্মক নামটি তাদের মনে মনে থেকে যেতো, তার জন্যে কেমন একটুখানি স্বাতন্ত্র্য তারা বরাবর বজায় রেখে চলতো। সেটা নিতাই ওর চোখে ধরা পড়ে যেতো। ব্যথায় বুকটা খুব টন্‌টন্ করে উঠতো ঠিক সেই মুহূর্তেই। দারুণ একটা অভিমানের বহ্নিশিখা দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠতো ওর মনে। অতি সূক্ষ্ম রকমের একটা লাঞ্ছনা, প্রচ্ছন্ন রকমের একটা অবমাননার ইঙ্গিত চারিদিক থেকে পেয়ে পেয়ে ও যেন পাগলের মতো হ'য়ে উঠতো। কোন বিধাতা ওর এই অন্তর্দাহের জন্যে দায়ী? নিজের প্রচেষ্টায় সেই নিষ্ঠুর বিধাতার ব্যবস্থাকে উল্টে দেবার কি ওর কোনো ক্ষমতাই নেই?

বিদ্রোহের মাত্রা হয়তো ওর মনে এতখানি প্রবল হ'য়ে উঠতো না, যদি ওদের আঁকের ক্লাসের মাষ্টার সেদিন ওকে অমন চরম অপমানটা না করতো। খুব কঠিন একটা অঙ্ক তিনি সবাইকে কষতে দিয়েছিলেন। ও আর হরেন দুজনেই সেদিন পাশাপাশি বসেছিল। অঙ্কে দুজনেই ছিল সমান দক্ষ। ক্লাসের অন্য কোনো ছেলে সে অঙ্ক কষে উঠতে পারলে না, কিন্তু ওরা দুজনেই সেটা স্বচ্ছন্দে করে ফেললে। দুজনেই মাষ্টার মশাইএর টেবিলে প্রায় একসঙ্গে খাতা দাখিল ক'রে এলো। তিনি পরীক্ষা ক'রে দেখলেন, দুজনেরই কষা রাইট হয়েছে। তখন হঠাৎ তিনি চোখ রাঙিয়ে ওকে বললেন—"আমার সঙ্গে চালাকি? নিশ্চয় তুই হরেনের দেখাদেখি টুক্‌লিফাই করেছিস।"

"না স্যার, আমি যে আগে খাতা দিয়েছি, হরেন তো আমার পরে দিয়েছে।"

"ওরে হারামজাদা, আমি এ সব বুঝি বুঝি। আগে ছুটে এসে খাতাটা দিয়ে গেলেই কি আমাকে ঠকানো যায়?"

"মিথ্যে কথা বলছিনা না স্যার। আমি আগে রাইট করেছি। হরেনকে আপনি বরং জিজ্ঞাসা করে দেখুন।"

"চোপরও,—র বাচ্চা, মুখের ওপর ফের কথা বলবি তো চাব্‌কে পিঠের ছাল ছাড়িয়ে দেবো।"

মুখ চোখ লাল ক'রে ও ক্লাশ থেকে তখনই বেরিয়ে চলে গেল। ওকে ক্লাসের সব ছেলেদের সুমুখে বললে কিনা—র বাচ্চা! আর সবাই তাই শুনে চুপ ক'রে রইল! তা থাকবে না কেন, সবাই হয়তো মনে মনে খুব আমোদই পেয়েছে। যেমন করেই হোক, ঐ নামটা বদলে ফেলার একটা কিছু উপায় ওকে করতেই হবে। ঐ নামটার জন্যেই ওর এত রকম লাঞ্ছনা।

কিন্তু কারও উপদেশ ও শুনলে না। ও বললে, বাপের কাজকর্ম তাঁর কর্মচারীরাই দেখবে। ও পড়াশোনা করাও ছাড়বেনা, আর বিয়েও এখন করবে না। পয়সাকড়িও হয়তো আছে, আর থাবার কোনো ভাবনা নেই, কিন্তু তাতেই কি সব হ'য়ে গেল? শুধু পয়সার জন্তেই কি লোকে লেখাপড়া করে? ওর এখন সব চেয়ে বেশি দরকার, উন্নতিশীল মানুষদের সঙ্গে ও মিশবে, তাদের মধ্যে নিজের একটা মর্যাদার জায়গা আবিষ্কার ক'রে নেবে, নিজের ব্যাকুল বহির্মুখী সত্তাকে বাধামুক্ত ক'রে সর্বতোভাবে তাকে পরিতৃপ্ত ক'রে নেবে। বিয়ে ক'রে কাজকর্মে ঢুকে ও একটা গতানুগতিক গণ্ডী মধ্যে থাকতে মোটেই চায়না। এবার ওর মনের একান্ত বাসনাকে সফল ক'রে নেবার অদ্ভুত সুযোগ মিলে গেছে। মাথার ওপর এখন আর মুস্তাফা সাহেব নেই, যে ওকে সেই সম্বন্ধে কোনো বাধা দেবে। ও এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন, যা খুশি তাই করতে পারে। এমন সুযোগ কোনো মতেই ছাড়া যায়না।

কিন্তু সবার আগে ওর নামটা বদলানো দরকার। কোনোগতিকে পাংক্তেয় ধরণের একটা নাম নিয়ে সেটা চালু ক'রে দিতে পারলে আর সবই খুব সহজ হ'য়ে যায়। ও তার খুব সোজা একটা উপায় আবিষ্কার ক'রে ফেললে। প্রাইভেটে রঞ্জন চৌধুরী নাম দিয়ে ও পরের বছরে আবার একবার ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিলে। এবার সে বেশ গৌরবের সঙ্গে অনেকগুলো লেটার্স্ নিয়ে পাশ হলো। তখন ঐ নামেই সে ভবানীপুর অঞ্চলের একটা নামজাদা মিশনারি কলেজে গিয়ে ভর্তি হলো। সময় থাকতে তাড়াতাড়ি টাকা জমা দিয়ে সেখানকার হস্টেলে ও একটা সীট নিয়ে নিলে।

প্রথমে অবশ্য ওকে বেগ পেতে হয়েছিল বিস্তর। এ সব কথা

"কারো কাছে প্রকাশ করা চলেনা। লুকিয়ে লুকিয়ে ওকে এতোটা কাণ্ড করতে হয়েছে। নইলে যে সমস্ত মাটি হ'য়ে যাবে। অবশেষে রাবিয়া বিবি আর ফতিমা বিবির কাছে বললে যে এবার সে হষ্টেলে থেকে পড়াশোনা করবে। হষ্টেলে না থাকলে ভালোরকম ক'রে পাশ করাই যায়না। এবার ওকে কলেজে পড়তে হবে, বড়ো বড়ো পরীক্ষা পাশ করতে হবে, এখন আর বাড়িতে থেকে অতদূর পর্যন্ত টানা-পোড়েন করা চলেনা। সপ্তাহের মধ্যে পাঁচটা দিন মা ও কলেজেই থাকবে, শনি রবিবারে আর ছুটিছাটা হ'লেই বাড়ি চলে আসবে। রাবিয়া বিবি এতে ভয়ানক আপত্তি তুলেছিলেন কিন্তু ফতিমা বিবি ওর সহায়তা করলেন। আর ওই হলো এখন সংসারের কর্তা, কারো কোনো আপত্তি টিঁকলো না।

বিষয় সম্পত্তির দেখাশোনা করবার জন্তে ওর বাপের আমলের একজন বিশ্বস্ত কর্মচারী ছিল, তার নাম শোভান মিঞা। সেই বৃদ্ধও একবার খানিকটা আপত্তি তুললে। সে বললে, বাড়ি ছেড়ে ওকে এই বয়সে অন্ত কোথাও থাকতে দেওয়া যেতে পারে না। বৃদ্ধের বেতনের মাত্রা বাড়িয়ে দিয়ে আর অনেক তোয়াজ ক'রে সে তার মুখটা একদম বন্ধ ক'রে দিলে। সিনেমার টাকাকড়ি বুঝে নেবার ভারও সে তার হাতেই ছেড়ে দিলে। বৃদ্ধকে এতটা খোসামোদ ও বিশ্বাস করাতে সে বেচারা সমস্ত কাজের ভার নিতে সহজেই স্বীকার হ'য়ে গেল। নির্দিষ্ট দিনে ও হষ্টেলে গিয়ে নিজের ঘরটি অধিকার করলে।

এর পর থেকে কলেজে ওর পরিচয় হলো রঞ্জন চৌধুরী, যদি বাড়িতে এলেই আবার ও হ'য়ে যেতো সেই রমজান। কিন্তু কোথায় ওর বাড়ি আর কি ওর সাংসারিক অবস্থা তা কলেজের কেউ

ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলে না। সকলকেই ও বলতো যে কলকাতার কাছাকাছি কোনো গ্রামে ওর পরিবারবর্গ থাকে, কলেজ বন্ধ হলেও সেখানেই চলে যায়।

বিজন

বিজন এখন সর্বতোভাবেই রঞ্জন হয়ে গেছে। সবাই দেখে রঞ্জনের চেহারাটাও যেমন মনোরম, সাজসজ্জাও তেমনি পরিপাটি। দেখলেই মনে হয় কোনো একটা বনেদি ঘরের ছেলে। ওর গায়ের রং কলেজের অনেক ছেলেদের চেয়ে ফর্সা। পাশাপাশি দাঁড়ালে মনে হতো যেন অনেকের চেয়েই একটু বেশি লম্বা। সতেরো আঠারো বছরের ছেলেকে মনে হতো যেন চব্বিশ পঁচিশের মতো। কলেজে অনেকেই কোটপ্যান্ট প'রে আসতো, হস্টেলে অনেকেই পায়জামা পাঞ্জাবি প'রে থাকতো; ওর কিন্তু সব সময়েই ধুতি আর শার্ট। ও যে ধুতি পরতো সে পুরো বাহান্ন ইঞ্চি বহরের; অনেকটা জমিদারদের ধরণে কাছাকোঁচা মেরে পরা। তার দুই পায়ের দুই প্রান্ত কেঁপে উঠে ব্রাউন রং-এর সোয়েড্ কিডের গ্রীসিয়ান স্লিপারের পাম্পিসের ওপর লুটিয়ে পড়তো। ও যে শার্ট পরতো তা ধব্‌ধবে সাদা টুইলের, না হয় ঝিক্‌মিকিয়ে দেওয়া সাদা সিল্কের। প্রত্যহই তা ধোপদুরস্ত। গলার বোতামটা চিরকালই খোলা, কলারটা ঘাড়ের পেছনে তোলা। টেনিস প্যাটার্নের বোতাম খোলা হাতাটা কোনোদিন বা কব্জিতে বাঁধা সোনার ঘড়ির ওপর লুটিয়ে পড়ে, আবার কোনোদিন বা কনুই পর্যন্ত আস্তিন পাটে পাটে গোটানো থাকে। শীতকালে এরই ওপর চড়ে খুব হাল্কা ব্রাউন রং-এর পুলওভার আর কোট। রঙীন জামা কাপড় পরা সে মোটে পছন্দ করে না। সমস্ত বেশভূষার মধ্যে রঙীন দেখা যায় কেবল ওর রুমালটি। পকেটে রুমাল থাকে রকম রকম,—কোনোদিন গাঢ় বেগুনি রং-এর, কোনোদিন খুব ক্রোম

খুনখারাবি রংএর, কোনোদিন চাঁপার মতো হলুদে, কোনোদিন আসমানের মতো নীল। রুমালের কোণার খানিকটা অংশ নিতান্ত যেন অবহেলায় বুকপকেট থেকে প্রায়ই একটু বাইরে বেরিয়ে থাকে।

ওর গায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই পাওয়া যায় কোনো খুশবোদার মাথার তেল কিংবা সেন্টের একটা সূক্ষ্ম ধরনের সুবাস। একবার মনে হয় কি যেন একটা চমৎকার গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, একবার মনে হয় কৈ না। মাথার চুলগুলি সর্বদাই একটু বড়ো বড়ো, সামনের দিকে ঝুঁকে পড়া, কোঁকড়ানো, অবিন্যস্ত—সেটা অবশ্য ইচ্ছে ক'রেই। অর্থাৎ ইচ্ছে ক'রেই সে স্নানের পরে বহুক্ষণ পর্যন্ত চুলগুলোকে আঁচড়ায় না। তারপর যখন ভিজে চুলগুলো শুকিয়ে একটা এলোমেলো গোছের প্যাটার্ণ নিয়েছে, তখন আর আঁচড়ালেও তার কোনো বিকারই হয় না। কিন্তু চুলের বিন্যাস না থাকলেও অন্যান্য প্রসাধনের দিকে বিলক্ষণ নজর আছে। অল্পবয়স থেকেই ওর ঘন গোঁফদাড়ি গজাতে শুরু হয়েছিল। সেইগুলোকে ও নিত্য সযত্নে কামিয়ে ফেলে, তার একটুও আভাসমাত্র প্রকাশ হ'তে দেয়না। কামাবার পরে মুখে মাখে ক্রীম, আবার তোয়ালে দিয়ে তখনই তা রগ্ড়ে মুছে ফেলে।

ওর চোখের দৃষ্টি হয় রকম রকম। মাঝে মাঝে জলন্ত পিপাসার্ত, আবার মাঝে মাঝে যেন শীতল জল পান ক'রে পরম তৃপ্ত [illegible]। অর্থাৎ ওর চোখ দুটো দপ্ ক'রে পাঁচশো ক্যাণ্ডেল পাওয়ারের মতো জ্বলে উঠতেও জানে, আবার শস্যাক্ষেত্রের সবুজ কান্তির মতো স্নিগ্ধ স্তিমিত হ'তেও জানে। মুখের হাসিটি বড়ো অমায়িক, দেখলেই মনে হয় মাটিতে লুটিয়ে পড়ে সকলের পদানত হ'তেও বুঝি ওর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই। কিন্তু তবু ওকে যারা চেনে তারা

বুঝে যে ওর অনাধিকতার মধ্যেও একটা অটুট আত্মপরিচয় আছে।

হস্টেলে থাকতে থাকতে ও নিজের ঘরখানিকে মনের মতো করে সাজিয়ে নিয়েছে। সরঞ্জাম খুবই কম—একটি খাট, একটি টেবিল, একখানি চেয়ার, একটি টুল, আর একটি বইয়ের র‍্যাক। কোনের পাশে একটি দেয়াল-আলনা। টেবিলের সামনে রাখা আছে, শ্বেত পাথরের ধ্যানী বুদ্ধের মূর্তি। তার দুই পাশে দুই ফুলদানিতে দুটো ফুটনোন্মুখ রজনীগন্ধার গুচ্ছ। এক পাশে একটি ছোটো টেবিল-আয়না। তারই সামনে বই খাতাগুলো ইতস্তত ছড়ানো। তার মধ্যেই রয়েছে একটা অ্যাশ ট্রে, দুটো পেন্সিল, দুটো ফাউন্টেন পেন, একটা মোটা লাল-নীল পেন্সিল। র‍্যাকে অনেক রকমের সরু মোটা বই। আর দেয়ালের আলনাতে একখানি লাল গামছা, একটি তোয়ালে, একখানি চুনোট করা ধুতি পরিপাটি ক'রে কোঁচানো। তারই ঠিক নিচে মোটা ব্রাউন চামড়ার একটি স্যুটকেস। খাটের ওপরকার বিছানা শৌখিন পাড় দেওয়া বেডকভার দিয়ে ঢাকা। খাটের মাথায় ধব্‌ধবে সাদা নেটের মশারিটা গোটানো। ঘরের এক কোণে টিপয়ের ওপরে একটি কাচের গ্লাস ঢাকা কুঁজো। ঘরে ঢুকলেই মনে হবে ছেলেটির বেশ সৌষ্ঠববোধ আছে।

রঞ্জন এখন আপাতদৃষ্টিতে খুবই পরিতৃপ্ত। যা ও চেয়েছিল তাই হয়েছে। ও এখন পাঁচজন কলেজ ষ্টুডেন্টের ভেতরকারই একজন, তাদেরই মতো কোনো এক বাঙালী পরিবারের সুন্দর একটি যুবক। ষ্টুডেন্টদের দলের মধ্যে থেকে ও তাদেরই মতো স্বচ্ছন্দে ওঠে বসে, তাদেরই মতো আমোদ করে, তর্ক করে, পরনিন্দা করে, ফুটবল ম্যাচ দেখে, দল বেঁধে নতুন আমদানি সিনেমা দেখতে যায়,

বন্ধুদের পকেটে হাত দিয়ে লেকের ধারে পায়চারী ক'রে বেড়ায়, সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বের ক'রে বন্ধুদের দিয়ে নিজেও ধরায়। কে এখন ওকে দেখে বলবে যে ঐ রঞ্জন সেই মুস্তাফা সাহেবের কুড়িয়ে পাওয়া ছেলে রঞ্জন ?

কিন্তু তবুও একথা বলতে হবে যে আজকালকার উড়ো উড়ো ধরণের চালচলনে অলসবিলাসী অদূরদর্শী বাবু-ছেলেদের মতো সে মোটেই নয়। কিছু একটা অসাধারণ বিশেষত্ব যে ওর আছে, সেটা ভালো ক'রে লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। আড্ডায় মিশে গেলেও আড্ডাতেই সম্পূর্ণ নিমগ্ন হ'য়ে সে থাকেনা। বন্ধুরা হৈ-হল্লার মাঝখানে যখন মাঝে মাঝে ওর চোখের দিকে চায়, তখন এক একবার আশ্চর্য হ'য়ে বোধ করতে থাকে যেন একটা [illegible] আমোদ-কোলাহলের মধ্যে যোগ দিতে থেকেও ও অতল জলে কালের আবর্তে কোথায় হারিয়ে গেছে।

অনেক দিক দিয়েই রঞ্জন কলেজের মধ্যে কিছু বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিল। ফুটবল খেলার দিকে ও ঘেঁষতো না, কিন্তু টেনিস আর ব্যাডমিন্টন ভালোই খেলতো। এদিকে কাব্য আর সাহিত্যের দিকে বেশ ঝোঁক ছিল, কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদনার ভার কিছুকালের জন্যে ওর উপরেই পড়েছিল। গান বাজনাতেও বেশ দখল, রবীন্দ্রনাথের কয়েকটা গান ভালো ভাবেই গাইতে পারতো। হস্টেলে কোনো একটা উপলক্ষে কিছু গান বাজনার আয়োজন হলেই ওকে অনেকে সেখানে গান গাইতে অনুরোধ করতো। কিন্তু সব চেয়ে বেশি খ্যাতি রটেছিল ওর বক্তৃতায়। সভায় দাঁড়িয়ে বড়ো বড়ো কথা বলতে ওর মুখে একটুও আটকাতো না, ইংরেজী কিংবা বাংলায় ও সমানভাবে টানা বক্তৃতা ক'রে যেতে পারতো। যে জিনিসটাকে সমর্থন ক'রে ও বক্তৃতা শুরু করতো, তার সপক্ষে ও দামী দামী যুক্তির পর যুক্তি এনে

ফেলতো; সে যুক্তিকে সহজে কেউ খণ্ডন করতে পারতোনা। কলেজের অধ্যাপকরা পর্যন্ত ওর বক্তৃতা শুনে চমৎকৃত হ'য়ে বলতেন, ছোকরা অনেক কথাই ভাবে, আর বেশ গুছিয়ে বলতেও জানে।

ওর কয়েকজন ভক্তও জুটে গিয়েছিল। রূপেও লোককে আকর্ষণ করে, আর গুণেও করে। তবে রূপটা হলো বিধাতার প্রদত্ত, আর গুণটা হলো নিজের আয়ত্ত। বোধ হয় সেই কারণে রূপের আকর্ষণটাই গুণের চেয়ে অনেককে একটু বেশি ক'রে টানে। বিশ্রী চেহারার মধ্যে অনেক বেশি গুণ থাকলেও তা সহসা তেমন নজরে পড়েনা, কিন্তু সুশ্রী চেহারার একটুখানি মাত্র গুণই মানুষকে যেন অতিশয় চমৎকৃত করে। এই কারণেই হয়তো জনপ্রিয় হ'তে রঞ্জনকে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি।

ওর দুটি অন্তরঙ্গ বন্ধুর কথা এখানে বিশেষ ক'রে বলতে হয়। একজন হলো রূপেন, আর একজন পরেশ। রূপেনের বাপ মা নেই, তার মামা হলেন বাংলা সেক্রেটারিয়েটের একজন উচ্চ কর্মচারী। তিনিই টাকা দিয়ে হস্টেলে রেখে ওকে লেখাপড়া শেখাচ্ছেন। আর পরেশ হলো গরিবের ছেলে। মেধাবী ছাত্র ব'লে স্কলারশিপ আর ফ্রী স্টুডেন্ট-শিপ পেয়ে সে এই কলেজে পড়ছে। রঞ্জনকে রূপেন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে, আর পরেশও তাই। তবে দুজনের মধ্যে একটু তারতম্য আছে। রূপেন ওর ভালোবাসায় অন্ধ। আর পরেশ হলো ওর গুণগ্রাহী।

কলেজে অনেক ধরণের ছাত্রই পড়ে। ছাত্রেরা স্বভাবতই হুজুগপ্রিয়। কিন্তু হুজুগ জিনিসটা রঞ্জন মোটেই পছন্দ করতো না। যারা হুজুগের মাতে, আর যাদের সঙ্গে মতের মিল না হয়, তাদেরকে ও যথাসম্ভব এড়িয়ে চলতো। তবে তর্কসভায় যখন তারা নিজের অভিমত জাহির করতে আসতো, তখন চোখা চোখা যুক্তির বাণে বিদ্ধ ক'রে ও তাদের

এজন্যে কাবু ক'রে ফেলতো। আবার সভার বাইরে গেলেই এমন ব্যবহার করতো যেন তাদের আর চেনেই না।

একবার ছাত্রমহলে সাম্যবাদের ঘোরতর হুজুগ উঠলো। যারা খেটে খায় আর যারা খাটিয়ে খায়, এ দুই জাতের মানুষের মধ্যে উপার্জনের দিক দিয়ে অনেক পার্থক্য। এমন অন্যায় অসামঞ্জস্য ভায়েরা, পৃথিবীতে কেন থাকবে? যারা প্রাণ দিয়ে দেহের রক্ত দিয়ে খেটে মরবে তারা পাবে অনেক কম, আর যারা চেয়ার টেবিলে বসে কলমের হুকুমে সেই লোকদের খাটিয়ে মারবে তারা পাবে অনেক বেশি, এটা কোন যুক্তি? সকলেরই যখন সমান ক্ষুধা, সকলেরই যখন সমান আরাম উপভোগের অধিকার আছে, তখন খাটনেওয়ালা আর খাটানে-ওয়ালার মধ্যে মুনাফার বখরাটাও যথাসম্ভব সমান সমানই হওয়া উচিত। যারা কুলি মজুর কারিকর, তারা মূর্খ আর অজ্ঞ বলেই এতটা বুঝতে পারেনা, ধনী ক্যাপিটালিষ্টরা খুব চাতুর্যের সঙ্গে চিরকাল তাদের এক্সপ্লয়েট করে। এটা হ'তে দেওয়া আর উচিত নয়, ছাত্রদের তরফ থেকে এর বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রোপাগাণ্ডা শুরু করার সময় এসেছে।

তর্ক সভায় অনেকেই যখন এই মতে মত দিয়ে সার্বজনীন একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করলে, রঞ্জন তখন দাঁড়িয়ে উঠে বললে—"এরও সপক্ষে যুক্তি কিছু একটা আছে বৈকি। এই রকমের ব্যবস্থাই যেহেতু পৃথিবীতে ইতিপূর্বে দাঁড়িয়ে গেছে এবং টি'কে গেছে, এইটেই হলো সব চেয়ে সোজা যুক্তি। ছোটো আর বড়ো, এই যে দুটো আলাদা কথার সৃষ্টি হয়েছে, তার যথেষ্ট হেতু আছে। এরই দ্বারা উৎকর্ষের প্রয়াসটা জোরালো হয়। ছোটোকে যদি বড়োর সমান বলবার মতলব করা যায়, তাহলে তাকে অভিধানের ভুল হবে। ছোটোরও পেট ভরুক আর বড়োরও পেট ভরুক, এই পর্যন্তই থাকতে পারে সাম্যবাদের সীমা, আর বেশি অধিকার চাইলে

একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। এক্সপ্লয়েট করার কথাই যদি হিসাব মতো বিচার করা যায়, তাহ'লে দেখা যাবে যে আমরা প্রত্যেকেই প্রত্যেককে এক্সপ্লয়েট ক'রে থাকি। নইলে বাঁচতেই পারিনা। যারা নিজেরা নিষ্কর্মা হয়ে শুধু বক্তৃতার মঞ্চে দাঁড়িয়ে পরের জন্যে মাথাব্যথা নিয়ে সাম্যবাদের দাবী করে, তারাও কি ঘরের পরিশ্রমী উপার্জনকারী-দের এক্সপ্লয়েট করে না? মোটের ওপর সাম্যবাদের প্রশ্নটা অতো সহজ নয়। ওর মধ্যেও অনেক রকমের মারপ্যাঁচ আছে। আর এ প্রশ্ন নিয়ে এই কলেজের ছাত্রদেরও এত মাথাব্যথার কোনো দরকার নেই। যার যেটা ক্ষেত্র তার সেইটে নিয়েই চর্চা করা ভালো। সাম্য-বাদের বিচার আপাতত আমাদের মুলতুবি রাখাই স্বযুক্তি, যতদিন পর্যন্ত নিজেদের উপার্জনের ক্ষেত্রে নেমে পড়বার সৌভাগ্য কিংবা দুর্ভাগ্য না হয়। কার্যক্ষেত্রের সম্পূর্ণ বাইরে দাঁড়িয়ে আর অভিভাবকদের অনুগ্রহে আরামে থেকে আমাদের সাম্যবাদ বুলি কপচানোর কোনো অধিকারই নেই।"

"সভা থেকে বাইরে বেরিয়ে এসে পরেশ ওকে জিজ্ঞাসা করলে—"ছোটো আর বড়োর পার্থক্যটা যে থাকা খুব দরকারী একি তুমি সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করো? ছোটো যে, সে কি চিরকালই ছোটো হ'য়ে থাকবে, বড়ো হবার কোনো সুযোগ পর্যন্ত তুমি তাকে দেবে না?"

"নিশ্চয় দেবো। এমন কথা তো আমি বলিনি। আমি যে নিজেও ছোটো থেকে বড়ো হ'তে চাই।"

"সে কি কথা? তুমি নিজেকে খুব ছোটো মনে করো নাকি?"

"অনেকের চেয়ে ছোটো বৈকি। আমি যেমন আছি তার চেয়েও অনেকই আরো বড়ো হ'তে চাইবো, যদি আমার সাধ্য

থাকে। আর সেইজন্যেই তো বড়োর বড়োত্বটাকে মানা দরকার। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে যতক্ষণ ছোটোর থেকে বড়োত্বে প্রোমোশন না পাবো ততক্ষণ নিজেকে ঐ বড়োর কাছে ছোটো বলেই মেনে নেবো। ততক্ষণ ছোটো হ'য়ে থেকে বড়োর সুবিধাগুলোকে গায়ের জোরে কিংবা যুক্তির জোরে দাবী করতে যাবোনা।"

"তুমি হয়তো তা করবে না, কিন্তু অনেকেই তাই করছে। তারা বলছে, বড়োর একটা মার্কামারা নাম আর সুযোগ নিয়ে অন্যকে বঞ্চিত ক'রে বাছা বাছা আরামগুলো আত্মসাৎ করা, এটা তো ফাঁকি। তারা বলে সব রকম আরামই সমান বাঁটোয়ারা ক'রে নাও। আচ্ছা, আজকালই বা ছোটো-বড়োর অধিকার নিয়ে সকলের মধ্যে একটা রেষারেষি আর কাড়াকাড়ি চলেছে কেন? আগে তো কোনো কালেই এমন ছিলনা। উন্নতির জন্যে সবাই চেষ্টা করতো বটে, কিন্তু অন্যের সুপ্রতিষ্ঠিত অধিকারকে নির্বিবাদে সকলেই মেনে নিতো। এখন সেটা আর কেউ মানতে চাইছে না কেন?"

"লোকের দৃষ্টিভঙ্গি এখন অন্য রকমের হ'য়ে গেছে, তাই। জীবনের সুখটা মানুষ চিরকালই খুঁজে এসেছে, তখনও আর এখনও। তবে কিনা জীবনের সুখ জিনিসটাকে মাপবার জন্যে আগেকার লোকে অন্য ধরণের মাপকাঠি ব্যবহার করতো। সেটা পয়সার মাপকাঠি নয়। কিন্তু আজকাল কাপড় জামা, সাজ সরঞ্জাম, গাড়ি ঘোড়া, বিষয় সম্পত্তি, এইগুলোই হলো সুখের মাপকাঠি। আবার যদি কখনো কোনো যুগে এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গিটা বদলে যায়, যদি আবার কোনো অন্য রকমের মাপকাঠির চলন হয়, তা'হলে দেখা যাবে যে এই ধরণের সম্পদগুলোর অধিকার নিয়ে আর কোনোই গণ্ডগোল নেই। মানুষ আবার অন্য দিক দিয়ে তার সুখ খুঁজে পেয়েছে।"

রূপেন ওর এই সব কথাগুলো খুব মন দিয়ে শুনছিল। এবার সে বললে—"তুমি ভাই যা বললে, আমার মামাও কিন্তু অবিকল ঠিক এই রকম কথাই বলেন। আশ্চর্য, দুজনের কথায় এমন আশ্চর্য রকমের মিল কেমন ক'রে হয়, আমি কেবল তাই ভাবছি। তুমি যদি আমার মামার সঙ্গে একবারটি আলাপ করতে, তাহলেই বুঝতে পারতে, আমার কথা সত্যি কিনা। চলো না ভাই একদিন, ওঁদের বাড়িতে গিয়ে মামার সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই।"

সেই আলাপ করতে গিয়ে রঞ্জনের জীবনে আরো একটা নতুন অধ্যায় শুরু হ'য়ে গেল। ওর তখন মাত্র একুশ বছর বয়স, থার্ড ইয়ার ক্লাশে পড়ছে।

চার

রায় বাহাদুর মন্মথ চ্যাটার্জি রূপেনের মামা। থাকেন তিনি আলিপুর পার্কের এক সুরম্য বাগানওয়ালা বাড়িতে। তিনি বিপত্নীক। সংসারের মধ্যে তাঁর শুধু দুই মেয়ে, শ্রীমতী মীরা আর নীরা। দুজনেই কলেজে পড়ে, বয়সে বছর দুইএর মাত্র ব্যবধান। দুই মেয়েকে নিয়ে ভদ্রলোক বেশ স্বচ্ছন্দেই থাকেন। তাদের নিয়ে সকালে বাগান পরিচর্যা করেন, বিকেলে ব্যাডমিন্টন খেলেন, আর সন্ধ্যার পরে বই নিয়ে শিক্ষকতা করতে বসেন। মায়ের মৃত্যুর পরে মেয়ে দুটি স্বাধীনতার মুক্ত আবহাওয়ার মধ্যে ছাড়া পেয়ে মানুষ হয়েছে। বাপের কাছ থেকে যত খুশি আদর পেয়েছে, আস্কারা পেয়েছে, অন্তরঙ্গতাও পেয়েছে। সেই মতোই সংকোচশূন্য তাদের আচার ব্যবহার আর রীতিনীতি দাঁড়িয়ে গেছে। বাপকে ভক্তি করে, কিন্তু ভয় করে না। বাপের সঙ্গে কখনো তর্কও করে, কখনো ঝগড়াও করে। যখন যা মনে আসে তাই খোলাখুলি বাপকে শুনিয়ে দেয়। কিন্তু বাপ ওদের কোনো কথাতেই রাগ করেন না। গুরুজনের সম্বন্ধে মেয়েদের একটা মর্যাদা-বোধ থাকা উচিত সেটুকু অবশ্যই ঠিক আছে। কিন্তু পিতাপুত্রীর সম্পর্কের মধ্যে সাধারণত যে দুস্তর একটা গভীর জলের খাদ কেটে দেওয়া হয়, যেটা পার হ'য়ে পরস্পরের মিলিত হবার কোনো ব্যবহারিক সেতু নেই, ওদের জন্যে সেই খাদটা কেউ আলাদা ক'রে কেটে দেয়নি। বাপের সঙ্গে মেয়েরা তাই অবাধে মেলামেশা করে, এমন কি অনেক রকমের মনের কথাও বিনা দ্বিধায় প্রকাশ ক'রে

তুলে ফেলে। অন্ত লোকের কানে সেগুলো খটকা লাগবার মতো, কিন্তু ঐ ভদ্রলোকের তাতে বিন্দুমাত্র স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যাঘাত হয় না। নিজের মেয়েদের তিনি বরং একটু বেশি বেশি অন্তরঙ্গ করেই রাখতে চান।

ভদ্রলোক যে একটু আধুনিকপন্থী এবং উদার মতের, এ কথা স্বীকার করতেই হবে। হয়তো অবস্থা গতিকেই এমন হ'য়ে গেছেন। মেয়ে দুটি ছাড়া কারো সঙ্গে যে দুটো হাল্কা ধরণের বাজে কথা কইবেন, এমন কেউ ওঁর ঘরে নেই। উনি হলেন মহা দায়িত্বপূর্ণ কাজের লোক, সবাই ওঁর সঙ্গে খুব দায়িত্বপূর্ণ কাজের কথাই কইতে আসে। আপিস করা, কাজের কথা বলা, আর অবসরের সময় মুখ বুজিয়ে ম্যাগাজিনগুলোর পাতা ওল্টানো, এই নিয়ে প্রাত্যহিক সবটুকু সময় কাটানো হয়তো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। হাল্কা কথা আর হাসিখুশির মধ্যে মাঝে মাঝে কিছু মুখবদল ক'রে নেবা তাঁর দরকার হয়। এগুলোকে রায় বাহাদুর মন্মথ চ্যাটার্জি সময়ের বাজে খরচ বলে মনে করেন না, বরং খানিকটা ষ্টিমুল্যান্ট হিসেবেই দে দেখেন। স্ত্রী আর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে লোকে যেমন ভাবে কথা বলে সেটা ঐ উনি মেয়েদের সঙ্গে অনেকটা তেমনি ভাবেই এমন সব কা যাতে মনে হ'তে পারে ওঁর মুখের কোনো আঁট নেই। ওঁ

এর মধ্যে

দিয়ে বড়ো মে বসে আপনাআপনির মধ্যে সব রকমের কথাই বল একটা নির্দোষ আমোদ।

যতটা কর্ম্ম নীর পুরো হিন্দু। খুব আনুষ্ঠানিক হিন্দু না হ'লেও এবং অনে অনেক তারতম্য অ হ'লেও উনি মনে প্রাণে হিন্দু। অর্থাৎ জুতো পা ধীরার মুখের লালিত মোন বাবুর্চির রান্না মুর্গির মাংস খেলেও গলায় পৈ নীরেন। কেউই অবশ্য করেন নি। সন্ধ্যাআহ্নিক কিংবা গায়ত্রী জপ বালাই, কিন্তু তা বললে ঠাকুর দেখে প্রণাম করেন। বিলেতের কা উনি নিজের করে বুঝে নি

ঠাকুরের অসাধারণ দেবত্ব সম্বন্ধে ছেলেবেলাকার একটা বদ্ধমূল বিশ্বাস এখনও ওঁর মনে ধরে রয়ে গেছে। অথচ বাইরের আচারে ব্যবহারে উনি পুরোদস্তুর সাহেব। ঘরে এবং বাইরে বেশির ভাগ সময় প্যান্ট পরেই থাকেন, ধুতি পাঞ্জাবি পরতে বড়ো একটা দেখা যায় না। সবাই ওঁকে চ্যাটার্জি সাহেব বলেই ডাকে। সাহেব কিন্তু ঘরে বসে পান জর্দাও খান, গড়গড়াতে তামাকও খান, আর পান চিবোতে চিবোতে খড়কে কাঠি দিয়ে দাঁতও খোঁটেন। এদিকে দেখা যায় প্যান্টের ভাঁজগুলি আর টাইএর কাজটি অতি নিখুঁত, পালিশ করা পায়ের জুতো জোড়া সর্বদাই চকচক করছে, বাইরে বেরুলেই মুখে দেখা যায় কড়া ধরণের বর্মা চুরোট, মাথার কাঁচাপাকা চুলগুলো উঁকিমারা টাকের চামড়ার ওপর দিয়ে ব্যাকব্রাশ করা, হাতের আঙুলে ফ্রী-মেসনের সীল বসানো আংটি, ইংরেজী বলেন খাঁটি সাহেবদের মতো।

মেয়ে দুটি আপাদমস্তক মডার্ণ। পায়ে হীলতোলা জুতোর খট্‌খট্ শব্দে সিমেন্টবাঁধানো বারান্দাকে মুখর ক'রে চলে, চমক লাগানো রংএর সুরাটি ছাপা শাড়িগুলোকে অনেক প্যাঁচ দিয়ে ঘুরিয়ে এনে পিঠের দিকে তার লম্বা আঁচল ঝুলিয়ে দেয়, কানের [illegible]সে তা[illegible] স্পন্দনে মাঝে মাঝে তার জহরৎগুলো থেকে আকস্মিক আ[illegible] কোনে ঝিলিক ছড়ায়, ফাইন রেশমী কাপড়ের গলাকাটা টাই[illegible] বক্ষো[illegible] সমাই গায়ে আঁটে, বাগানের মধ্যে ছুটোছুটি ক'রে ব্যাড[illegible] কত [illegible]জাপুত্রী[illegible] আবার তুচ্ছ তুচ্ছ কথায় কলকণ্ঠে খিলখিল ক'রে [illegible]জলের ধাপ কেটে কথাবার্তা খুবই মার্জিত। কিন্তু বাংলা উচ্চারণ[illegible] [illegible]লিত হবার কোনো এরা কোনো ভিন্ন প্রদেশের মেয়ে বুঝি, সবে আ[illegible] [illegible]টা কেউ আন্দাজ ক'রে বলতে শুরু করেছে। লোকে যদি বাইরের [illegible] অবাধে মেলামেশা করে তাবে যে মেয়েগুলো বড়ো চালিয়াৎ, তাইতে [illegible] বিনা দ্বিধায় প্রকাশ ক'রে

যায় না। আসলে কিন্তু তা নয়। বাইরের চালচলন অবস্থার অমন হলেও ওদের অন্তর কিন্তু সরল। এটা খুব আশ্চর্যের কথা না হাবভাবের সঙ্গে অন্তরের প্রকৃতি অনেক সময়েই ঠিক ম্যাচ করেনা।

ওদের মধ্যে ধীরা অনেকটা শান্তপ্রকৃতির। কেউ ওকে কো কথা বললে কেমন একটা স্থির অথচ বিস্মিত দৃষ্টিতে তার মুখের দি চেয়ে থাকে। সে দৃষ্টিতে তখন পলক পড়ে না। আর নীরা কিছু চ প্রকৃতির। ওর সঙ্গে কেউ কথা বললেও তার সামনাসামনি চাইতেই পারে না, অস্থির হ'য়ে আশেপাশে পকাশবার চোখ ফেরায়, বক্তার কথা শোনার চেয়ে সেই দিকেই তখন ওর বেশি মনঃসংযো এদের দুজনের মধ্যে এমনিতরো ছোটোখাটো অনেক বৈচিত্র্য আ আর তার অবশ্যই কিছু কারণ আছে। নিজের নিজের নির্দিষ্ট বাহ্ন ওরা অনেক আগের থেকে নিজেরাই আয়ত্ত করে নিয়েছে। আসল ক ওদের দুজনের মধ্যে সব কিছু নিয়েই একটা প্রচ্ছন্ন প্রতিযোগি ধারা চলে আসছে। অথচ সেটা কেউ কাউকে প্রকাশ্যে জান দেয়না। প্রতিযোগিতার সূত্রপাত প্রধানত বাপকে নিয়েই। তারপ সেটা এখন ক্রমশ সব কিছুতেই ছড়িয়ে গেছে।

এর মধ্যে আরো একটা গুহ্য ব্যাপার আছে। রূপ-চাকচিক্যের দিয়ে বড়ো মেয়ের স্থান ছোটোর চেয়ে একটু উঁচুতে। গায়ের রঙে ধী যতটা ফর্সা নীরা তার চেয়ে খানিকটা মলিন। এ ছাড়াও অ অনেক তারতম্য আছে। ধীরা একটু লম্বা, নীরা তার চেয়ে বেঁ ধীরার মুখের লালিত্যকে বলা যায় সরেস, নীরার লালিত্য তার নীরেস। কেউই অবশ্য নিক্তি ধরে এই সমস্ত নিয়ে বিচার ক করেনা, কিন্তু তা বললে কি হয়। ওরা নিজেদের মনে মনে ঠিকই হিসেব করে বুঝে নিয়েছে। তাই ধীরা যখন কারো ক

লোকাজুজি ভাবে খানিকটা কিছু সমাদর পেয়ে যায়, নীরা তখন চালাকির দ্বারা অন্য উপায়ে তার চেয়েও আরো কিছু বেশি মনোযোগ আকর্ষণ করে। নিজের সৌন্দর্যক্রটির পরাজয়টুকু ও এমনি ক'রেই পুষিয়ে নেয়। ধীরা যদি ভাবে কাটে, তো ও কাটে ধারে। ধীরা একটু ভালোমানুষ গোছের মেয়ে, নীরা ওর চেয়ে অনেক চালাক। ওদের মধ্যে দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রতিযোগিতাটুকু এমনি ভাবেই চলে আসছে।

রূপেন যেদিন বিকেলে রঞ্জনকে নিয়ে হঠাৎ ওদের ওখানে উপস্থিত হলো সেদিন ওরা তিন পিতাপুত্রীতে নতুন একজন আড্ডা দেবার সঙ্গী পেয়ে ভারী খুশি হ'য়ে উঠলো।

চ্যাটার্জি সাহেব তখন বাগানে দাঁড়িয়ে কাঁচি নিয়ে নিজের হাতেই একটা গোলাপ গাছের ডাল কাটছিলেন। মেয়েরা কাছে দাঁড়িয়ে বলছিল—"ও ডালটা কেটোনা বাবা কেটোনা।" উনি ওদের কথায় সেটা কাটতে একটু ইতস্তত করছিলেন। রূপেনকে দেখেই কাঁচি ফেলে মহা উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠলেন—"আরে এসো এসো, অনেকদিন থেকে তোমার যে কোনো পাত্তাই নেই!"

রূপেন বললে—"এই দেখুন মামা, আমাদের কলেজের রঞ্জনকে আজ আমি জোর ক'রে ধরে এনেছি। এরই কথা আপনাদের কাছে সেবার বলেছিলাম।"

চ্যাটার্জি সাহেব হাসতে হাসতে বললেন—"শুধু কি একবার! কতবার যে বলেছো তার কি কোনো ঠিকানা আছে? রঞ্জনের কথা ছাড়া ইদানিং তোমার মুখে আর কোনো কথাই ছিলনা। বুঝলে রঞ্জন, তোমাকে না দেখেই তোমার সব কিছু ইতিহাস আমরা মুখস্থ ক'রে ফেলেছি। কোনো নতুন পরিচয় আর দিতে হবেনা, তুমি আমাদের কাছে পুরোনো হ'য়ে গেছো। চলো চলো, একটু ব্যাডমিন্টন খেলবে?"

আমিও তাই ভাবছিলাম, একজন পার্টনার পেলে হতো। তিন জনে তো আর খেলা জমে না।"

পালা ক'রে তখন খেলা শুরু হ'য়ে গেল। চ্যাটার্জি সাহেব প্রথমে একটু খেলেই ক্লান্ত হ'য়ে র‍্যাকেট ছেড়ে দিলেন। তখন হলো রূপেন আর নীরা এক দিকে, রঞ্জন আর ধীরা অন্য দিকে। পর পর কয়েকটা গেমেই রঞ্জনরা রূপেনদের হারিয়ে দিলে। কিন্তু খেলার মধ্যেই মেয়ে দুটির সঙ্গে রঞ্জনের বেশ আলাপ জমে উঠলো।

খেলার শেষে সকলে মিলে ড্রয়িং রুমে গিয়ে বসলো। দুজন বয় ট্রেতে ক'রে চা, বিস্কুট, কেক, প্যাটি, কমলা লেবু, কলা প্রভৃতি বহু রকমের খাদ্যবস্তু দফায় দফায় নিয়ে এলো। ধীরা আর নীরা প্লেটে ভরে খাবারগুলো প্রত্যেকের জন্যে সাজিয়ে ফেললে, আর চা তৈরি ক'রে প্রত্যেকের কাছে একে একে ধরে দিতে লাগলো। বাপকে আগে দিয়ে যেমনি নতুন অতিথি রঞ্জনকে চা আর খাবার দিতে গেল, অমনি সে বললে—"আমায় ও সব দেবেন না, আমি এখন কিছু খাবোনা।"

ধীরা বললে—"সে কি হয়? একটু কিছু খান। শুধু একটা কেক, আর এক কাপ চা।"

"মাপ করবেন, ও সব কিছুই আমি খাবোনা।"

"কেন? এখানে খেতে আপনার কোনো আপত্তি আছে নাকি? আমাদের হাতে বুঝি খাবেন না?"

নীরা বললে—"তা নয় দিদি। খেতে বললে রিফিউজ করাই হয়তো ওঁদের আজকালকার ষ্টাইল।"

"আপত্তিও নয়, আর ষ্টাইলও নয়। তবে এটাকে এক রকম বিদ্রোহ বরং বলতে পারেন।"

"বিদ্রোহ!" মীরা বললো—"বিদ্রোহ বুঝি? বিদ্রোহ করতে কিন্তু আমরাও খুব ভালোবাসি। বাবা যখন কালী ঠাকুর দেখেই হাতজোড় ক'রে প্রণাম করেন তখন তার বিরুদ্ধে আমরা ভীষণ বিদ্রোহ করি। কিন্তু এই বাবাজু খাবার জিনিসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে কি লাভ হবে বলুন? এগুলো খেয়েই ফেলুন।"

"বিদ্রোহ তো কোনো জিনিসের বিরুদ্ধে কেউ করেনা। বিদ্রোহ করা হয় এক একটা রীতির বিরুদ্ধে। আপনাদের এই যখন-তখন খেতে বলবার সামাজিক রীতিটার বিরুদ্ধেই আমি বিদ্রোহ করছি মনে করুন। কেউ একজন বাড়িতে এলে অমনি তাকে খানিকটা কিছু খেতে বলা হবে, আর সেও অমনি অম্লানবদনে তাই খেয়ে ফেলবে, নইলে ভদ্রতা হবে না, এই অদ্ভুত হাস্যকর রীতিটা সত্যিই বিদ্রোহ করবার মতো। বিজ্ঞানযুগের সভ্যতার মধ্যে এমন বিবেচনাশূন্য রীতির প্রচলন থাকা খুবই অন্যায়। মনে করুন এখানে আসবার আগেই হয়তো আমি পেট ভরে কিছু খেয়ে এসেছি। আবার রাত্রে হস্টেলের ঘণ্টা পড়লে তখন আমার খাবার সময় হবে। সেটা না জেনেশুনে আমাকে অতো রকমের খাবার এই অসময়ে খেতে বলার কোনো মানে হয়না। আমি একটা রাক্ষস নই। সেই কথা সোজাসুজি বলবার যদি আমার সাহস থাকে, তাই হলো বিদ্রোহ।"

চ্যাটার্জি সাহেব ওর কথাগুলো শুনে খুশি হ'য়ে উঠলেন। বললেন —"বাঃ, তুমি বেশ বলেছো। তোমার সাহস আছে দেখছি। এই তো চাই। ওদের মডার্ন সভ্যতার বাঁধা নিয়মগুলোকে এমনি করেই ভেঙে দেওয়া দরকার। তোরা জানিস, আমিও এইজন্যেই তোদের দেখিয়ে দেখিয়ে কালী ঠাকুরকে প্রণাম করি। ওটাও তোদের মডার্নিজমের বিরুদ্ধে আমার ঐ রকমের বিদ্রোহ। এবার বুঝলি তো?

"ওটা তো বাবা তোমার একটা ঘোরতর কুসংস্কার। তা ছাড়া আর কিছু নয়।"

মদন অমনি বলে উঠলো—"কেন, ওটা ওঁর বিদ্রোহ নাই হোক, কিন্তু কুসংস্কারই বা কেন হবে? অন্যের পক্ষে যাই হোক, ওঁর পক্ষে আমি তো বলি, উনি ঠিক কাজই করেন। এবার থেকে আমিও ওঁর মত্তো ঠাকুর দেখলে প্রণাম করবো।"

"আপনিও করবেন? কেন, আমাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে নাকি? আপনি বুঝি বাবার মনের দুর্বলতাটাকে এমনি জোর ক'রেই সাপোর্ট করতে চান?"

"না, তা কেন? এ তো হলো একটা আলাদা প্রশ্ন। একে আপনারা দুর্বলতা বলছেন কোন হিসেবে? উনি কি ঠাকুরকে সাক্ষাৎ সর্বশক্তিমান মনে করেই প্রণাম করেন? নিশ্চয়ই তা নয়। একটা বর্বর যুগের মানুষ উনি যে নন, সে কথা না বললেও চলবে। কিন্তু তবুও এর কারণ আছে। এতকাল পর্যন্ত এই দেশের মানুষ যেহেতু ঐ কালী ঠাকুরকেই ভক্তি ক'রে প্রণাম ক'রে আসছে, উনি সেই হেতু তাদের সকলের ভক্তির সঙ্গে সায় দিয়ে সেই ভক্তিটাকেই প্রণাম করেন। এটা ওঁর পক্ষে খুব প্রশংসার বিষয়। দেশের এত লোকের ভক্তিকেও একটু ভক্তি করতে হয়।"

"তাই ব'লে কাদামাটির গড়া যা তা একটা মূর্তি দেখলেই তাকে অমনি ভক্তি করা যায় নাকি?"

"বিলেতের মানুষ সিস্টার নিবেদিতা আমাদের দেশে এসে ঐ কালী ঠাকুর সম্বন্ধে কি কি সব বলেছিলেন তা বোধ হয় আপনারা পড়েন নি। ঐ যে কালী ঠাকুর, ও তো আমাদের শিল্প কল্পনাকে রূপ দেওয়া একটা খুব উঁচুদরের আর্ট। এমন একটা জাতীয় আর্টের, [illegible]

শ্রদ্ধা করাই তো উচিত। আমারই নিজের দেশের আর্টিস্টের কল্পনার মূর্তিকে আমি মাথা নুইয়ে প্রণাম করবো, তার মধ্যে দুর্বলতার কি আছে ?”

“কিন্তু দেখুন, আমাদের এই বাংলা দেশেই এত সব ঠাকুর দেবতার ছড়াছড়ি। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশেই এতটা নেই। ঠাকুরপুজোর এমন বাড়াবাড়ি দেখা যায় কেবল এই বাঙালীর দেশে। তার মানে এই নয় কি, যে আমরাই হলুম সব চেয়ে বেশি দুর্বল প্রকৃতির জাতি ? অর্থাৎ নিজেদের ক্ষমতার ওপর একটুও বিশ্বাস নেই। নইলে সব রকমের সম্ভাব্য বিপদের কল্পনায় এক একটা মূর্তি খাড়া ক'রে আমরা তেত্রিশ কোটি দেবতা গড়েছি কেন ?”

“বিপদের কল্পনাকে বলাটাই ভুল হচ্ছে, বরং আদর্শের কল্পনাকে রূপ দেওয়া বলতে পারেন। সেইটেই তো বাঙালীদের সব চেয়ে বেশি বাহাদুরি ! আমরা যে খাঁটি শিল্পীর জাত। নইলে ঠাকুরপুজো তো জগতের সব দেশেই আছে, কিন্তু এত বিচিত্র রকমের ঠাকুর গড়া আর কোন্ দেশে দেখা গেছে ? দেবতাদের এত রকম রূপ দিয়েছে কেবল গ্রীস আর ভারতবর্ষ। আর তার মধ্যে সব চেয়ে বেশি কাণ্ডটা করেছে এই বাংলা দেশ। আপনারা দেখতে পান না, এখনও পর্যন্ত কত চিত্রশিল্পী, কত কথাশিল্পী, কত সুরশিল্পী, কত কবির পর কবি কেবলই জন্মাচ্ছে এই বাংলা দেশেই। এ যে বিশেষ ক'রে শিল্পীদেরই দেশ। এখানকার শিল্পীরা বারে বারে ঠাকুর গড়বে, আর শিল্পরসিক ভক্তেরা বছরে বছরে তার পুজো করবে। এই হলো এখানকার নিজস্ব একটা ধারা। এ যে আমাদের বাংলা দেশেরই বিশেষত্ব, বাঙালী চ্যাটার্জি সাহেব সেটা এড়িয়ে যাবেন কেমন ক'রে ?”

কথাগুলো শুনে মেয়েরা এবার অপ্রস্তুত অথচ মুগ্ধ হ'য়ে চুপ ক'রে রইল। অন্ধ সংস্কারের অপক্ষে এমন ধরণের একটা জোরালো যুক্তি শুনবে, ওদেরই সমসাময়িক আর ওদেরই দলের একজন তরুণ যুবকের কাছে, এতটা কেউ প্রত্যাশা করেনি। এমন কি চাটার্জি সাহেব নিজে পর্যন্ত এই অপ্রত্যাশিত কথাগুলো শুনে অপ্রস্তুতের মতো একটু হেসে—"ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো" ব'লে তারপরে যেন আর কথা খুঁজে না পেয়ে নিজের চায়ের পেয়ালার দিকে খুব একাগ্রচিত্তে মনঃসংযোগ করলেন। ঘরের আবহাওয়াটা পর্যন্ত যেন অপ্রস্তুত হ'য়ে স্তব্ধ হ'য়ে উঠলো।

রূপেন তখন তাড়াতাড়ি খানিকটা মানিয়ে নেবার জন্যে বললে—"তুমি কিন্তু ভাই প্রথম দিনে যে এখানে এসেই কলেজের ডিবেটিং ক্লাবের মতো কোমরবাঁধা তর্ক শুরু ক'রে দেবে, এটা আমি ভাবতে পারিনি। ঐটেই তোমার যেন একটা অভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে দেখছি। কিন্তু এরা তো আর অতোটা বুঝবে না, হয়তো মনে করবে তুমি বুঝি খাঁটি মনের কথাই বলছো। মেয়েদের সঙ্গে এমন ক'রে কেউ তর্ক করে না, বরঞ্চ মেয়েরা একটা ভুল কথা বললেও সবাই তাতে খানিকটা সায় দিয়েই যায়।"

"তুমি ঠিক বলেছো। কথার মধ্যে তর্কের সুর লাগানো আমার অভ্যায় হ'য়ে গেছে দেখছি। কিন্তু আমার আজকের ব্যবহারে আমি নিজেও আশ্চর্য হ'য়ে গেছি। সত্যি বলছি ভাই, অযথা এতগুলো তর্কের কথা যে ওঁদের সামনে বলে ফেলবো এ আমি ধারণাই করিনি। সামান্য একটু বলতে গিয়ে বলাটা কেমন আপনা থেকেই বেড়ে গেল। কে জানে, হয়তো এঁদের নিজেদেরই মধ্যে এমন কিছু গুণ আছে, যে মুখের দিকে চাইলেই কেবল ঝগড়া করবার ইচ্ছে হয়।"

ধীরা একটু হেসে বললে—"সেটা তো আমাদের তরফে খুব প্রশংসার কথা হলো না।"

"খুবই প্রশংসার কথা হলো। একটু আলাপেই নিতান্ত আপন লোকের মতো না হ'য়ে গেলে কি কেউ প্রথম থেকে কারো সঙ্গে এমন ক'রে ঝগড়া করে? যারা পর হ'য়ে থাকতে চায়, তাদের সঙ্গে লোকে শুধু মৌখিক ভদ্রতাই করে। আপনারা আমাকে নিতান্তই আপন ক'রে নিতে চেয়েছিলেন দেখলুম, সেইজন্যেই তো মন খুলে এতটা ঝগড়া করতে পারলুম।"

"তাহ'লে আপনি খুবই ঝগড়া করুন, আমাদের কিছুই আপত্তি নেই। আজ থেকে আপনার সঙ্গে আমাদের তাহ'লে ঝগড়ার সম্পর্কই পাতানো হোক। মনে মনে ঝগড়া পেলেই বরাবর এখানে চলে আসবেন, খানিকটা পেট ভরে ঝগড়া ক'রে নিয়ে আবার চলে যাবেন।"

"ঝগড়ার সম্পর্ক যে শিষ্টতার সম্পর্কের চেয়ে অনেক মিষ্টি, তা নিশ্চয় স্বীকার করছেন না? দেখবেন, ঝগড়াতেই আরো আন্তরিকতা বাড়বে।"

নীরা এতক্ষণ পর্যন্ত চুপ ক'রেই ছিল। এবার সে হঠাৎ বলে উঠলো—"আচ্ছা, চৌধুরী তো শুনেছি বামুনও হয়, কায়েতও হয়, আবার মুসলমানও হ'তে পারে। আপনি হিন্দু না মুসলমান?"

এই অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন শুনে বাকি সবাই হো হো ক'রে হেসে উঠলো। রঞ্জন বললে—"আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। চৌধুরী উপাধি অনেক রকম জাতেরই হ'তে পারে। ঐ একটা উপাধি আছে যেটা বামুনের ঘরেও চলে, আবার মুসলমানের ঘরেও চলে। কিন্তু এইবার আমি আপনার সঙ্গেই একটু ঝগড়া করি। এ প্রশ্নটা আপনি

কল্পনাই বা কেন? মনে করুন আমি যদি মুসলমানই হতুম, তাহ'লে আমার সম্বন্ধে আপনার ধারণাটা কি অমনি বদলে যেতো? কেউ একজন হিন্দু না মুসলমান, এইটেই কি তার পক্ষে শেষ কথা? আমাদের দেশের মানুষগুলোর এর চেয়ে আর কি অন্য কোনো রকম ভালো পরিচয় নেই?"

নীরা এবার লজ্জায় মুখ নিচু ক'রে ফেললে, মুখ তুলে এ কথার কোনো জবাবই দিলেনা। ওকে চুপ করতে দেখে মীরা তখন হাসতে হাসতে বললে—"ও ছেলেমানুষের কথাটা আপনি অতো ক'রে ধরবেন না। কিন্তু আপনি হিন্দু না হ'য়ে মুসলমান হ'লে আমার নিজের তাতে অন্তত যথেষ্টই আপত্তি ছিল।"

রঞ্জন বললে—"তাহ'লে দেখছি আপনার সঙ্গেই আমার ঝগড়ার সম্পর্কটা পাকাপাকি হ'য়ে দাঁড়িয়ে গেল। বেশ তো, ঝগড়াই তবে খানিকটা করা যাক। কিন্তু আপনি হেরে যাবেন। আপনার কি আপত্তি থাকতে পারে আমার মুসলমান পরিচয়ের সম্বন্ধে সে কথা আমার বুঝিয়ে দিন তো! আমি তো সত্যিই একটা কোনো জাত নই, আমি হলুম একটা মানুষ। এই খোদ মানুষটাতে যদি আপনার আপত্তি না থাকে, তার যে কোনো জাতই হোক না, তাই নিয়ে এত আপত্তি কিসের?"

"তা কিছু নয়। তবে যাকে আমরা ঘরের লোকের মতো এতটা আপন ক'রে নিচ্ছি, হঠাৎ যদি শুনি যে সে মুসলমান, তাহ'লে তখনই মনটা একটু কেমন ছোটো হ'য়ে যায় নাকি? আমি সেই কথাই বলছিলাম। অবশ্য আপনার বেলাতে এটা একটা মিথ্যে ঠাট্টার কথা, তেমন ঝগড়া করার মতো কিছুই নয়।"

"কিন্তু একজন লোক হিন্দু কি মুসলমান, এও কি আজকালকার

চোখফোটা যুগে আলাদা ক'রে দেখবার বিষয় নাকি ? ঐ রকমের মনোভাবটাতেই যে আমি আপত্তি করছি। ও রকমের একটা স্বাতন্ত্র্যবোধ আপনার মনে জাগে কেন ? মুসলমানকে নিজেদের চেয়ে অনেকখানি পৃথক বলে ভাবেন, তাই তো ? কিন্তু বাস্তবিক সে আলাদা কোনো জানোয়ার তো নয়, সেও বাংলা দেশের বাঙালী। আপনার কোনো বন্ধু যদি মুসলমানই হয় তাতেই বা ক্ষতি কি ?"

রঞ্জন হয়তো আরো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু রূপেন এবার বাধা দিয়ে চেঁচিয়ে বলে উঠলো—"তুমি এখন থামবে কিনা তাই বলো তো ? কেবল যত উড়ো তর্ক !"

"না না, এ তর্ক নয়। আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম যে ঠাকুর-পূজোকে ঠাট্টা করাও যেমন আমাদের চলবে না, মুসলমানের নামে মুখ বাঁকালেও তেমনি আমাদের চলবে না। এ দুটোই ভয়ানক অন্যায়। এই সব ক'রেই আমরা নিজেদের আসল মনুষ্যত্বটুকু ঘুচিয়ে দিতে বসেছি। সব জিনিসকেই যদি আমরা এমনি ক'রে ছেঁটে ফেলে দিই তাহ'লে আর আমাদের রইল কি ?" বলতে বলতে ওর চোখ দুটো লাল হ'য়ে উঠলো, মনে হলো হঠাৎ যেন একটু বেশি মাত্রায় উত্তেজিত।

নীরা এতক্ষণ চুপ ক'রে শুনছিল। সে হঠাৎ ... বলে উঠলো—"তাই ব'লে অতো রাগ করবেন না রঞ্জনবাবু। আমরা হয়তো আপনার মতো ভালো তর্ক করতে জানি না। তাই আপনি আমাদের সব কথাতেই হারিয়ে দিচ্ছেন, যেমন ব্যাডমিন্টনও আপনি ভালো খেলতে জানেন বলে আমাদের সবগুলো গেমেই হারিয়ে দিলেন। কিন্তু তাই ব'লে তর্ক করতে গিয়ে আপনি অমন উত্তেজিত হ'য়ে উঠবেন কেন ? আপনি তো আর

নিজে সত্যিই মুসলমান নন যে ঐ কথাতে আপনার মনে এতটা লেগে গেল।”

“হাঁ, এখন আমি তাই। ধরুন যে মুসলমান হ'য়ে মুসলমানের পক্ষ নিয়েই আমি বলছি। মানুষের সঙ্গে মানুষের যেখানে চমৎকার একটা বন্ধুত্ব গড়ে উঠতে যাচ্ছে, সেখানে অপর জাত হ'লেও তা আটকায় না। আপনাদের হয়তো কোনো মুসলমান বন্ধু নেই। কিন্তু এমনও একটা দিন আসতে পারে যখন নিজের অন্তরঙ্গ কোনো মুসলমান বন্ধুকে কেউ নোংরা কিংবা হীন মনে করলে আপনারও আমারই মতো এমনি গায়ে লাগবে। আমি বিদ্রোহ ভালোবাসি, কিন্তু বিদ্বেষ নয়।”

চ্যাটার্জি সাহেব এবার উঠে এসে রঞ্জনের পিঠ চাপড়ে বললেন—“বিদ্রোহ ভালো কিন্তু বিদ্বেষ নয়, এটাও ঠিক কথাই বলেছো রঞ্জন। বিদ্বেষ কারো মধ্যেই থাকা উচিত নয়, আর বিশেষ ক'রে এই ধরণের জাতিবিদ্বেষ। আমাদের দেশে যত বড়ো বড়ো মহাপুরুষ জন্মেছে তারাও এমনি ধরণের কথাই বলে। বিদেশী বিধর্মীকেও তারা ডেকে ডেকে কোল দেয়, সেধে সেধে আপন মাথার মণি করে, পরকে একটু আপন ক'রে নেবার জন্তে আকুলতার আর অন্ত থাকে না। এই দেশটাই যে এমনি। তুমি ঠিক কথাই বলেছো রঞ্জন, আমরা যদি মাথা ঠুকে ঠাকুর প্রণাম, আর জাতিনির্বিশেষে অতিথিকে কোল দেবার এই বৈষ্ণব মেন্‌ট্যালিটি ছেড়ে দিয়ে বিদেশী আমদানি নতুন ধরণের এই জাতিবিদ্বেষ কাল্‌চার করতে বসি, তাহ'লে আর আমাদের নিজস্ব চরিত্রটুকু রইল কোথায়?”

রূপেন বললে—“এই যে, দেখ কাণ্ড। মামাও তোমার সঙ্গে সায় দিতে শুরু করলেন! দেখলে তো রঞ্জন, আমি তোমাকে

এর আগেই সেই কথা বলেছিলাম। বলিনি তখন তোমাদের যে, আমার সঙ্গে আলাপটা একবার জমলে হয়, দুজনেই তখন থাকা ভুলে মিলে যাবে ?"

রঞ্জন একটু হেসে বললে—"আমাদের 'একা' প্রায় একই রকমের কিনা তাই।"

স্বপন বললে—"ও কথাটার মানে আবার কি হলো ?"

মীরা বললে—"ও কথার মানে যাই হোক স্বপন দা, বাবা এবার থেকে দলে ভারী হ'য়ে উঠলেন। এখন ওঁরা দুজনে হলো এক দিকে, আর আমরা দুই বোনে হলুম এক দিকে। আমাদের বিদ্রোহের আড্ডাটা এবার থেকে জমবে ভালো। যখন কিছুতেই বিদ্রোহ মিটবে না, তখন তোমাকে আমরা সালিশ মানবো। তুমি কিন্তু কোনো দিক থেকে ঘুষ খেলে চলবেনা, তা বলে দিচ্ছি।"

সবাই আবার খুব হাসতে লাগলো। যেটুকু আড়ষ্টতা এসে পড়েছিল সেটুকু সহজেই মিটে গেল।

পাঁচ

সেবার পুজোর ছুটির মধ্যেই রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেল। বাগবাজার অঞ্চলের মুসলমান পাড়ার সবাই যথারীতি রোজা রাখতে শুরু ক'রে দিলে। বস্তির লোকেরা রোজ ভোরে চারটের মধ্যেই ঘুম থেকে উঠে পড়ে। সারা বস্তিটার মধ্যে তখন যেন রীতিমত মেলা বসে যায়। ঘরে ঘরে হরেক রকম আলো জ্বলে ওঠে। বাতির আলো, লণ্ঠনের আলো, চিমনির আলো, মশালের আলো। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন সীমাহীন অন্ধকারের ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু অসংখ্য আলোর ফুল থাঁকে থাঁকে ফুটে উঠলো। ফেরিওয়ালারা কেরোসিন তেলের কুপির দুপাশে দুটো লম্বা লম্বা চোঙা বের করা ধুমো জ্বালানো চেরাগ জ্বেলে নানা রকমের খাবার জিনিস বেচতে আসে। মুড়ি মিঠাই, দৈ রাবড়ি, কাটা কলমূল, ঘুগনি দানা, ছোলা মটর ভাজা, আরো কত কি। কেউ কেউ চা বিক্রি করে, কেউ কেউ অ্যালুমিনিয়মের হাঁড়িতে ভরে সরবৎ নিয়ে আসে। সারে সারে দোকান পসার বসে যায়। চারিদিকে হৈ হৈ আর হট্টগোল লেগে যায়। মেয়ে পুরুষে সবাই পেট ভরে খেয়ে নেবার জন্যে তখন ব্যস্ত। ঐ সময় থেকেই সারা দিনটা তাদের কাটাতে হবে। সাঁঝের বাতি না জ্বললে আর তারা জলস্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না।

ছোটো বড়ো প্রত্যেক মুসলমানই এই রোজা নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে। নিতান্ত অসুস্থ কিংবা অক্ষম না হ'লে কেউ এই রোজার নিয়ম ভাঙবার কথা ভাবতেই পারেনা।

হস্টেল থেকে বাড়ি ফিরে এসে রঞ্জন আবার মনমরা হয়ে গেছে।

পুজোর ছুটিতে বাড়িতে থেকে তাকেও এই রোজা পালন করতে হলো। তবে সে এবার এটা ইচ্ছে ক'রেই করলে। অন্যান্য বারের মতো এবারেও রাবিয়া বিবি বলেছিলেন যে ওর রোজা রেখে কাজ নেই। কলেজের হস্টেলের জো...সেই খাওয়াদাওয়া, কি যে ছাইপাঁশ খেতে দেয় তার ঠিক নেই। তাতে কি আর তবিয়ৎ ঠিক থাকে? ঘরে এসে যে ক'টা দিন থাকবে তাও যদি রোজার উপোস ক'রে কাটায়, তাহ'লে শরীর বিগড়ে যাবে। এই ক'টা দিন ও বরং নিয়ম ক'রে খাওয়াদাওয়া করুক। শোভান মিঞাও এই নিয়ে অনেক অনুরোধ করেছিল। বলেছিল যে মৌলবীর কাছে সে খুব ভালো ক'রেই জেনে এসেছে, পড়াশুনোর সময় যার খাটতে খাটতে শরীর বিগড়ে যায়, তার রোজার নিয়ম না মানলে কোনো দোষ হয়না। কিন্তু ও বললে, তা হোক। শরীর ওর খুব সুস্থই আছে, রোজা রাখতে ও অক্লেশেই পারবে। সেজন্যে কারো ব্যস্ত হবার দরকার নেই।

রমজান যথা নিয়মে রোজা রাখতে শুরু করলে। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ বখত যথারীতি নমাজ পড়তে লাগলো। খাওয়া এবং আড্ডা ইত্যাদি পাট চুকিয়ে দিয়ে সে ঘরে বসে লেখাপড়ার কাজ শুরু ক'রে দিলে। সারাটা দিন বসে বসে নিষ্ঠার সঙ্গে কোরান শরিফের তর্জমা করতো। অনেক রকমের অনেক তর্জমা করা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু ও নিজের বাংলায় নিজের মতন ক'রে একটা আলাদা একটা তর্জমা করতে চায়।

কিন্তু খানিকটা পর্যন্ত তর্জমা ক'রেই ও আর এ কাজে অগ্রসর হ'তে পারলেনা। কিছুদিন আড়ম্বর ক'রে কাগজ কলম নিয়ে সারাক্ষণ বসে বসেই কাটালে, তার পর নিজের ওপর বিরক্ত হ'য়ে অমন ব্যর্থ প্রয়াস করা ছেড়েই দিলে। লাইব্রেরি থেকে ফিলজফি আর সাইকো-

[illegible] মোটা মোটা বই আর একখানা গীতাও এনেছিল, তাই নিয়ে পড়তে চেষ্টা করলে। কিন্তু সে পড়াও বেশিদূর অগ্রসর হলোনা।

আসল কথা, ওর মনের মধ্যে আবার সেই ছেলেবেলাকার মতো একটা দারুণ ঝড় উঠেছে। এবারকার [illegible] রকমের। বাতাস বইছে এলোমেলো। কোনো [illegible] করতে পারছে না। সেবারে ছিল কিছু [illegible] সংকল্প, এবার [illegible] তেমন নির্দিষ্ট কোনো সংকল্পই খুঁজে [illegible] ও আজকাল [illegible] বিচার ক'রে অনেক কথাই ভাবতে [illegible]ছে। কিন্তু তবু ও [illegible] যুক্তি দিয়ে মুখে যা বলে আর [illegible] ভাবে, সেইগুলোই [illegible] ওর আপন অন্তরের সত্যিকারের সত্তা?—[illegible] ভেতর থেকে যে একটা মহাশক্তিশালী বুদ্ধিবিবে[illegible] নিজের জোর দাবী জানিয়ে অকুতোভয়ে বেরিয়ে আসে, আর ওর সমস্ত ধারালো যুক্তিকে মিথ্যার ধিক্কারে ম্লান ক'রে দেয়, তাই আসলে সত্যিকারের সত্তা? ওর নিজেরই ভেতরকার দুটো বিরুদ্ধভাবের মধ্যে কোনটা সাচ্চা, আর কোনটা মেকি? ওর মধ্যে কোন প্রকৃতির মানুষটা আসল? একজন শিক্ষিত সংযত প্রগতিশীল বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন রঞ্জন চৌধুরী, আর একজন স্বার্থসুখপ্রণোদিত নিছক জৈবপ্রেরণায় সত্যমিথ্যা আর হিতাহিত জ্ঞানশূন্য রমজান চৌধুরী,—এই দুটো মানুষ এবার সামনাসামনি হ'য়ে দাঁড়িয়েছে ওর মনের যুদ্ধ করবার আঙিনার মধ্যে। কোন মানুষটির মধ্যে রয়েছে ওর প্রকৃত নিজস্ব সত্তা? কার হবে জয়? কার নির্দেশকে মেনে অতঃপর ও চলবে?

চোখের সামনে অনবরতই ভাসছে চ্যাটার্জি সাহেবের আলিপুর পার্কের বাগানবাড়ি। সেই সিঁড়ির ধাপগুলির ওপরে সিমেন্ট বাঁধানো লম্বা বারান্দা, সেই সমস্ত বেতের বোনা রকমারি চেয়ার টেবিল

মজলিস, আর তার মধ্যে বসে রয়েছে দুটি চাঁদমুখী তরুণী, দীপা আর নীরা। দীপা হলো দূর আকাশের চিত্রপটে দীপ্ত স্থির একটিমাত্র উজ্জ্বল তারা,—যেমনি উজ্জ্বল, মুখমণ্ডল ঘিরে যেমনি স্নিগ্ধ একটি জ্যোতির ছটা সারাক্ষণ বিচ্ছুরণ করছে। আর নীরা? সে যেন হলো নীহারিকা,—অচেনা নক্ষত্রলোকের মতো অস্পষ্ট এক প্রহেলিকা, ধরা ছোঁয়ার বাইরে। দীপার পাশে ও যেন অনেকটা নিষ্প্রভ হ'য়ে যবনিকার অন্তরালে সরে সরে যায়। ওর দিকে চোখ পড়ে অনেক বিলম্বে, আর দীপার দিকে চোখ পড়ে অকস্মাৎ প্রথমেই। দীপার চোখে মৃদু একটি আহ্বানের ইঙ্গিত, দেখলেই তার কাছে এগিয়ে যাবার ব্যাকুল আগ্রহ জাগে।

তর্কচ্ছলে ও সেদিন বলেছিল যে আমি বিদ্রোহ ভালোবাসি কিন্তু বিদ্বেষ নয়। কথাটা মোটেই সত্য বলেনি। শিক্ষিতা হিন্দু মেয়েদের ও নিজেই চিরকাল হয়তো একটু বিদ্বেষের চোখে দেখে। ওদের দেখলেই যেন মনে হয় কেমন একটু গর্বিত। প্রথম দৃষ্টিতে ওদের দুজনকে ও তেমনি বিদ্বেষের চোখেই দেখতে শুরু করেছিল। কথাবার্তায় মনে হয়েছিল ওরা বুঝি ভেতরে লুকিয়ে রেখেছে দ্বেষ, বাইরে দেখাচ্ছে একটা কৃত্রিম শ্রদ্ধা। ওর মন তাতে গোড়া থেকেই বিমুখ হয়েছিল। সেই মনোভাবকে চাপা দিয়ে ও কৃত্রিম বিদ্রোহ দেখাতে গিয়েছিল। মনে করেছিল তারা যে কথাই বলুক, ও বিপরীত যুক্তি দেখিয়ে তর্কে তাদের চরম অবমাননা করবে। এই ছিল ওর তখনকার গোপন মনের উদ্দেশ্য।

কিন্তু ফল হলো এর বিপরীত। ওর সেই গোপন বিদ্বেষের সংঘাতে তারা দুটিতে আরো যেন কোন উদ্ঘাটিত অনন্যপূর্ব রূপচ্ছটায় ঝলমল ক'রে উঠলো। কোথায় লুকিয়েছিল তাদের অপরিচয়ের আড়ালে

ঢাকাঢাকা মোহনীয় রূপ, তাদের সেই চিত্তকর্ষণের উপযোগী নতুন নব অনুভূত চুমকের ভোগ। তাচ্ছিল্য করতে গিয়ে তার আকিঞ্চন এসে গেল, পরাজয় করতে গিয়েও নিজেই পরাজিত হ'য়ে কখন থেকে কেবলই ওদের দিকে আকৃষ্ট হতে লাগলো। যতই দিন যেতে লাগলো ততই ওর কৃত্রিম বিদ্রোহের বদলে অকৃত্রিম আগ্রহ প্রকাশ পেতে লাগলো, আর ততই ঐ হাস্যমুখী তরুণী দুটির দল ওর কাছে পরম বাঞ্ছনীয় হ'য়ে উঠলো।

না না, তাই ব'লে দুজনেই নয়। দুজনের মধ্যে বিশেষ ক'রে একজন মাত্রই ওর কাম্য। সে ঐ নীরা। কাছে গিয়ে দাঁড়ালেই ঐ মেয়েটির মুখের ওপর চলমান চিত্রলেখার মতো অনির্বচনীয় মাধুর্যের ঝিকিমিকি দিয়ে এক লুকোচুরি খেলা লেগে যায়। ঠোঁটের কোণে বঙ্কিম সূক্ষ্ম ভাঁজ থেকে, নাকের কাঁপে ওঠা পুটভেদের মৃদু স্পন্দন থেকে, চোখের পাতার সলজ্জ মৃদু-পলক পড়া থেকে কেমন ক'রে সেই অদ্ভুত মাধুর্য ক্ষণে ক্ষণে হঠাৎ ঝিকিঝিকে ঝলমলিয়ে ওঠে। ওকে তখন পাগল ক'রে দেয়, ওর সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকল ক'রে দেয়। ওর তখন শুধু একটিমাত্রই ইচ্ছা হয়, অত্যন্ত রূঢ়ভাবে ঐ দুরধিগম্য বৈদ্যুতিক লাবণ্যকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে অধিকার করতে। অবোধ শিশু যেমন টুকটুকে গোলাপ ফুল দেখে হাতের মুঠোয় আঁকড়ে ধরে তখনই তাকে পাপড়ি সমেত মুখের মধ্যে ভরে ফেলতে ইচ্ছা হয়, অনেকটা যেন তেমনি। তখন কি আর ওর কোনো বাধাবিঘ্নের কথা কিছু মনে থাকে?

কিন্তু কত কুৎসিত এই সব অতি গুহ্য মনের কামনা। কত গোপনীয়। কত পঙ্কিল। নিজের কাছেও কি এই সব কথা নিঃসংকোচে কখনো ব্যক্ত করা যায়?

ছি ছি, ওর মনটা এত নোংরা? কলেজের ছেলেরা যাকে সমীহ ক'রে বলে আমাদের রঞ্জন চৌধুরী, তার মনের গভীরতম অন্তঃপুর কি এমনতরো ক্লেদপূর্ণ কদাকার? চিত্রাচিত্রের প্রজাপতি হলো মন। ওর অন্তঃপুরবাসী অপ্রতিরোধী অতন্দ্র কল্পনা সেই অন্দরের মেয়েটিকে নিয়ে মনের পটে যে সমস্ত অসম্ভব রকমের কামনাবিলাসী ছবি আঁকে, সে সমস্ত ছবি দেখে যে ও নিজে নিজেই অস্থির হ'য়ে ওঠে। ও যদি সোজা আগেকার দিনের লোকদের মতো শুধুই রমজান চৌধুরী হতো! কিন্তু তা যে এখন ও একেবারেই নয়!

রাত্রে ওর ভালো ঘুম হয় না। উৎকট উৎকট স্বপ্ন দেখে গলদ্ঘর্ম হ'য়ে জেগে ধড়মড় ক'রে বিছানার ওপর উঠে বসে, অনেকক্ষণ পর্যন্ত বুকের মধ্যে প্রবল বেগে হাতুড়ি পিটতে থাকে। তারপর আর কিছুতে শুতে পারে না, বাইরে বেরিয়ে চলে যায়। বিরাট কালো ধোঁয়ার মতো সীমাশূন্য সান্ত্বনাশূন্য বুকচাপা অন্ধকার আকাশের দিকে স্তব্ধ হ'য়ে চেয়ে থাকে, কোনোখানে একটাও নক্ষত্র জ্বলছে কিনা চারিদিকে তাই খুঁজে খুঁজে দেখে।

বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার উপায় নেই। হস্টেল এখন বন্ধ। ভয়ানক ইচ্ছে হ'তে থাকলেও মীরাদের ওখানে এখন যাওয়া অসম্ভব, কারণ তারাও জানে যে হস্টেল বন্ধ। তারা জানে রঞ্জন এখন দেশে চলে গেছে। পুরী দার্জিলিং যাওয়া যায় না। ছুটির সময় বাড়ি ছেড়ে কোথাও গেলেই বড়ো মা চোখ ফুলিয়ে কাঁদবে। ছোটো মা কাঁদবে না বটে, কিন্তু মুখ ফুলিয়ে ভার ক'রে থাকবে। ছোটো মা'র মুখ ফোলানো ও মোটে সহ্য করতে পারে না। এমন নিষ্পেষণের জীবনও কিন্তু আর সহ্য হয় না।

গভীর রাত্রে অদূরবর্তী বস্তিপাড়ায় কে একজন মিঠে সুরে

চমৎকার গজল গায়। সন্ধান নিয়ে জানলে সে, ছোকরা ইসমাইল পকেট কাটতে গিয়ে ধরা পড়ে কয়েক মাস জেল খেটে সম্প্রতি আবার বাড়ি ফিরে এসেছে। কি অপূর্ব সংযোগ! পকেটও কাটে ছুরিও মারে, আবার গজলও গায়,—সেই একই মানুষ। প্রথমটা বিতৃষ্ণা এলো। তারপর দুচার দিন তার গজল শুনে শুনে এমন ভালো লাগলো যে একদিন সকালে উঠেই ও ইসমাইলকে ডেকে পাঠালে। খাতা পেন্সিল নিয়ে বসে গেল, বললে ওর কাছে কয়েকটা গজল গান গাইতে শিখবে। প্রত্যেক গানে দশ টাকা ক'রে বকশিশ। ইসমাইল হেসে জিভ কেটে সেলাম দিয়ে বললে,—গজল হলো খাস বেহেস্তের হুরীদের খোয়াবী মজলিশের গান, সে গান শিখিয়ে পয়সা নিয়েছে শুনলে ওর ওস্তাদ ওকে মেরে ফেলবে। ও ভালো বিড়ি পাকাতে জানে, ওর নিকা করা বিবিও এ কাজ জানে। বস্তিতে ঢোকবার মুখে যদি ওকে একটা দোকান করতে হুকুম দেওয়া হয়, তাহ'লে দুজনে মিলে বিড়ি পাকিয়ে দুটো খেয়ে বাঁচবে। তাইতেই হুকুম দিয়ে ও ইসমাইলের কাছে গজল শিখতে লাগলো। কিন্তু দুটোর বেশি গান ওর আর শেখাই হলো না। গজলের সুরগুলো যেন আরো বেশি মারাত্মক। গাইতে গেলেই ভেতরে সেই উন্মাদটাকে আরো বেশি উন্মাদ ক'রে তোলে। এ গানে যেন অন্তরের লালসাকে নিংড়ে নির্যাস বের করা চড়া আতরের মতো একটা সুর, মনের সকল অঙ্গের সঙ্গে জড়িয়ে যায় সুরটা সারাদিন সেখানে লেগেই থাকে।

শরৎকালের অপরাহ্ণ। দুপুরের রোদটা ভালো ক'রে পড়তে না পড়তেই ও বেড়াতে বেরিয়ে যায়। বাগমারির খানিক দূরেই কাঁকুড়গাছির পুল। শেয়ালদার থেকে পূর্ববঙ্গের রেল লাইন এসে

এই পুলের উপর দিয়ে ঘুঘুডাঙার দিকে চলে গেছে। উঁচু বাঁধের গা বেয়ে সেই পুলের উপর উঠে, রেল লাইনের ধার দিয়ে দিয়ে ও সোজা ঘুঘুডাঙার দিকে চলে। বাঁধের গায়ে ঘাসের বনে গরু চরে, ছাগল চরে, সাদা সাদা বকগুলো পোকা খুঁজে বেড়ায়, ঘুঘু পাখিরা কয়েকবার টানা সুরে ডাকতে ডাকতে মানুষ আসছে দেখলেই ফড়ফড় ক'রে উড়ে চলে যায়। নরম ডাঁটার ওপর নানা আকারের শিরা বের করা কচুপাতাগুলো হঠাৎ কাঁপতে কাঁপতে বাতাসে ঘন ঘন দোল খেতে শুরু করে। মাঝে মাঝে রেলগাড়ি আসার শব্দ হয়, ও তখন একপাশে একটু নেমে দাঁড়ায়। ঘুঘুডাঙা ষ্টেশনের কাছাকাছি গিয়ে পড়লেই ও তাড়াতাড়ি মুখ ঘুরিয়ে আবার বাড়ির দিকে ফেরে। লোকালয়ের ত্রিসীমানায় যেতে বাসনা নেই, কোনো লোক যে ওকে দেখতে পেলে এটুকু পর্যন্ত পছন্দ করে না। যেন কেউ তখন ওকে দেখতে পেলে ওর ভেতরটাও সে দেখে ফেলবে। ও তখন নিজের মনের সঙ্গে একদম খোলাখুলি কথা বলছে। মনের মধ্যে চলেছে তখন দ্বন্দ্ব, রঞ্জনের সঙ্গে রমজানের।

রঞ্জনের স্বপক্ষে অনেক রকমের যুক্তি আছে। কিন্তু রমজানের শুধু একটিমাত্রই যুক্তি। মনে প্রাণে হিন্দু হ'য়ে গেলেও কি তবু ওর হিন্দু হওয়া সাব্যস্ত নয়? জগতের কাছে না হ'লেও তো অন্তত নিজের মনের কাছে হয়েছে। আর তা যদি হয়, আর মীরাকে যদি ওর সত্যি সত্যি ভালোই লাগে, তবে তাতে বিশেষ দোষ কি? মীরাকে প্রাণ দিয়ে পেতে চাওয়া ওর কি এমন অপরাধ? ও তো মুসলমান হ'য়ে তাকে চাইছে না, হিন্দু হ'য়েই তাকে চাইছে। কিন্তু বন্দুকের হাতুড়িতে ঘায়ে কখনো ভেতরকার গণ্ডগোল মেটে না! শুধু একটা অনাবশ্যক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। সেই চাঞ্চল্যের ফল

প্রকাশ পেতে লাগলো ওর মুখের ভাবে, ওর ব্যবহারে। ও অন্যমনস্ক হ'য়ে থাকে, সহজে কারো কথার জবাব দেয় না। খাবার সময় মুখ গোঁজ ক'রে তাড়াতাড়ি দু' ঢোক খেয়ে নেয়। বেশ বোঝা যায়, কি যেন একটা হয়েছে।

একদিন এই নিয়ে সে মাসিমা বিবির কাছে বিষম জবাবদিহিতে পড়ে গেল।

তিনি বললেন—"হাঁ রে, তোর আজকাল হলো কি তাই শুনি? খাওয়া-দাওয়া সব একেবারে ঘুচে যেতে বসলো যে! কারো সঙ্গে হেসে মোটে কথাই বলিস না, সব সময়েই যেন কি ভাবছিস। এত কি ভাবিস বল তো?"

"কৈ কিছুই তো হয় নি! এমনিই চুপচাপ থাকি। ভাবনার আর কি আছে?"

"ভাবনার যদি কিছু নেই, তবে তুই বসে বসে অতো কপাল কুঁচকে মুখ ঝুলিয়ে থাকিস কেন? আমার কি চোখ নেই মনে করিস?"

"ও! তা পড়াশুনোর কথা, পরীক্ষার কথা, এ সব এখন আমাকে একটু ভাবতে হয় বৈকি।"

"তবে কাজ নেই বাবা আর পড়াশুনোতে, তুই ও সব এবার ছেড়ে দে। দরকার কি আর অতো মেহনত করবার? তোকে তো আর চাকরি ক'রে খেটে খেতে হবে না, তোর বাপজান যা কিছু রেখে গেছে তাই তোর পক্ষে যথেষ্ট। খানিকটা লেখাপড়া তো করাই হলো। এবার আমি যা বলি তাই শোন। ওসব বাজে খেয়াল ছেড়ে দিয়ে এবার একটা সাদি ক'রে ফেল। আমার তো এই শরীরের হালচাল, কখন আছি কখন নেই। ছেলের বৌএর মুখ দেখে শেষ বয়সে দুনিয়াদারীর পাটটা মিটিয়ে

[illegible] জোর আর অমন ক'রে মুখ শুকিয়ে বেড়াবার কোনো দরকার নেই বাপু, বৌকে ঘরে এনে স্বচ্ছন্দে এবার একটু হেসে খেলে বেড়া। বলিস তো আজই আমি ভালো মেয়ের খোঁজ করি।"

"তুমি যদি অমন ক'রে আমার লেখাপড়াতে বাধা দাও তাহ'লে এখান থেকে পালিয়ে আমি একদিন জাহাজে চড়ে বিলেত চলে যাবো। তোমার ভাইদের মতো খাজা হ'য়ে পেটমোটা জমিদার সেজে বেড়াতে আমি কিছুতেই পারবো না। কখন ফাঁকি দিয়ে পালাবো, তোমাদের জানতেও দেবো না।"

"না না, সে কথা তো আমি বলিনি। কেন মিছামিছি আমার ভাইদের এর মধ্যে টেনে এনে অমন অপমান করছিস? আচ্ছা বাবা, তোর যা মন যায় তাই কর, আমি আর এবার থেকে কোনো কথাটি কইবো না। লেখাপড়াই করিস আর যাই করিস, আমার এই শেষ বয়সে যেন তুই চোখের আড়াল হস্‌নে। তাহ'লে আর আমি বাঁচবো না।"

"তবে আর ঐ নিয়ে আমায় বিরক্ত কোরো না। সাদি করবার সময় হ'লে আমি আপনিই বলবো।"

ভয় দেখিয়ে ও রাবিয়া বিবির মুখ বন্ধ করলে। তার পরে এলো ফতিমা বিবির পালা। তিনিও একদিন ওকে ধরে বসলেন।

"হাঁ রে, এসব কি কথা শুনছি? তুই নাকি জঙ্গলে জঙ্গলে রেলের লাইনে ঘুরে বেড়াস?"

"কে তোমাকে এমন আজগুবি কথা বললে শুনি?"

"কেন ঐ ও পাড়ার ইসমাইল বলছিল। সে বললে তুই লেখাপড়া ছেড়ে পাগল সেজে বেড়াচ্ছিস, মাথা নিচু ক'রে জঙ্গলের ভেতর দিয়ে লাইনের ওপর দিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছিস। সে নিজের চোখে

পেয়েছে। এ আবার কি কথা? কোনদিন রেল গাড়ির তলায় কাটা পড়বি, তখন আমাদের গতি কি হবে?"

"পড়াশুনো ক'রে ক্লান্ত হ'য়ে ফাঁকায় একটু বেড়াতে যাই। তাতেও সকলের চোখ টাটাবে?"

"পড়াশুনো তো কতই করিস্। বইএর গোড়ার পাতাটাই খোলা পড়ে থাকে, তা আর সারা দিনের মধ্যে ওল্টানো হয়না। আগেও তো দেখেছি, এক এক দিনের মধ্যে কত কি পড়ে ফেলতিস। এখন আর সারা দিনে কিছু পড়াও হয়না, লেখাও হয়না। ভালো ক'রে কিছু খাস্ না, ভালো ক'রে হাসিস না, আমার সঙ্গেও ভালো ক'রে দুটো কথা বলিস না। এবারকার ছুটিতেই এটা দেখছি। হঠাৎ তোর হলো কি বলতো?"

"কি আবার হবে? কিছুই না।"

"আমি বুঝতে পারছি, আমার কাছে তুই কি যেন লুকোচ্ছিস। কি এমন তোর ভাবনার কথা? আমাকে খোলাখুলি জানালে আমি তার বরং একটা উপায় ক'রে দিতে পারবো। অস্বীকার ক'রে কোনো লাভ নেই। আমি ঠিকই বুঝেছি যে একটা কিছু নতুন রকমের খেয়াল নিয়ে তুই মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিস।"

"না ছোট মা, তোমার কাছে কিছু লুকোবোনা। তবে এখন কিছু বলবারও নেই। কি যে আমার হয়েছে তা আমি নিজেই এখনও বুঝতে পারিনি। যখন নিজে ভালো ক'রে কথাটা বুঝতে পারবো তখন নিশ্চয়ই তোমায় বলবো। কিন্তু এখন নয়, আরো কিছুদিন বাদে।"

খুব নিবিষ্টভাবে নিজের মনকে ও বুঝে দেখবার চেষ্টা করলে। একই মনের ভেতর দুটো রকমের চাওয়া আর না-চাওয়া, কেন এমন

ক'রে আসে? মন একবার বলে—এটি আমার চাই। আবার তখনই বলে—না না, ওটা কেন, ওর চেয়ে আরো আলাদা কিছু যে আমার চাইবার ছিল। একই মনের মধ্যে দুটো দুই রকমের আকাঙ্ক্ষা, কেমন ক'রে তা হয়? কিন্তু তা হবেই তো। মনও নিশ্চয় একটা যন্ত্র, খেয়াল অনুযায়ী ভিন্ন সময়ে ভিন্ন রকমের কামনা করবারই সে যন্ত্র। মনকে বুঝতে গেলে সে কখন যে কি কামনা ক'রে বসছে, ঐ মন দিয়েই তা আবার বিচার ক'রে দেখতে হয়। এতেই মনটা দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটা যখন যায় চুরি করতে, আর একটা তখন তাকে চোখ রাঙায়। একটা যখন বলে ঝাঁপিয়ে পড়ি, আর একটা তখন বলে তাহ'লেই তোমার অধঃপতন। এমনি ঝগড়া নিয়েই তো মন জীবনের নাটক বানায়।

এমনি সব নতুন নতুন মনগড়া ঝগড়া নিয়েই হলো ওর আসল জীবন। তাকে অস্বীকার ক'রেই বা লাভ কি? সত্যকে বিচার করা চলেনা, তাকে স্বীকার ক'রে নেওয়াই ভালো। মনের ভেতরকার সেই রমজানকে মেরে ফেলতে চাইলেও তাকে মারা গেলনা। বহু রকমের শিক্ষিত শানিত অস্ত্র দিয়েও রঞ্জন তাকে কাবু করতে পারলে না। তখন ওর মনের মধ্যে থেকে গেল দুজন মানুষ, একজন রমজান, আর একজন রঞ্জন। রমজান রঞ্জনকে ঈর্ষা করে, আর রঞ্জন তাকে স্বীকার ক'রে নিলেও ঘৃণা করে। অথচ দুজনেই রয়েছে পাশাপাশি। থাক না, তাতে ক্ষতি কি? চলুক এদের দ্বন্দ্ব। একদিন তো একজনের পরাজয় নিশ্চয়ই হবে। ও যদি শেষ পর্যন্ত প্রকৃতই রঞ্জন হ'তে চায় তাহ'লে কার সাধ্য ওকে ঠেকিয়ে রাখে? রমজান যদি কোনো অপরাধ করে, ঐ রঞ্জন তখন তার প্রায়শ্চিত্ত করবে।

কিন্তু প্রেম জাতীয় ভালো-বাসা যার রীতিমত লাগতে শুরু হ'য়ে গেছে, তার কোনোখানে কোনো রকমই দ্বন্দের বালাই থাকেনা। তার সমস্ত সত্তার সকল দিক থেকে সব কামনা একজোট হ'য়ে সমগ্র অন্তরটি একান্তভাবে কেবল একটি জিনিসকেই বাসনা করে।

নীরার কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। তার ভাবগতিক দেখে তেমন কিছুই বোঝা যায় না। বড়ো জোর মনে হয় যেন ইদানিং সে একটু গম্ভীর হ'য়ে গেছে। অনেক সময় কিছু কথা না ব'লে নিতান্ত চুপ ক'রে থাকে। তবে সে তো অনেক কারণেই ঘটতে পারে। কিন্তু ওর দিদি ধীরার রকম সকম দেখে স্পষ্টই মনে হয় যে একটা বেজায় রকমের ভালো-বাসার নেশাই তার লেগেছে। আর সব চেয়ে মুশকিল এই যে বেচারা ভেতরকার ব্যাপার কিছু চেপে রাখতে জানেনা। কি যে কখন ওর মনের মধ্যে হচ্ছে আর না হচ্ছে তা অনায়াসেই লোকে ধরে ফেলতে পারে। চাটার্জি সাহেবের হয়তো ঐদিক দিয়ে তেমন নজরই নেই, কিন্তু নীরা সবই স্পষ্টভাবে দেখতে পায়। শুধু দেখতে পাওয়া নয়, অনেক সময় তাকে জানাজানির হাত থেকে ধীরাকে সামলে নিতে বেগ পেতে হয়।

এর মধ্যে ধীরা রঞ্জনের সঙ্গে মিশতে মিশতে গভীর অন্তরঙ্গতার স্রোতে ডুব দিয়ে কোথায় তলিয়ে গেছে। এমন অবস্থা, যে উদ্ধারের আর কোনই উপায় নেই। রঞ্জন যেদিন বললে যে পুজোর ছুটিতে সে বাড়ি যাবে, সেদিন ধীরার চোখ দুটো ছলছল করতে করতে প্রায় জল গড়িয়ে পড়ে আর কি। ঠোঁটের হাসি আর চোখের জ্যোতি

কোথায় মিলিয়ে গেল, মুখটা শুকিয়ে কেমন অন্যরকম হ'য়ে গেল। চ্যাটার্জি সাহেব যে ঠাট্টা ক'রে কলকাতা-বৈঠকের ইন্টারভ্যাল হবার নোটিশ জারী করা সম্বন্ধে এক্তার করছিলেন, তাও যেন সে কানে শুনতেই পেলোনা। আপিসের মেঝেতে চায়ের বাসন পড়ে ঝনৎকার শুনে ধীরা ব্যস্ত হ'য়ে চেঁচিয়ে ওঠাতে ধীরা অন্যমনস্ক হয়ে গেল, নইলে হয়তো ঐখানেই অশোভন ভাবে একটা কিছু প্রকাশ হয়ে যেতে পারতো। ধীরা হয়তো নিজেকে সম্বরণ করতেই পারতো না।

তার পরে যত দিন যেতে থাকে, ততই ধীরা বেশি বেশি অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে কিছুই সাফাই দেখাতে পারেনা, শুধু ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে। রঞ্জনের নাম শুনলেই অমনি আপাদমস্তক চমকে ওঠে, তার পরে কেমন হতাশের মতো হয়ে যায়। রঞ্জনের প্রসঙ্গ নিয়ে কোনো কথা একবার শুরু করলে আর সে মোটে থামতে চায় না। রঞ্জন কোন দিন কি বলেছিল সমস্তই যেন মুখস্থ হ'য়ে গেছে, সমস্তই ও বারে বারে নতুন ক'রে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলতে থাকে। বেয়ারা এসে ডাকের চিঠিগুলো চ্যাটার্জি সাহেবের হাতে দিয়ে গেলে ধীরা তার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে, লজ্জার মাথা খেয়ে উৎসুক হ'য়ে জানতে চায়, ওর নামে কোনো চিঠি এসেছে কিনা।

শুধুই যে ও কোনো কিছু চেপে রাখতে পারে না তা নয়, মাঝে মাঝে এমন-এক একটা মারাত্মক রকমের ভুল ক'রে ফেলে যে নিতান্তই হাস্যাস্পদ হ'য়ে পড়ে। এই যেমন, পুজোর ছুটিতে যে কতদিন পর্যন্ত কলেজগুলো বন্ধ থাকবে তা সে খুব ভালো ক'রেই জানে। পনেরোটা দিন ইতিমধ্যে কেটে গেছে, আরো দিন পঁচিশেক বাকি

কলেজ খুলবে। এ হিসেবটাতে ভুল হওয়া কোনো ছাত্রছাত্রীর পক্ষেই স্বাভাবিক নয়। কিন্তু মীরা কথার মধ্যে কথা এনে হঠাৎ একটা ভুল ক'রে বললো—"হ্যাঁরে, কলেজ খুলতে আর ক'টা দিন বাকি আছে বলতো?"

মীরা বললে—"এখনও প্রায় পঁচিশ দিন বাকি।"

"দূর, তাই কখনো হয়? এক মাসেরও বেশি হয়ে গেল যে।"

"সে কি দিদি, সবে পনেরোটি দিন যে পার হলো। ঐ ক্যালেণ্ডারটার দিকে একবার চেয়ে দেখ না।"

"তাই তো! ওরে বাবা, আরো পঁচিশ দিন এমনি ক'রে কাটাতে হবে? আমি তো মনে মনে ভাবছিলাম যে—ছুটিটা প্রায় কাবার ক'রে এনেছি। আবারই দেখছি ভুল হয়েছে। মনে হচ্ছিল কত দিনই যেন কেটে গেছে।"

"কেন, তোমার এত তাড়া কিসের? বাড়িতে থাকতে মন টেঁকে না বুঝি? কিছুদিনের জন্যে খুলেই তো কলেজ আবার বন্ধ হ'য়ে যাবে, তোমার তখন পরীক্ষা এসে পড়বে।"

"তা নয়, সে কথা হচ্ছে না, আমি একটা অন্য কথা ভাবছিলাম। আচ্ছা, কলেজ খোলবার পরে আস্তারিতে রূপেন দা'রা ফোর্থ ইয়ারে উঠবে তো? আমি এবার আই. এ পাশ করবার পরে মেয়েদের কলেজ ছেড়ে দিয়ে ঐ কলেজেই ভর্তি হইনা কেন? যতই যাই বলুক, মেয়েদের কলেজে ওদের মতো অতো ভালো পড়ানো হয় না। কি বলিস?"

"সে এখন পরের কথা। আগে আই. এ. পাশই করতে পারো, তবে তো? পরীক্ষার তো আর মাত্র চারটি মাস বাকি, অথচ পড়ার দিকে তোমার কোনো চাড়ই নেই। আবার না হয়

এখনো এক বছর বাকি রয়েছে, তোমার তো আর তা নয়। ফেল করলে যে আমার সঙ্গেই আবার পড়তে হবে!"

নীরার কথায় ধীরা চমকে উঠলো। তার মুখের কিসের নেশা ছুটে গেল। "তাই তো পরীক্ষার কথাটা আমি একেবারে ভুলেই গিয়েছিলুম। ভালো ক'রে না পড়লে এবার পাশ করবো কেমন ক'রে?"

সেই দিন থেকে ধীরা খুব মন দিয়ে পরীক্ষার পড়া পড়তে শুরু করলে। চশমা চোখে টেবিলের ওপর মাথা গুঁজে ও অস্ফুটস্বরে বিড়্ বিড়্ ক'রে দিনরাত পড়তে লেগে গেল। একে তো শর্ট সাইট, ঝুঁকে না বসলে নোট বইএর ছোটো ছোটো অক্ষরগুলো ভালো দেখতেই পায় না। তার ওপর একটু চেঁচিয়ে না পড়লে ওর পড়া মুখস্থই হয় না। কোণের ঘরটিতে আশ্রয় নিয়ে ও পড়তে বসতো, রাত্রে একটি টেবিল-আলো জেলে নিতো। পড়তে পড়তে ঘুম বাধা হ'য়ে গেলে খানিকটা ক'রে জল খেয়ে নিয়ে আবার ও বিড়বিড় ক'রে পড়া শুরু করতো। ভোর পাঁচটার সময় দেখা যেতো, তখন ধীরা ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসে যায়। রাত্রি বারোটার সময় দেখা যেতো, তখনও সে জেগে বসে পড়তে থাকে। এত বেশি পড়ার চাড় কখনই ওর দেখা যায়নি। আসন্ন পরীক্ষায় যেমন ক'রেই হোক পাশ করতে হবে, তাই এত আপ্রাণ প্রচেষ্টা। যেন এবার ফেল করলে ওর সারা জীবনটাই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে।

পরীক্ষার পড়াতে ধীরাকে পেয়ে বসলো। এই একটা সর্বগ্রাসী ধরণের সাধনার মধ্যে আত্মনিয়োগ করতে পেরে আপাতত ও বেঁচে গেল। এ ছাড়া তখন আর ওর কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, কোনো প্রতীক্ষা নেই। অতঃপর দিন গোণবার আর প্রয়োজন রইল না, ও কেবল আপন মনে দিনের পর দিন পড়া মুখস্থ ক'রেই চলল।

কতদিন যে এমনিভাবে কেটে গেল তার কোনো আর হিসেবই নেই। তারপর একদিন হঠাৎ ওর পড়ার ঘরে ছুটে এসে নীরা বললে—"চল দিদি, বই বন্ধ ক'রে এখনই চলে এসো। নইলে হয়তো এখানেই এসে হাজির হবেন। আমাকে যেন চোখে দেখতেই পেলেন না। এসেই প্রথমে তোমাকে খুঁজতে শুরু করেছেন।"

"কে আমাকে খুঁজতে এলো রে? বললে যা, আমি এখন পড়ছি, যেতে পারবো না।"

"রঞ্জন বাবু এসেছেন যে! তুমি তাঁর গলার আওয়াজ এখনও টের পাওনি? ওমা, তুমি কী গো!"

ধীরে ধীরে বইখানা বন্ধ ক'রে একটা লম্বা নিঃশ্বাস ফেলে মীরা উঠে দাঁড়ালো।

রঞ্জনকে দেখে ও সব কিছু প্রতীক্ষার নিগ্রহের কথা ভুলে গেল, আবার ওর মুখে সেই আগেকার হাসির তরুণ জ্যোতি ফুটে উঠলো। আবার ওদের যথারীতি আড্ডা বসতে লাগলো। গল্প আর তর্ক, আগেকার মতোই পুরোদমে চলতে লাগলো। তবু কিন্তু মীরার পরীক্ষার জন্যে পরিশ্রম করা আর শিথিল হলো না।

মীরা এখন রঞ্জনের খুব কাছাকাছি নাগালের মধ্যে গিয়ে পড়তে চায়। এর চেয়ে আরো কাছে, আরো কাছে। এইটুকু মাত্র পথ পেয়েই তেমন কোনো তৃপ্তি নেই। এতে কখনো মন ভরে? যেদিন খুশি হলো, বিকেলের দিকে রঞ্জন হয়তো ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে বেড়াতে এলো, খানিকটা গল্পগুজব ক'রে চলে গেল। তার পরে দুদিন আর হয়তো এলোই না। এতেই কখনো তুষ্ট হয়ে থাকা যায়? সুরলোকের স্বাদটা ভালো ক'রে পেতে না পেতেই পরম আকাঙ্ক্ষিত সত্তাটি অতৃপ্ত হ'য়ে পড়ে। তখন ক্ষোভ আর অতৃপ্তির সীমা পরিসীমা থাকে

না। রঞ্জনের আভাসটুকু পেয়েই তার থেকে বারে বারে বঞ্চিত হতে থাকা, সে তো জোটে-না-পাওয়ার চেয়েও অনেক বেশি লাঞ্ছনা। ও যে একান্তই তাকে অনেকক্ষণের জন্য কাছে পেতে চায়। ধীরা এখন স্বতন্ত্রভাবে রঞ্জনকে একান্ত ক'রে পেতে চায়, যেখানে বাবা নেই, যেখানে নীরাও নেই। ওদের সঙ্গে রঞ্জন যখন জমিয়ে কথা বলতে শুরু করে, তখন ওর বুকের মধ্যে একটা অব্যক্ত রকমের বেদনা যেন জোরে জোরে মোচড় দিতে থাকে। তখন ধীরার মনে হয়, ওদের সকলের লোভনীয় মানুষটিকে ওদের সকলের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে যাই। পাঁচ-জনের সঙ্গে বসে একটি মাত্রই সুধাপাত্র থেকে এক এক চুমুক ভাগ ক'রে খাওয়া, তাতে কখনো তেষ্টা মেটে? সুধার পাত্রটিকে ও একাই দখল ক'রে নেবে, তবে না তেষ্টা মিটবে! ধীরা তাই সংকল্প ক'রে বসেছে, যেমন করেই হোক পরীক্ষাটায় পাশ ক'রে নিয়ে এবার সেই রূপেন দা'দের অর্থাৎ রঞ্জনদের কলেজে গিয়ে ঢুকবে। থার্ড ইয়ার ফোর্থ ইয়ার নিশ্চয়ই খুব কাছাকাছি। কোনো কোনো ঘণ্টায় হয়তো দুই ইয়ার জড়িয়ে একসঙ্গেই ক্লাস বসে। রঞ্জনের সঙ্গে একই ক্লাসে বসবার সৌভাগ্য ওর তখন অনায়াসে হতে পারবে। সেখানে নীরাও নেই, আর বাবাও নেই। বললেই বা আলাদা বেঞ্চিতে অনেকখানি তফাতে! যতক্ষণ খুশি ও একদৃষ্টে রঞ্জনের দিকে চেয়ে থাকবে, রঞ্জনও নিশ্চয় ওর দিকে চাইবে। এমনি ক'রে দূর থেকে চাওয়ার মধ্যেও তো পাওয়া যাবে কত নব নব আস্বাদ, কত অভূতপূর্ব পরিতৃপ্তি!

তার পরে আরো কত কি সুযোগ, কত অভাবনীয় রকমের ঘনিষ্ঠতা ওদের মধ্যে তখন ঘটে যেতে পারবে, নীরার মতো আত্ম-সর্বস্ব মোটাবুদ্ধি মেয়েরা যা কখনো ধারণাই করতে পারে না। অবশ্য এতটাই যে সম্ভব হ'বে, সে যখন ওরা দুজনেই কাছাকাছি হ'য়ে

মিশে যাবে তখন। তেমন কাছাকাছি হবার জন্যেই তো ওর এত বেশি আকিঞ্চন। রঞ্জনকে তেমন একান্ত কাছে হাত দিয়ে টেনে আনবার কোনো উপায় নেই, সেইজন্যেই তো নিজেই ও এমন ক'রে তার দিকে উন্মুখ হয়ে ছুটে চলেছে। সারা অন্তরের কামনা দিয়ে যাবেই যাবে ও রঞ্জনের কাছে, এখনকার চেয়ে আরো অনেকখানি কাছে।

তার পরে কি কি ঘটতে থাকবে? সে কথা আরও নির্বিশেষ ক'রে ভাবতে মীরা পারেনা। কল্পনা এই পর্যন্ত এসেই একটা ধাক্কা খেয়ে অসাড় হ'য়ে থেমে যায়; এর চেয়ে বেশি কিছু সুখ ঠাউরে উঠতে সে পারেনা। এই নিয়ে আরো বহুদূর পর্যন্ত স্পষ্ট করে কিছু ভাবতে গেলেই ও ভয় পায়, নিজের মনেই দারুণ কেমন লজ্জা পায়। কোনো একটা খুব লোভনীয় দৃশ্য মনে মনে আঁকতে গেলেই তাড়াতাড়ি সেটা অমনি মন থেকে মুছে ফেলে দেয়। নিতান্ত অপ্রস্তুত হ'য়ে ভাবে—ছি-ছি, পড়তে বসে পড়ার কথা ছেড়ে দিয়ে আমি কি যে সব ছাইভস্ম ভাবতে আরম্ভ করেছি। আগে পাশ করতেই পারি, তবে তো! গলাটা পরিষ্কার ক'রে নিয়ে আবার দ্বিগুণ উৎসাহে সে পরীক্ষার পড়া শুরু ক'রে দেয়।

৮

কিন্তু বাস্তবে যা ঘটলো সে কল্পনাকেও ছাপিয়ে গেল।

মীরা পরীক্ষায় ভালো ভাবেই পাশ ক'রে রঞ্জনদের কলেজে ভর্তি হলো। রঞ্জন যে বিষয়গুলি নিয়ে অধ্যয়ন করতো, মীরাও ইচ্ছে ক'রে সেই বিষয়গুলি পাঠ্য হিসেবে বেছে নিলে। বললে তাতে সে রঞ্জনের কাছে অনেক সাহায্য পাবে।

খুব উৎসাহের সঙ্গেই ধীরা নতুন কলেজে যাতায়াত শুরু করলে। আগে যেখানে পড়তো সেখানে দুই বোনে কলেজের বাসেই যাতায়াত করতো। কিন্তু এখানে নিজেদের বাড়ির গাড়ি ওকে পৌঁছে দিয়ে যেতো, আবার নির্দিষ্ট সময়ে এসে বাড়ি নিয়ে যেতো। কোনোদিন আসতো মোটর, কোনোদিন বা ঘোড়ার গাড়ি।

এখন প্রত্যহই ওর দেখা হতো রঞ্জনের সঙ্গে। কলেজের ছুটির পরে প্রায়ই রূপেনকে আর রঞ্জনকেও খেলার মাঠ থেকে কিংবা হষ্টেল থেকে নিজের গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যেতো। ওরা দুজনে আবার এক সঙ্গেই সেই আলিপুর থেকে ফিরে আসতো। রূপেন কোচিং ক্লাসে পড়তো বলে কোনো কোনো দিন ওর যাওয়া ঘটে উঠতো না। সেদিন রঞ্জন ধীরার সঙ্গে একাই যেতো। গাড়িতে বসে ওরা কত রকমেরই যে আলাপ করতো তার কোনো ঠিকানা নেই। রঞ্জনকে এমন একান্তভাবে কাছে পেয়ে ধীরা মনের অসহ উদ্বেগে এক মিনিটও স্থির হ'য়ে থাকতে পারতো না। রঞ্জনের এতটা কাছে চুপ করে বসে থাকতে তার ভয় করতো। সেইজন্তে সে যা খুশি তাই প্রশ্ন করতো। রঞ্জন দু চার কথায় যা জবাব দিতো সেটাও কিন্তু তার মনঃপুত হতো না। সে চাইতো রঞ্জন অনবরতই কথা বলুক, সে কেবল নিশ্চিন্ত হয়ে দুই কান ভরে তাই শুনবে। বিশেষ কোনো সারগর্ভ কথা নয়, কথার কোনো গুরুত্বপূর্ণ অর্থ থাকবারও কোনো দরকার নেই, ও শুনবে শুধু রঞ্জনের ভরাট গলার মিষ্টি স্বরের অর্থনিরপেক্ষ বাচনিক ঝংকার। প্রিয়কণ্ঠস্বরের উন্মাদনা যে কেমন হয়, তা কেবল তারই কাছে একান্তে বসে ও এই প্রথম উপলব্ধি করছে। এতটুকু ভয় ভয়, খুব চেনা থাকলেও এমন করে কাছে বন্ধনেই হঠাৎ যেন

মনে হয় একটু অচেনা অচেনা। দুজনের মধ্যে কিছুই আড়াল নেই, তবু ছুঁতে চাইলেই তখন আর যেন ছোঁয়া যায় না। এ এক রকম রহস্যময় পরিবেশ।

প্রথমে ছিল শুধু কানেরই তৃপ্তি, তার পরে পাওয়া গেল অপূর্ব এক ধরণের স্পর্শসুখ। দু'জনের অঙ্গের স্পর্শ মাঝে মাঝে গাড়ির ঝাঁকানিতে দু'জনেই পেয়ে যেতে লাগল, নিতান্তই যেন অপ্রত্যাশিত আকস্মিক ভাবে। মোটরে ওরা বসে পাশাপাশি, ঘোড়ার গাড়িতে বসে সামনাসামনি। ছুটন্ত গাড়ি যখন এক রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তায় ঢুকতে গিয়ে হঠাৎ সামনের চাকা বেঁকিয়ে মোড় নিতে শুরু করে, বসবার জায়গাটা তখন কাৎ হ'য়ে বেশ একপাশে হেলে যায়। পাশাপাশি বসে থাকলে এতে গায়ের সঙ্গে গা লেগে যায়, কোনো কোনো দিন টাল সামলাতে না পেরে হয়তো একজন অন্যের গায়ের ওপর একটু ঝুঁকেও পড়ে। চকিতের জন্যে এমনি-ভাবের সামান্যই একটু স্পর্শ। তার পরে দু'জনেই তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে সোজা হ'য়ে বসে,—কিন্তু তা ঐ চকিতের মধ্যেই যতটুকু স্পর্শসুখ মিলে যায় সেটুকু নিবিড়ভাবেই অনুভব ক'রে নেবার পরে। সামনাসামনি বসলে হাঁটুর সঙ্গে হাঁটুও ঠোকাঠুকি হ'য়ে যায়, লজ্জার সঙ্গে লজ্জা। কোনোদিন বা আচমকা মাথার কাছে মাথাটা খুবই ঝুঁকে পড়ে, মুখের কাছে মুখটা। বীরার মাথার আলগা উড়ন্ত চুলগুলো চকিতের জন্যে একবার মদনের গালের ওপর দিয়ে তার নিমেষের স্পর্শ বুলিয়ে সরে যায়। মুখে কেউ কিছু বলেনা, কিন্তু দুজনেই দু রকমের কথাগুলি মনে মনে ভাবতে থাকে। বীরা ভাবে—বাঃ, কি চমৎকার! সামান্য চুলের ঝাঁকনি লাগিয়ে দিয়ে আমি আজ কি অমূল্য জিনিসটাই পেয়ে গেছি! অথচ

উনি এর কিছু টেরই পেলেন না। চুল দিয়েও যে এমন ক'রে কাউকে ছোঁয়া যায় এ কথা আমি ছাড়া জগতে আর কেউই হয়তো জানে না। এদিকে রঞ্জন ভাবে—মরি মরি, কি মোলায়েম ওর চুলের রেশমি স্পর্শটুকু, আর তারই সঙ্গে আমাকে জানিয়ে দিয়ে গেল কত মনোরম ওর সারা দেহের সুরভি। কিন্তু আমি যে ওর সেই অপূর্ব সুরভিটুকু আঘ্রাণ ক'রে নিয়েছি, তাও ঘুণাক্ষরেও জানতে পারলে না। জানলে নিশ্চয় লজ্জায় মরে যেতো। ও যা লাজুক। তখন দুজনেরই গায়ে কাঁটা দেয়। প্রত্যেকেই ভাবে এ শুধু আমারই পরম লাভ হলো, ওর কিছু নয়।

ক্রমশ অল্পে অল্পে ওরা পরস্পরকে আপন আপন মনের ব্যাকুলতা একটু আধটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জানাতে শুরু করলে। প্রথমে খুবই আকারে ইঙ্গিতে। তার পরে প্রচ্ছন্ন ভাষায়, তৃতীয় বচনে, অবান্তর গল্পের ছলে। তার পরে কিছু অসংলগ্ন অসম্পূর্ণ বাক্যে, তার পরে সোজাসুজি। সম্পর্কটা এমন ঘনিষ্ঠতর হ'তে খুব বেশিদিন সময় লাগেনি।

তখনকার কথাবার্তাও একেবারে অন্যরকম।

মীরা বলে—"যাই কিন্তু বলুন, আপনার গায়ের রংটা আমার চেয়ে অনেক বেশি ফর্সা।" এটা সে বলছে গাড়ির মধ্যে দুজনে সামনা-সামনি বসে। বলা বাহুল্য রূপেন সেদিন উপস্থিত নেই।

রঞ্জন বলে—"এ তো আমার পক্ষে খুবই গৌরবের কথা। এই আবিষ্কারটা তুমি কিন্তু নিজের মনে মনেই জেনে রেখো, আর কাউকে যেন জানিয়ো না।"

"কেন, এ কথা বলতে আর এমন দোষ কি আছে?"

"না, দোষ কিছুই নেই, তবে কিনা লোকে শুনলে হো হো ক'রে হেসে উঠবে।"

"হাসবে কি রকম? এ তো চোখেই দেখা যাচ্ছে। আপনার হাতখানা আমার হাতের সঙ্গে পাশাপাশি একবার রাখুন না। এবার নিজেই বলুন, কোন হাতটা বেশি কর্সা।"

"আমি তো দেখছি তোমার হাতটাই। আমারটা ওর কাছে বেশ একটু কালোই দেখাচ্ছে।"

"ও মা, আপনি কলার-ব্লাইণ্ড (রং-কাণা) হয়ে গেলেন নাকি?"

"জানিনা তো, কেমন করে তা বলি বলো। তাহ'লে চোখটা মেডিকেল কলেজে পরীক্ষা করিয়ে আসতে হয়। এ একটা ভাবনার কথা হলো। আমি যে তোমার আগাগোড়াই দেখি সুন্দর। সেটা তাহ'লে ভুল দেখি না কি?"

"যান, আপনি বড়ো বাজে কথা বলেন।"

"বলি না কি? তবে আর কিছু বলবোনা। এবার থেকে তাহ'লে চুপ ক'রেই থাকি।"

"জানেন, আমাদের ইকনমিক্সের প্রফেসর আজ একটা ভারী মজার কথা বলেছে। পড়াতে পড়াতে প্রায়ই সে এই কথাটি বলে, চাহিদা না হ'লে কারো কখনো চোখ খোলেনা। যার চাহিদা নেই সে চিরকাল অন্ধই থাকে।"

এই সূত্রে কথাটা অন্য দিকে ঘুরে গেল। কিন্তু দুজনেরই মনে রয়ে গেল কোন এক চাহিদার কথা। ওরা বুঝতে পেরেছে যে দুজনের মধ্যেই জেগে উঠেছে সেই অদম্য চাহিদা। দুজনেরই চোখের দৃষ্টি নতুন ক'রে চাইবার মতো কিছু লোভনীয় বস্তুর সন্ধান পেয়েছে।

আরো খানিকটা অগ্রসর না হ'য়ে ওরা শান্তিতে থাকতে পারে না। এমন কি মজলিশের মধ্যে বসেও কখনো কখনো আকস্মিক অসম-সাহসিকতার সঙ্গে এ ওর হাতখানা শক্ত ক'রে চেপে ধরে মরিয়া হ'য়ে

অনেকক্ষণ পর্যন্ত তেমনি এক ভাবে হাতটা ধরেই থাকে। কখনো বা কথাচ্ছলে এ ওর হাতখানা নিজের হাতে তুলে নিয়ে আঙুলগুলো নেড়েচেড়ে প্রকাশ্যভাবে খেলা করে। নিতান্তই যেন সেটা অপরের আঙুল নিয়ে অন্যমনস্কের একটা লীলা, আর কিছু নয়। ধীরা হঠাৎ একবার কথাচ্ছলে ব'লে ওঠে—"দেখি দেখি, আপনার এই কড়ে আঙুলটা কাটা কেন ?" রঞ্জন যেন নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলে—"ও আমার জন্ম থেকেই এমনি।"

ওরা ভাবে, ওদের ভেতরকার এই সব কথা নীরাও হয়তো কিছু জানেনা। সে এখন পড়ে স্বতন্ত্র কলেজে। নিজের পড়া নিয়ে আর নিজের কাজ নিয়েই সে হয়তো ব্যস্ত হ'য়ে সারাক্ষণ থাকে। ওদের গোপন মিলনের সম্বন্ধে তারই বা মাথা ঘামাবার কি এমন দরকার? নীরার সম্বন্ধে ওদের খুব বেশি সাবধান হবার কোনো প্রয়োজন নেই। ওরা মনে করে যে দুজনের মধ্যে এতটা ঘনিষ্টতা দেখেও তার মনে সম্ভবত কোনো সন্দেহ কিংবা ঈর্ষা জাগেনি। অন্তত পক্ষে সেটা জাগা উচিতও নয়।

কিন্তু তবু একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা গেল। ওরা কখনো কখনো একটু স্বতন্ত্রে বসে নিজেদের পারমার্থিক কথাবার্তায় তন্ময় হ'তে চাইলে, কিংবা অস্ফুটভাবে কিছু গুঞ্জন শুরু করলে প্রায়ই তাতে বাধা পড়ে যেতো। সে কেবল ঐ নীরারই জন্য। নীরা কিছুতেই তখন ওদের কাছ থেকে নড়তে চাইতোনা। অবশ্য ইচ্ছা ক'রেই সে যে এরূপ করতো তা হয়তো নয়। কোনো না কোনো একটা কাজ নিয়ে সে ঐখানেই বসে থাকতো, হয়তো ওদের কথার মধ্যে এমন এক একটা জটিল রকমের অবান্তর প্রশ্ন এনে ফেলতো যে তার পরে ওদের নিজেদের প্রসঙ্গে ছেদ পড়ে যেতো। ধীরার এতে খুব রাগ হ'য়ে

যেতো। নীরাকে ধমক দিয়ে সে বলতো—"তুই আমাদের কাছেই বা এমন ক'রে দিনরাত পায়ে লেগে বসে থাকিস কেন? অন্য জায়গায় গিয়ে নিজের বইটই পড়লে না।" নীরা আর কোনো কিছু না করে তখনই উঠে চলে যেতো। এতে রঞ্জনের মনে একটু কষ্ট হতো। এক একদিন সে বলতো—"আহা, নীরা কেন উঠে যাবে? আমরাই বরং এখান থেকে উঠে যাই চলো।" নীরা বলতো—"না না, আপনারা থাকুন, আমি চলে যাচ্ছি।" তার যেন এতে রাগও নেই, অভিমানও নেই।

রঞ্জনের কাছে নীরার সম্বন্ধে এই সব ব্যাপার নিয়ে যেন একটা প্রহেলিকার মতো লাগতো। এমনিতে নীরাকে খুবই বুদ্ধিমতী ব'লে মনে হয়। কিন্তু এ সব বিষয়ে ওর কি কোনো বোধশক্তি নেই? ওর মনে কিছুমাত্র সাড়া নেই, ঔৎসুক্য নেই, এমন কি ওর হাসিটাও যেন ফাঁকা ফাঁকা। মেয়েটি দেখতে দেখতে কেমন যেন অসাড়ের মতো হ'য়ে যায়। অথচ ওদের কাছে আবার ঘুরে আসে, ধমক না দিলে নড়তেও চায়না। বড়ই দুর্বোধ্য এই মেয়েটির ব্যবহার। সময়ে সময়ে যে ওর সরে যাওয়া উচিত, তাও কি বুঝতে পারেনা? একদিন একটা ঘটনায় রঞ্জন অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। সেদিন বাগানে একটা গোলাপ ঝাড়ের আড়ালে বসে ওরা দুজনে গল্প করছিল। চ্যাটার্জি সাহেব তখন বাড়িতে নেই। নীরা হঠাৎ কোথা থেকে এসে একেবারে ওরই পাশে বসে পড়লো। এমন অবস্থায় তাকে কিছু বলাও যায় না। ওরা দুজনে চুপ ক'রেই রইল। নীরা তার একটু পরে আপনিই উঠে চলে গেল। কেন যে এসেছিল, আর কেন যে চলে গেল, মুখের ভাব দেখে তার কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু একটা বাধা তো পড়ে গেল। রঞ্জন ভাবলে এ বড়ো অস্বস্তিকর।

ওরা তখন নিভৃতে আলাপ করবার অন্তরকম জায়গা খুঁজতে লাগলো। দুজনেরই যেখানে সে বিষয়ে সমান আগ্রহ, সেখানে তার সহস্র রকমের সুযোগও মিলে যায়। জগতে নিরালা জায়গার কোনো অভাব নেই। সিনেমা বায়স্কোপ আছে, গড়ের মাঠের গাছতলা আছে, গঙ্গার ধারে রেল লাইনের ওদিকের জেটিগুলো আছে, আলিপুরের চিড়িয়াখানা আছে,—নাম ক'রে ফুরোনো যাবেনা।

তার মধ্যে ওরা নিজেদের মনোমত একটি নির্দিষ্ট স্থান বেছে নিয়েছিল। সেটি আলিপুর চিড়িয়াখানার কাছাকাছি হর্টিকালচারাল্ গার্ডেনস্। স্থানটি চমৎকার গাছপালায় ঘেরা, রকম রকমের সুদৃশ্য দেশীবিদেশী নামের অজস্র ফুল সেখানে ফুটে ঝরে গাছতলা ছেয়ে বিছিয়ে থাকে। অথচ স্থানটি একেবারেই নির্জন, পায়চারিবিলাসী দুই চারটি সাহেব মেম ছাড়া খুব কম লোকেই সেখানে যায়। দুজন তৃষ্ণার্ত নরনারীর নিশ্চিন্ত নিরিবিলি হ'য়ে পিপাসা মেটাবার পক্ষে এই স্থানটি অপূর্ব। পরচ্ছিদ্রান্বেষী সন্দিগ্ধ লোকেরা এই নিভৃত রম্য উদ্যানটির সন্ধান হয়তো জানেনা। ওখানে যারা কখনো বেড়াতে গেছে তারা কিন্তু সকলেই জানে যে ওর মধ্যে লতাগৃহ আর কুঞ্জবনের কোনো অভাব নেই। সেখানে বসে সারা বিকেল কাটিয়ে দিলেও অবাঞ্ছিত লোকের দৃষ্টি আকর্ষিত হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। সান্ধ্য ভ্রমণে বেরিয়ে সাহেব মেমেরা কুকুরের চেন ধরে ভাবশূন্য মুখে পাশ দিয়ে যাতায়াত করে, ঘাড় বেঁকিয়ে কোনো তরুণ মিথুনের দিকে চেয়ে চোখ থেকে সন্দেহের অগ্নিবাণ ছাড়েনা।

সময় থাকলেই ওরা দুজনে কলেজ থেকে বাড়ি ফেরবার পথে এই জায়গার কাছ বরাবর গিয়ে গাড়িটাকে ছেড়ে দেয়। তার পর ঐ বাগানে ঢুকে খানিকটা কোথাও ব'সে বিশ্রম্ভালাপ ক'রে সন্ধ্যার

[illegible]গে হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফেরে। এমন নিরালা জায়গাটি পেয়ে [illegible]রা যে সময়সংক্ষেপের কথা ভুলে যায় সেটা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে বাড়ি ফিরতে তবু ওদের নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে একটুও বিলম্ব হয় না। সেইজন্যে কেউ এই নিয়ে বিশেষ সন্দেহও করেনা। এর ভেতরকার কারণটা অন্য কেউ না জানলেও সেটি আমরা জানি। ঐ বাগানে ঠিক ছ'টার সময় একটা ঘণ্টা বাজে, আর শীতকালে বাজে পাঁচটায়। তখন সবাইকেই সেই বাগান থেকে চলে যেতে হয়, তার পরে ফটক বন্ধ হ'য়ে যায়। ওরা তাই ঘণ্টা বাজবার আগে পর্যন্ত পরম নিশ্চিন্তে নিজেদের নিয়ে মগ্ন থাকতে পারে। এতটা গোপনীয়তা আর সাবধানতা সত্ত্বেও ওরা কিন্তু একদিন আশ্চর্য রকমে ধরা পড়ে গেল।

সেদিন ওরা বসেছিল ঐ বাগানের অতি নিভৃত একটি ছোটো ঝিলের ধারে। তার একটা দিক ছোটো ছোটো সিঙ্গাপুরী বাঁশ গাছে ভরা, অন্য দিকটা অজস্র ফুলন্ত লতাবিতানে দিয়ে ঘেরা। সারা ঝিলের বুকটা পদ্মপাতায় আর লাল সাদা পদ্মফুলে ছেয়ে গেছে। মস্ত মস্ত ফোটা ফুল থেকে পাপড়িগুলো ভেঙে ভেঙে চারিদিকে এলিয়ে পড়ছে। লতার বেড়ার আড়ালটিকে পিছনে রেখে দুজনে ওরা পাশাপাশি বসেছে, গায়ে গায়ে ঘেঁষে। রুমালে ভরে এনেছিল গরম চীনেবাদাম [illegible]জা, সামনে রেখেছে সেই রুমালটা ছড়িয়ে। দুজনে ক্রমাগতই খট্‌ খট্‌ ক'রে খোসা ভেঙে বাদাম খাচ্ছে, আর খোসাগুলো নিজেদের কাপড়চোপড়ে ফেলে ইতস্তত ছড়াচ্ছে।

ধীরা বলছিল—"বলুন তো, এমন একটি চমৎকার জায়গা জগতে আর কি কোথাও আছে? কত ঘুরে ঘুরে কত কষ্টেই যে এমন মনের মতো জায়গাটি খুঁজে বের করা গেছে!"

অমল একটু হেসে বললে—"কে খুঁজে বের করলে? তুমি না আমি?"

ধীরা বললে—"আচ্ছা বাপু, তুমিই না হয় বের করেছো, সে কথা তো হচ্ছে না। ঐ যাঃ, ছি ছি! অন্যমনস্ক হ'য়ে ভুল ক'রে হঠাৎ আপনাকে তুমি বলে ফেললুম। আমার যেন মতিভ্রম হয়েছে।"

"বেশ করেছো। এমন কোনো মারাত্মক ক্ষতি তাতে হয়নি। আজও না হয় ভদ্রতা দেখিয়ে আমাকে আপনি আপনি বলছো, কিন্তু চিরকালই কি তাই বলবে? এর পরে আর কি নূতন কিছুই হবার নেই?"

"এর পরে আরো যে কি হ'তে পারে তা এখন কেমন ক'রে বলবো? কিন্তু আমার মনে হয়, এখন যেমন আছি এই বেশ, এমনিই যদি চিরকাল আমরা থেকে যাই তো বেশ হয়। এখন যা পেয়েছি তার চেয়ে আর বেশি কিছুতে আমার কাজ নেই।"

"সে কি কথা? এইখানেই ফুল ষ্টপ? কিন্তু আমার আরো যে অনেক বেশি কিছু চাই। এইটুকু পর্যন্ত এনেই কি তুমি আমাকে থামিয়ে দিতে চাও?"

"না না, তাই বুঝি বললুম? আমি শুধু নিজের কথাই বলছিলুম। আমার মতো সুখী আর কে হ'তে পারে বলো? আমার তো মনে হয় যে তোমার কাছে আমি এতই বেশি পেয়ে যাচ্ছি, এর চেয়ে বেশি আনন্দ মানুষে কখনো পায় না কি?"

"দেখ ধীরা, পাওয়ার কি একটা শেষ আছে? আমার তো অন্তও নেই। আমার জীবনের সকল রকমের সাধই আমি একে একে তোমাকে দিয়ে মিটিয়ে নিতে চাই। সেইজন্যেই তোমাকে আমার এত দরকার। কিন্তু সে কথা এখন থাক। সে সব কথা বলবার দিন এলে

বলবো'। কিন্তু তোমার সাধটা মিটলো কিসে? তুমি আমার মতো মেটোমার মতো কি এমন দেখলে আর কি এমন পেলে বলতো? তোমার তোমাকে ভালো লাগার বহুক অনেক রকমের মানে থাকতে পারে, কিন্তু আমাকে তোমার অতোখানি ভালো লাগার কোনোই মানে হয় না। তুমি তো আমার সম্বন্ধে কিছুই জানোনা, এমন কি আমার পরিচয়টুকুও নয়।"

"নিশ্চয় মানে হয়। সে তুমি কি বুঝবে? মানুষকে ভালো লাগতে তার নিখুঁত পরিচয় জানবার জন্যে ঠিকুজী কোষ্ঠির দরকার হয় নাকি? এমন কথা তো কখনো শুনিনি। এর তো খুব সোজা মীমাংসা রয়েছে, আমার চেয়ে যে তুমি অনেক বিষয়েই ভালো।"

"তুমি জানো না, জানো না মীরা। খুব সোজা ব্যাপার নয় এটা। এই পৃথিবীটা যে কি ভয়ানক মিথ্যে জিনিস দিয়ে ঠকায়, তার কিছুই তুমি জানো না। আমি ভেবেছিলুম যে অন্য সব মেয়েদের মতো তুমিও বুঝি খুব চালাক, কিন্তু এখন দেখছি তা মোটেই নয়। এটুকু বুঝতে পারোনা যে তোমার মতো বোকা হ'লেই ঠকতে হয়?"

"কে আমাকে ঠকাবে? তুমি? তা বেশ, তুমি যদি ঠকাও তো তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই। তোমার ঠকাঠকি সবই আমি সইতে পারবো,—কেবল একটি জিনিস ছাড়া।"

"সেটা এমন কি জিনিস, যা ঠকার চেয়েও এত বেশি মারাত্মক?"

"সেটা তোমার তাচ্ছিল্য। ভালোবাসলে নাকি অনেক রকমের দুঃখ কষ্ট পেতে হয়। তা হোক, সে সবই সওয়া যায়। কেবল ঐটি ছাড়া। তুমি যেমন বোকা মনে করছো তেমন বোকা আমি নই। খুবই চালাক ছিলুম আমি, নইলে কি আর সহজে তোমার

ধরতে পেরেছি? দেখলে না, কেমন ক'রে নিজেকে ধরা দি এই অল্প দিনের মধ্যেই তোমাকে ধরে ফেললুম? চালাক ছিলুম ব'লে তবেই তো! কিন্তু ধরা দেবার পর থেকেই হঠাৎ বোকা হ'য়ে গেছি। ঠকবার কথা তো মোটে এখন ভাবতেই পারি না। কি ঠকেই যদি যেতে হয়, তাও আমি হাসিমুখেই মেনে নেবো। তোমা দারিদ্র্য কিংবা তোমার শাসন, সব কিছুই সহ্য করবো। যেখানে যেমন ভাবে থাকতে বলো তেমনি ভাবেই থাকবো। কিন্তু তুমি যদি এর পরে আমাকে একটুও তাচ্ছিল্য করো, সে আমি কিছুতেই সহ্য করতে পারবো না। তাহ'লে আমি মরেই যাবো। ভালোবাসার খাতিরে নিষ্ঠুরতাও সওয়া যায়, আর কুঁড়েঘরও সওয়া যায়, কিন্তু যে একবার ভালোবেসেছে তার অবহেলা কিছুতে সওয়া যায় না।"

ধীরার চিবুকটা ধরে হাসতে হাসতে রঞ্জন বললে—"যাকে পেয়ে আমার জীবন সার্থক করতে চলেছি, তাকে কখনো আমি তাচ্ছিল্য করতে পারি? যার কাছে হৃদয়ের দান পেলুম তার কাছে কখনো হৃদয়হীন হ'তে পারি? ওটা নিয়ে তুমি মিছেই ভয় করছো। কিন্তু যদি কখনো এমন দেখতে পাও যে, লোক চিনতেই ভুল করেছে, সেটা তুমি তখন সহ্য করতে পারবে তো?"

এই সময় হঠাৎ ঝোপের ওদিক থেকে কি একটা পাখি ডেকের ওঠার মতো শব্দ হলো। ধীরা বললে—"ঐ দেখ এখানেও কি একটা পাখি ডাকছে। যেখানে ফুল ফোটে সেখানে যত পাখিও এসে জোটে, তার মানে কি? কেবল ফুল দেখেই তো ওদের পেট ভরে না।"

রঞ্জন বললে—"তা ভরে বৈকি! ফুল থেকে যে একদিন ফল ফলতে পারে, এই আশা নিয়েই হয়তো পেট ভরে। পাখিরা ভরুক, আমার কিন্তু চীনেবাদাম খেয়ে বেজায় পেট ভরে গেছে

এইবার পা দুটি ছড়িয়ে বসে তুমি বাদাম চিবোতে থাকো, আমি ততক্ষণ তোমার কোলে মাথা দিয়ে একটু শুয়ে পড়ি। তোমার কোলটা ভারী নরম।"

নীরা হাসতে হাসতে পা ছড়িয়ে বসলো, তার কোলে মাথা রেখে রঞ্জন লম্বা হ'য়ে শুয়ে পড়লো। বেশিক্ষণ চুপ ক'রে শুয়ে সে থাকতে পারলে না। মাথাটা একবার তুলে বললে—"ও কি, তোমার মুখটা যে মোটে দেখতেই পাচ্ছি না। অমন ক'রে তুমি আকাশের দিকে দেখলে চলবে কেন? তাহ'লে আমি বেচারা কি দেখবো? চশমাটা খুলে রেখে মুখটা আমার দিকে একবার নামিয়ে আনো তো দেখি!"

চশমা খুলে রেখে নীরা ওর মুখের খুবই কাছে নিজের মুখখানি নত করলে। রঞ্জন তখন ওর আরো কাছে মুখটা তুলে এনে আত্মহারা আবেগে দুহাত দিয়ে নীরার গলাটা জড়িয়ে ধরলে। একান্ত আগ্রহে উন্মুখ, চৈতন্য বিলোপকারী আসন্ন একটি চুম্বনের অবস্থা। হঠাৎ লতা-ঝোপের পিছন থেকে শোনা গেল নীরার তীব্র কণ্ঠস্বর। সে যেন বিদ্রূপ ক'রেই চেঁচিয়ে বললে—"সন্ধ্যা হ'য়ে আসছে, আর নয়। এবার উঠে পড়ুন। বাড়ি ফিরতে দেরী হলে বাবা ভীষণ ব্যস্ত হবেন।"

ওরা ধড়মড় ক'রে উঠে পড়লো। পথে যেতে যেতে নীরা বললে, বাগানে বেড়াতে এসে দূর থেকে সে ওদের দেখতে পেয়েছিল। তাই কাছে এসে ডাকলে। কিন্তু কথাটা তেমন বিশ্বাসযোগ্য নয়। লতার আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওদের সব কথাবার্তাগুলো সে শোনেনি তো! তাতে যদিও তেমন কিছু দোষ নেই, তবু দুজনেই একটু সন্ত্রস্ত হ'য়ে পড়লো।

সাত

কিছুকাল পরে একদিন চ্যাটার্জি সাহেব রঞ্জনকে হঠাৎ নিজের অফিসঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে একটা চেয়ার দেখিয়ে বললেন, বসো। নিজেও একটা চেয়ার নিয়ে বসলেন। পকেট থেকে দেশলাই বের ক'রে আগে একটা মোটা রকমের চুরোট ধরিয়ে নিলেন। তার পর দু একটা মৃদু মৃদু টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে খুব শান্তস্বরে বললেন—"শোনো রঞ্জন, তোমার নামে আজকাল অনেক রকমের গুরুতর বদনাম শুনছি।"

রঞ্জন স্তব্ধ হ'য়ে চুপ ক'রে রইল। এমন অতর্কিত আক্রমণ সে প্রত্যাশা করেনি।

চ্যাটার্জি সাহেব বললেন—"তোমার এ বিষয়ে কি বলবার আছে তাই আমি জানতে চাই।"

"কার কাছে কি রকমের বদনাম শুনেছেন সেটা আগে বলুন!"

"না, তা আমি বলবো না। বিশ্বাসী লোকের কাছেই শুনেছি। সামান্য চাকরবাকর যদি কেউ বলতো, তাহ'লে তাদের তখনই আমার বাড়ি থেকে দূর ক'রে দিতুম। তোমাকে আমি ভালোবাসি, আমার ঘরের ছেলের মতো মনে করি। সামান্য কথা হ'লে এটি নিয়ে তোমাকে আমি কিছু বলতুমই না। কিন্তু যা শুনেছি তা তোমার চরিত্র সম্বন্ধে ভয়ানক নিন্দাসূচক কথা।"

"আপনি যা শুনেছেন তা হয়তো একেবারে মিথ্যে বাজে হ'তে পারে।"

"তোমাকে আমি খুব ভালো ছেলে বলেই এতদিন জানতুম। কিন্তু যা শুনেছি তা যদি একটুও সত্যি হয়, তাহ'লে আজ থেকে আমার বাড়িতে তোমার মাথা গলানোই আর উচিত নয়। এটা যে একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের বাড়ি, তা বোধহয় তোমাকে বুঝিয়ে বলবার দরকার হবে না।"

"আপনি চলে যেতে বলেন, এখনই আমি চলে যাচ্ছি। কিন্তু আমার কোনো খারাপ উদ্দেশ্য নেই। নীরাকে আমি একদিন প্রকাশ্যভাবেই বিয়ে করতে চাই।"

"বিয়ে? সেটা তো খুব ভালো কথা। তোমার তাহ'লে সত্যিকার মরাল কারেজ আছে বলতে হবে। কিন্তু তাহ'লে এর অনেক আগে স্পষ্ট ক'রে আমার কাছে সেটা প্রপোজ করাই তোমার উচিত ছিল। তা ছাড়া তুমি কোন জাতের ছেলে, তোমার বাপের নাম কি, নিবাস কোথায়, কত টাকা তিনি উপায় করেন, সমাজে তাঁর মানসম্ভ্রম কেমন, ইত্যাদি এই সব কথা আগেই আমাকে জানানো উচিত। তাও কি তোমার মাথায় ঢোকেনি? এসব কোনো কথা না জানিয়েই তুমি অমনি বিয়ের ব্যবস্থা ক'রে ফেললে, আর আমার মেয়েটির মাথা একেবারে বিগড়ে দিলে?"

"ও সমস্ত খবর না জেনেও আপনি কিন্তু এতকাল ধরে আমাকে ঘরের ছেলের মতোই স্নেহ করেছেন। মেয়েদের সঙ্গে অবাধে মিশতে দিয়েছেন। আমাকে আপনি যথেষ্টই চেনেন। আর আজ আমি যখন এতটা সাহস ক'রে আপনার মেয়েকে বিয়ে করতে চাইছি, তখন বুঝতেই পারছেন যে সে অধিকার আমি ইতিমধ্যে অর্জন করেছি।"

"না হে বাপু, তা হয় না। তোমার সঙ্গে আমি এই নিয়ে মিছে তর্ক করতে চাই না। এখন এ বাড়িতে আর এসো না। আগে

ভালো ক'রে প্রমাণ করো যে তুমি সকল বিষয়ে উপযুক্ত, তখন না হয় এ বিষয়ে ভাবা যাবে।"

"আপনি তো মোটের ওপর এইটুকু জানতে চান, যে তেমন টাকাকড়ির সঙ্গতি আমার আছে কিনা? অন্তত সে বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। যদিও আমি এখনো কলেজে পড়ি, কিন্তু আমার অনেক বিষয়সম্পত্তি আছে, সমস্তই আমার নিজের নামে। ব্যাংকে অনেক টাকাও আমার নিজেরই নামে জমা করা আছে। আমার ব্যাংকের খাতাটাও আপনাকে খুলে দেখাতে পারি। আর ধীরার নিজের এতে সম্মতি আছে কিনা, তাও আপনি তার কাছেই সোজাসুজি জেনে নিতে পারেন।"

"আমার সঙ্গে তুমি বাজে তর্ক করো না রঞ্জন। তুমি নিশ্চয় জানো যে বিয়ের ব্যাপারে পরিচয়টাই সামাজিক লোকে আগে জানতে চায়। তুমি তো সেইটেই এখনো বলতে পারছো না, আর তা হয়তো পারবেও না।"

"আমার নিজের সম্বন্ধে সব কথাই আমি আপনাকে বলেছি। কিন্তু সামাজিক পরিচয় কিংবা বাপ মার পরিচয় সম্বন্ধে এখন আপাতত কোনো কথাই আমি বলবো না। মিথ্যে কথাও যাহোক একটা বলতে পারতুম, কিন্তু তাও বলতে চাইনা। তবে এই পর্যন্তই শুধু বলতে পারি, বাপ মাকে আমি ছেড়ে চলে এসেছি, তাদের সঙ্গে আমার সমস্ত সম্পর্কই প্রায় চুকে গেছে। বিয়ে করলে স্ত্রীকে আমি নিজের কাছে আলাদা ভাবেই রাখবো। তাকে আমার বাপ মায়ের ঘরে কখনো ঢুকতে হবে না। ধরে নিন যে আমি নিজেই আমার একমাত্র পরিচয়। যেমন আমাকে দেখছেন, মনে করুন যে এ ছাড়া কোনো পরিচয়ই আমার এখন নেই।"

"ওহে বাপু, সবই আমি বুঝতে পেরেছি। মানে মানে এখান থেকে এই বেলা সরে পড়ো। আর আমার কিছুই পরিচয় জানবার কৌতূহল নেই।"

"আমাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে বিশেষ কোনো লাভ হবে না। আপনি হয়তো এখনও বুঝতে পারছেন না, কিন্তু আমাদের দুজনের যে স্থায়ী সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে তাতে ছাড়াছাড়ি হওয়া অসম্ভব। আমরা দু'জনে এখন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এখন কেউ কাউকেই ছাড়তে পারিনা। আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিলেই সেই সঙ্গে মীরাকেও তাড়িয়ে দেওয়া হবে।"

"তাই নাকি? আমার সঙ্গে চালাকি পেয়েছো? তোমার মতো অমন কত পাজি বদমাইস জুয়াচোরকে আমি চরিয়ে খাই। তুমি এমনিতেই বিদেয় হবে, না দরোয়ান ডাকতে হবে? একটা পেনলেস্ ভ্যাগাবণ্ড!"

"আপনি অমন রেগে উঠছেন কেন? যখন কথা বলবার জন্যে নিজেই আমাকে এখানে ডেকে এনেছেন, তখন আপনার যা কিছু বলবার আছে তা ঠাণ্ডা মাথায় বলুন, আমার যা কিছু বলবার আছে তাও ঠাণ্ডা মাথায় শুনে নিন।"

"তোমার আবার বলবার কি আছে হে ছোকরা? কু মতলবের আবার কৈফিয়ৎ কি আছে?"

"অনেক কথাই বলবার ছিল, কিন্তু আপনি কিছুই বলতে দিচ্ছেন না। একটা সোজা কথাই আপনাকে জিজ্ঞাসা করি। দুজন পরিণত বয়সের ছেলেমেয়ে নিজেরা পছন্দ ক'রে একসঙ্গে মিলে যদি আনন্দে জীবনটা কাটাতে ইচ্ছে করে, তাহ'লে আপনি তাদের বাধা দিতে যাবেন কোন কারণে? নাই বা হলো সামাজিক বিয়ে, আমাদের

ছুকনকে এমনিই আপনি ছেড়ে দিয়ে দেখুন না কি হয়। ছুকনেই যখন আন্তরিক ভাবে এটা চাইছি, তখন কি আপনার কাছে তার কোনোই দাম নেই?"

"কিছুই না। আন্তরিক কাকে বলো? অন্তর তোমার আছে নাকি? যাও যাও তুমি চলে যাও, আমার অনেক কাজ আছে।"

"আচ্ছা আরো একটা দিক দিয়ে আপনি একটু ভেবে দেখুন। মনে করুন জাতের মিলটিল না থাকা সত্তেও প্রথম বয়সে আপনারই যদি ঠিক আমার মতো একটা এমনি ব্যাপার ঘটতো, তাহ'লে আপনি নিজে তখন কি করতেন? উত্তেজিত হয়ে বলবেন না, ঠাণ্ডা মাথায় ঠিক করে ভেবে বলুন।"

"ঠাণ্ডা মাথা আমার বরাবরই আছে। আমি যখন বাপ হয়েছি— তখন বাপের দিকটাই আগে ভাববো, তোমার মতো ছোঁ মারা ছিঁচকে চোরের দিকটা নয়। যে মেয়ে আমার সব চেয়ে প্রিয়, তার জীবনটাকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে নষ্ট করতে আমি কখনো কাউকে দিতে পারি না। বুঝলে? তুমি আমার বাড়ি থেকে এখন যাবে কিনা তাই আমি জানতে চাই। নির্লজ্জতারও একটা সীমা আছে। এর পরে আর কিন্তু আমার ধৈর্য থাকবে না।"

"বেশ তবে চলেই যাচ্ছি। আপনার সম্মতি না পেলেও কোনো আর ক্ষতি নেই। আমাদের নিজেদের ব্যবস্থা এখন নিজেদেরই ক'রে নিতে হবে।"

"নিজেদের বোলো না। নিজ কোথাকার, তোমার নিজের বলো। যাও তুমি, দূর হ'য়ে যাও।" রাগে মুখখানা ফুলিয়ে চ্যাটার্জি সাহেব ঘন ঘন হাঁপাতে লাগলেন।

"বাবা, এ তুমি অন্যায় করলে। বাধ্য হয়ে এখন আমাকেও এই বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে হবে।"

চ্যাটার্জি সাহেব বোঁ করে ঘুরে পিছন ফিরে চেয়ে দেখলেন, দরজাটা ফাঁক ক'রে ধীরা কখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। তার পিছনে দেখা যাচ্ছে ছোট মেয়ে নীরাকেও। জোর গলাতে ওদের দুজনের কথা কাটাকাটির আওয়াজ শুনে মেয়েরা দুজনেই কিছুক্ষণ আগে দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। শেষের কথাগুলো শুনে আর চুপ ক'রে থাকতে না পেরে ধীরা দরজা ফাঁক করে ঢুকে পড়েছে।"

ধীরাকে ভিতরে আসতে দেখেই উনি ক্ষেপে উঠেছিলেন, তার উপরে এমন অপমানজনক কথা তার মুখে শুনে আরো একেবারে ক্ষেপে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ লাফিয়ে উঠে বসবার চেয়ারখানা ছুঁড়ে ফেলে টেবিল চাপড়ে গলার শির ফুলিয়ে চীৎকার ক'রে বললেন—"কি, কি বললি? এত বড়ো"—

"হাঁ বাবা, আমি এখনই ওর সঙ্গে চলে যাচ্ছি।"

"যাচ্ছিস? আমার মুখের ওপর বললি, তুই চলে যাচ্ছিস? এত বড়ো তোর—আচ্ছা তা বেশ। যেতে যদি পারিস চলে যা।"

রঞ্জন একটু দুঃখের হাসি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। ধীরাও যেমন এসেছিল তেমনি অবস্থায় তার পিছু পিছু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জানলা দিয়ে দেখা গেল, ওরা ফটক পার হ'য়ে সদর রাস্তায় গিয়ে পড়লো।

ঠোঁট কামড়ে নীরা সেই ঘরের চৌকাঠের কাছে তেমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল।

আট

প্রায় বছর খানেক পরের কথা। রঞ্জন এখন বি. এ. পাশ ক'রে ইউনিভার্সিটিতে এম এ. পড়ছে। ধীরা কলেজে ফোর্থ ইয়ারে পড়ছে, শীগ্‌গিরই পরীক্ষা দেবে। ভবানীপুর অঞ্চলেই এলগিন রোডের কাছাকাছি 'সেন্ট্রাল নুক' ব'লে সাইনবোর্ড দেওয়া একটি আধুনিক ধরণের বাঙালী হোটেলে রাস্তার দিকের একখানা দোতলা ঘর ভাড়া নিয়ে ওরা দুজনে একত্রে বাস করছে।

জায়গাটা হিন্দু পাড়ার মধ্যে, ধীরার কলেজের খুব কাছাকাছি। হোটেলটি ঠিক বড়ো রাস্তার ওপর নয়, একটা সরু গলির মোড়ের কাছে। হোটেলের দুই পাশে মাথায় ঝুঁটি বাঁধা শিখ পাঞ্জাবীদের দোকান। তারা সারা দুপুর খট্ খট্ ক'রে স্প্রিং মেশিন চালিয়ে মোটা মোটা ক্যাম্বিশের জোড়া লাগিয়ে মোটর গাড়ির হুড তৈরি করে। তারই পাশাপাশি কাঁসারিদের কয়েকটা ছোটো বড়ো বাসন তৈরির কারখানা। তাদেরও অধ্যবসায় নিতান্ত কম নয়, চব্বিশ ঘণ্টা হাপর জেলে হাতুড়ি পিটে তারা বাসন গড়ে, আর শান পালিশের চাকা ঘুরিয়ে প্রচণ্ড ঘর্ ঘর্ শব্দে সেই বাসন পালিশ করে। মাঝে মাঝে এই সব দোকান, আর মাঝে মাঝে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের বাস করবার মতো দোতলা তিনতলা ভাড়া বাড়ি।

পাড়াটা অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রব আর নির্জন। কদাচিৎ দু'একটা রিক্‌শ গাড়ি ছাড়া দ্রুতগামী কোনো যানবাহন বড়ো একটা সেখান দিয়ে যাতায়াত করে না। পাড়ার ছেলেরা স্বচ্ছন্দে পথের ওপরেই ফুটবল খেলে আর থেকে থেকে 'গোল, গোল' ব'লে হট্টগোল করে। মোটের

ওপর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফাঁকা জায়গা, উত্তর বা অন্য কলকাতার মতো ঘিঞ্জি কিংবা নোংরা নয়। গ্রীষ্মকালে কেবল দক্ষিণা বাতাস অবাধ গতিতে উড়ে এসে ঘরদোর কিচকিচে ধুলোয় ভরে দিয়ে যায়। উত্তর দিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে বড় বড় প্রাসাদের মতো অট্টালিকা বাড়ি দেখা যায়। তার মাঝে মাঝে বিস্তর ফাঁক। সেই ফাঁক দিয়ে গড়ের মাঠের প্রান্তসীমার সবুজ গাছগুলোকে বাতাসের তালে মাথা নাড়তে দেখা যায়। পথের ধারের কৃষ্ণচূড়া গাছের লাল ফুলগুলোও সেই সঙ্গে তালে তালে দোল খেতে থাকে।

পাড়ার মধ্যে কেউ কারো তেমন খোঁজখবর রাখেনা। হোটেলের মধ্যেও অনেকটা তাই। পরম নিশ্চিন্তে ওরা সেখানে নব বিবাহিত দুই স্বামী স্ত্রী 'সেন্টার স্যুটের' ঐ দোতলা ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। হিন্দুমতেই ওরা বিয়ে করেছে, অর্থাৎ নিজেদেরই মনগড়া হিন্দুমতে। রূপেন আর পরেশ গম্ভীরভাবে অনেক বিচার বিবেচনা ক'রে বলেছিল যে আর্য সমাজে নাম লিখিয়ে বিয়ে করলেই সেটা আইনসঙ্গত কাজ হবে। কিন্তু রঞ্জন বললে যে সে আইনের কোনো ধার ধারেনা। দুজনের সম্মিলিত ইচ্ছায় যে বিয়ে তা কখনো বে-আইনি হয় না। দেবতা আর মানুষকে সাক্ষী রেখে ওরা সেই বিয়েকে কেবল পাকা করে নেবে। একদিন রূপেন আর পরেশকে সঙ্গে নিয়ে ওরা কালী-ঘাটে গেল। দুজনে হাত ধরাধরি ক'রে দাঁড়িয়ে কালী ঠাকুরকে প্রণাম করলে। রূপেন আর পরেশের সামনে রঞ্জন সেখানেই মীরার সিঁথিতে সিঁদুর পরিয়ে দিলে। তার পর দুই বন্ধুকে হোটেলে এনে প্রচুর লুচি মাংস আর রাবড়ি সন্দেশ খাইয়ে দিলে। বলা বাহুল্য হোটেলের ম্যানেজারই এ সমস্ত ব্যবস্থা করেছিল। রঞ্জন নিজের খরচে ম্যানেজারকে আর হোটেলের কয়েকজন বামুন চাকরকেও পেট ভরে

খুশি মনে খাইয়ে দিলে। মোর মাণ্ডবি থেকে বিস্তর ফুলের গয়না কিনে এনে রাবিয়াকে পরিয়ে সেই রাত্রে ওদের ফুলশয্যা হলো।

সমাজের বাধাকে অগ্রাহ্য ক'রে দুজনে মিলে অনাবিল আনন্দে জীবনযাপনের জন্যে ওরা বদ্ধপরিকর হয়েছে। হস্টেল ছেড়ে দিলেও হুসেন বাগবাড়ির বাড়ির সবাইকে বলে এসেছে যে এখনও সে হস্টেলেই থাকে। এখন আর ছুটির দিনেও সে বাড়ি যেতে পারেনা, সপ্তাহের মধ্যে যেদিন ক্লাস কম থাকে সেদিন একবার সেখানে গিয়ে তাড়াতাড়ি দু'চার ঘন্টার জন্যে ঘুরে আসে। বাড়ি গেলেই সে রাবিয়া বিবির জন্যে পুঁটিরামের দোকানের ভালো ভালো তালশাঁস সন্দেশ কিনে নিয়ে যায়। রাবিয়া বিবি বাতে ভুগে মাছ মাংস খাওয়া ছেড়ে দিয়েছেন, মিষ্টিটা খেতেই এখন ভালোবাসেন। মিষ্টির প্রকাণ্ড চাঙারিটা হাতে তুলে দিয়ে রাবিয়া বিবিকে ও বলে—"আরো একটা বছর এমনি ক'রেই কাটাতে হবে। এম এ পাশ করা ভয়ানক শক্ত, ছুটির দিনেও মাষ্টারদের কাছে থেকে পড়তে হয়। তোমরা কেউ এখন আমাকে বিরক্ত কোরোনা, পাশ করা হ'য়ে গেলেই আমি এখানে চলে আসবো।" ফতিমা বিবির কাছে গিয়ে তাঁর কোলে মাথা দিয়ে সোজা শুয়ে পড়ে বলে —"মাথাটা একটু টিপে দাও তো ছোটো মা, আজ আমার মাথাটা কেমন ধরে গেছে। তুমি বোধ হয় ভাবছো যে আমি তোমাদের ফাঁকি দিচ্ছি, সত্যি কথাটা জানাচ্ছি না। কিন্তু সত্যিই বলছি বিশ্বাস করো যে আমি এম এ পড়ছি, আর সত্যিই আমার এখানে আসবার এখন একটুও ফুরসৎ নেই। আরো একটু কিছু খবর বলতে বাকি রইল বটে, কিন্তু সে কথা বলবার এখনও সময় হয়নি। যখন সময় হবে তখন নিশ্চয়ই বলবো। সে কথা শুনলে তুমি তখন খুব খুশি হবে, কিন্তু এখন শুনলে তা হবে না।"

বুড়ো দোকান মিঞা ছুটি নিয়ে হজ্ করতে যাবার জন্যে খুবই উৎসুক। ও তাকে এক শিশি গুলাবের আতর উপহার দিয়ে বলে—"আরও একটা বছর চেপে যাও চাচা, শেষ এগ্জামিনটা আমাকে পাশ করতে দাও। তার পরে নিশ্চয় তোমাকে ছুটি দিয়ে দেবো।"

এদিকে হোটেলের ঐ একটি মাত্র ঘরের মধ্যে দীপা আর রঞ্জন নিজেদের মনের মতো ক'রে পরিচ্ছন্ন একখানি নীড় নির্মাণ ক'রে নিয়েছে। ঘরখানা সৌভাগ্যক্রমে চওড়ায় না হ'লেও লম্বায় বেশ বড়ো, বুদ্ধি খাটাতে পারলে ঐ একটা ঘরকে তিন ভাগেও ভাগ করা যায়। বুদ্ধি খাটিয়ে তাই ওরা ক'রে নিয়েছে। চীনে কারিকরদের লাগিয়ে ঐ ঘরের মধ্যে এমন দুটি পাতলা কাঠের পার্টিশন ক'রে নিয়েছে, যাতে ঘরজোড়া হ'য়ে ঠাসাঠাসি মতোও দেখায় না, অথচ বন্ধু-বান্ধব এলে তারা বসবার ঘরে বসে শোবার ঘরটাও সামনে দেখতে পায় না, কিংবা তার একপাশে বাথরুমের দিকে ছোট্টো টয়লেট আর ড্রেসিং ক্যাবিনেটটাও দেখতে পায় না। অথচ সবগুলো মিলে একটাই ঘর, অবাধে যাওয়া আসা করা চলে। শুধু যতটুকু দরকার পার্টিশন দেওয়া। সেই পার্টিশনও যেন শৌখিন আসবাবের মতো। কিউরিওর দোকান ঘুরে ঘুরে ওরা ভালো ভালো ছবি আঁকা বাগশই পর্দা কিনে এনে সেগুলোর চারিদিকে চওড়া রঙীন পাড় বসিয়ে এমন কায়দায় এঁটে দিয়েছে যে দেখলেই মনে হয়, দেয়ালে আঁটা বর্ডার দেওয়া ফ্রেস্কো। ছবিগুলোও তেমনি বিচিত্র, তিব্বতের আঁকা অপরূপ বুদ্ধলীলা, চীনের আঁকা অদ্ভুত ড্রাগন, আরো কত কি।

ফার্নিচারগুলিও বিচিত্র। কতকটা যেন ঠাকুরবাড়ি প্যাটার্নে'র, কতকটা যেন বিকানীর প্যাটার্নে'র। গালার রংচং লাগানো কাঠের নিচু নিচু চৌকি টেবিল, তেমনি ধরণের সোফা সেটি। সবই ছোটো

বাইরের দরদালানই, খুব কমই জায়গা জোড়ে। সবই সাদাসাপ্‌টা চটের মতো মোটা কাপড় দিয়ে মোড়া। অর্থাৎ আরামের সব ব্যবস্থা আছে, কিন্তু অনাবশ্যক বাহুল্য নেই। একটা বেশ সোফা আছে, কিন্তু জমক জৌলুস নেই। দেয়ালগুলো সাদা চুনকামে ধব্‌ধব্‌ করছে। সেখানে একটা ঘড়ি টাঙানো আছে, একটা ক্যালেণ্ডারও ঝুলছে। — বসবার ঘরে ভারতবর্ষের একটা ম্যাপ। কিন্তু ফ্রেমে বাঁধা একটাও জমকালো ছবি নেই। একটাও বাড়তি আয়না নেই। এখানে ওখানে জড়ো করা আলনাভরা কাপড়চোপড় নেই। বাতাস-বন্ধকরা বড়ো বড়ো আলমারি নেই। এ সব যা কিছু আছে সেই আড়াল দেওয়া প্রসাধনের ঘরটিতে। মেঝেতে চিকন কাঠির মাদুর পাতা। বসবার ঘরের দুপাশে দুটি ছোটো ছোটো টেবিল আর শক্ত কাঠের চেয়ার, ওদের দুজনের পড়বার জন্যে। রঞ্জনের টেবিলে সেই পুরোনো বুদ্ধমূর্তিটা, আর ধীরার টেবিলে রবীন্দ্রনাথের একটি মূর্তি। এক পাশে কাঠের র‍্যাকে থরে থরে অনেক বই সাজানো।

ওরা ঐ পাড়া থেকেই একটি মনের মতো ছোকরা চাকর সংগ্রহ করে নিয়েছে। তার নাম বঁচো, ধীরা প্রায়ই তাকে ঠাট্টা ক'রে ছুঁচো বলে ডাকে। তার মা ঐ হোটেলেই ঝিএর কাজ করে। ছেলেটি বেশ চটপটে, আর সব সময়েই সুপ্রতিভ হাসি হাসি মুখ। তাকে রাখা হয়েছে ওদের টুকিটাকি ফাইফরমাস খাটবার জন্যে, আর ওরা দুজনে যখন কলেজ চলে যায় তখন ঘরের খবরদারি করবার জন্যে। ছেলেটিরও আবদারের সীমা নেই, আর ধীরারও তাকে আদর দেবার অন্ত নেই। বাবুদের মতো সেও দিব্যি ধব্‌ধবে কাপড়জামা পরে থাকে, গায়ে রোজ সাবান মাখে, বাহার ক'রে টেরি কাটে, আর দুবেলা চা পাউরুটি মাখন

ভেজি কলাইমুড়ির ভাগ পায়। হোটেলের চাকরেরা ঈর্ষা ক'রে বলে, তুই খুব চালে আছিস।

ওরা আবার পশমের তৈরি পুতুলের মতো ছোট্টো একটি কুকুর পুষেছে। তারও আবদার বড়ো কম নয়। সে দুধ খায়, মাংস খায়, আর অসংকোচে সোফার ওপর চড়ে তোফা আরামে শুয়ে থাকে। ঘরের সুমুখেই রাস্তার ধারের বারান্দা, অনেক সময় তাকে সেইখানেই বেঁধে রাখা হয়। সেও ওদের অনুপস্থিতিতে ঘর পাহারা দেয়। ঘরের দরজার সুমুখে দৈবাৎ কেউ এসে দাঁড়ালে চেঁচিয়ে ডেকে অস্থির ক'রে তোলে।

হোটেলের অন্যান্য ঘরেও ভাড়াটেরা থাকে। অধিকাংশই তারা সস্ত্রীক বাস করে। বেশির ভাগই মফঃস্বলের বা ঢাকা অঞ্চলের লোক, স্বামীরা কলকাতায় থেকে চাকরি করে। পাশের ঘরের তেমনি এক ভদ্রলোকের বৌএর সঙ্গে শীলা ভাব ক'রে নিয়েছে। সে বৌটি খুব রোগা কিন্তু দেখতে বেশ সুন্দর। কপালে প্রকাণ্ড একটা সিঁদুরের ফোঁটা দেয়, হাতে চুড়ির সঙ্গে সাদা শাঁখা পরে, আর খুব শুদ্ধ ভাষাতে অল্প একটু পূর্ববঙ্গীয় টান দিয়ে বেশ মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে। বৌটির লজ্জা সরম একটু কম, স্বামী ঘরে উপস্থিত থাকলেও সটান ঘরের মধ্যে চ'লে আসে, একটু আড়ালে শীলাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে তার সঙ্গে কথা বলে। বৌটির এখনো ছেলেপুলে হয়নি, নিজের ঘরে বসে নিঃসঙ্গ জীবন যাপন করা তার পক্ষে অসহ্য। রান্নাবান্নাও করতে হয় না, হোটেল থেকেই সমস্ত খাবার সরবরাহ হয়। একলা বসে বসে বই পড়তেও আর ভালো লাগে না। সে তাই একটু সমজাতীয় মানুষের সঙ্গ খোঁজে। কিন্তু ভালোমতে শীলার সঙ্গে আলাপটাও জমাতে পারে

না। হয় এসে দেখে দু'জনে পড়ছে, কিংবা দেখে দুজনে পাশা-পাশি বসে আছে। অনেক সময়েই মনঃক্ষুণ্ণ হয়ে তাকে ফিরে যেতে হয়।

ওরা দুজনে নিজেদের পড়াশুনো নিয়ে খানিকক্ষণ পর্যন্ত ব্যস্ত থাকে, কিন্তু তার পরে পরস্পরের মধুর সাহচর্যেই বাকি সময়টা মশগুল হ'য়ে থাকে। এই তো ওরা চেয়েছিল, সারাক্ষণই দুজনে কাছে কাছে থাকবে। দিনান্তে একবারও কেউ কারো কাছছাড়া হবে না, রাত্রেও ঘুমোবে গায়ে গায়ে পাশাপাশি। ঘুম ভেঙে চোখ খুলে চাইলেই প্রথমে আকাঙ্খিত মানুষটিকে দেখা যাবে, হাত বাড়ালেই তার দেহের স্পর্শ পাওয়া যাবে। কাব্যে নাকি বলে যে মিলনকে আরো মধুর করে বিরহ। কিন্তু ওরা বলে যে দরকার নেই আমাদের তেমন প্রাণ-বের-করা মাধুর্যের। ছাড়াছাড়ি হ'য়ে এক দণ্ডও ওরা থাকতে রাজি নয়। রঞ্জনের প্রায়ই আগে ছুটি হয়, সেদিন সে বীথার কলেজের কাছে এসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। বীথার ছুটি হ'লে ঐটুকু রাস্তা দুজনে মিলে একসঙ্গে বাসায় ফেরে। সন্ধ্যায় সময় দুজনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের দিকে একটু বেড়াতে যায়। কোনো কোনো দিন একসঙ্গে সিনেমাও দেখতে যায়।

ওদের নব বিবাহিত জীবনে নিত্য নতুন নতুন প্রেমের লীলা চলতে থাকে। দুজনেই দুজনের সামান্য খুঁটিনাটি দুর্বলতা নিয়ে পরস্পরকে উত্ত্যক্ত করে। সে যেন এক রকমের কৌতুক, ওদের তাতে ভারী মজা লাগে।

খুব ভোরে উঠেই বীথা ইলেকট্রিক স্টোভ জেলে এক দফা চা তৈরি করে। গরমচাএর পেয়ালা নিয়ে গিয়ে সে রঞ্জনকে ডাকে—"আর ঘুমোতে হবে না গো মশাই, চেয়ে দেখো, তোমার জন্তে

চা তৈরি ক'রে এনেছি।" রঞ্জন বলে—"এখন আমি চোখ খুলতে পারবো না, ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই যদি খাইয়ে দিতে পারো তো খাবো। তুমি সসারে ঢেলে চাটা বরং আমার মুখের কাছে ধরো।" ধীরা অগত্যা তাই করে। রঞ্জন উবুড় হ'য়ে চোখ বুজে চা খায়। তার পরে বলে—"পেয়ালাটা রেখে বিছানায় সটান চলে এসো। চুপচাপ আমার পাশে একটু শুয়ে পড়ো।" ধীরা বলে—"ও মা সে কি, বেলা যে অনেক হ'য়ে গেছে, এখন যে আমি স্নান করতে যাবো।" রঞ্জন বলে—"সে তো রোজই হচ্ছে। আজ হবে অন্য রকম। আজ আর কলেজ টলেজ গিয়ে কাজ নেই। সকাল বেলা বাসি-মুখে একসঙ্গে বিছানায় শুয়ে থাকলে কেমন লাগে তারই আজ এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে।" এই বলে সে প্রতিবাদের অবসর না দিয়ে ধীরার হাত ধরে জোর ক'রে নিজের পাশে শুইয়ে দেয়। ছটফট করলে আরো জোরে তাকে চেপে ধরে থাকে। কলেজ যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'তে দেরী হয়ে যাচ্ছে দেখে ধীরা ছটফট করতে থাকে।

স্নান করতে যাবার সময় আবার একচোট হুড়োহুড়ি লাগে। ওদের সেই একটিমাত্র বাথরুম। টবের মধ্যে জল ভরে দেওয়া হয়, ওরা দুজনে সেই জলেই ভাগাভাগি করে স্নান করে। আগে যায় ধীরা, তার পরে যায় রঞ্জন। বাথরুমের ভিতর দিকের ছিটকিনিটা যে ভেঙে গেছে, দুজনেই সেটা জানে। তবু যেন সেই কথাটা নতুন ক'রে মনে পড়িয়ে দিয়ে ধীরা বলে—"আমি স্নান করতে যাচ্ছি, দেখো যেন খুঁচো ওদিকে গিয়ে দরজাটা না ঠেলে।" খুঁচোর অবশ্য অমন সময় বাথরুমের দরজা ঠেলবার কোনোই প্রয়োজন নেই। কিন্তু একটু পরে স্বয়ং রঞ্জনই সেই দরজাটি ফাঁক ক'রে

উঁকি মারতে থাকে। বীরা অমনি ভিতর থেকে চেঁচিয়ে ওঠে—"এখন তুমি সরে যাও, ভালো হবেনা বলছি।" কিন্তু সে কথায় কোনো কান না দিয়ে রঞ্জন নির্ভীক নির্লজ্জের মতো দরজাটি ফাঁক ক'রে একেবারে সেই বাথরুমের মধ্যে সোজা ঢুকে পড়ে। বলে— "আমিও একটু চান করবো যে।" বীরা তাড়াতাড়ি পরিত্যক্ত কাপড় চোপড় যথাসাধ্য গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বলে—"তবে আমি বেরিয়ে যাই, তুমিই আগে সেরে নাও।" রঞ্জন তাকে দুহাত দিয়ে জাপটে ধরে সাবানমাখা ভিজে কাপড় সমেত ধপ্ ক'রে সেখানে বসিয়ে দিয়ে বলে—"দুজনে একসঙ্গেই চান করি এসো না, তাতেই বা দোষ কি!" বলেই তাড়াতাড়ি এক মগ জল নিয়ে বীরার চোখে মুখে ঝাপটা মারতে শুরু ক'রে দেয়। কখনো বা সশরীরে তুলে নিয়ে গিয়ে সেই জলের টবের মধ্যে জোর ক'রে ডুবিয়ে দেয়। কোন দিক সামলাবে ঠিক করতে না পেরে বীরা তখন যেন হাঁপিয়ে ওঠে।

বেড়াতে যাবার আগে আবার এক দফা গণ্ডগোল। বীরা যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে জামা জ্যাকেট প্রভৃতি পরবে, রঞ্জনের ঠিক সেই সময়েই চুল আঁচড়াবার তাগিদ পড়ে যাবে। বীরা ওর জন্যে যতক্ষণই অপেক্ষা করুক, কিছুতেই ওর চুল আঁচড়ানো আর যেন শেষ হবে না। একবার একটু সরে যেতে বললেও ও তখন তাতে কর্ণপাত মাত্র করবে না। বাধ্য হয়েই শাড়িটার আড়াল দিয়ে কোনোগতিকে জামাগুলো বীরাকে পরে নিতে হয়। কিন্তু তেমন [illegible] কাপড়ের আড়ালের কতটুকুই বা আবরু! যতবার তা বিস্রস্ত হ'য়ে যায় ততবারই রঞ্জন আয়নার ভেতর থেকে চোখ বড়ো ক'রে মুচ্‌কে মুচ্‌কে হাসতে থাকে।

একজন লজ্জার শালীনতা বজায় রাখতে চায়, আর একজন

ক্ষয় নির্লজ্জতা দিয়ে সেটাকে ভেঙে তছনছ ক'রে দিতে চায়। লজ্জার দৈহিক আড়ম্বর দেখলেই অপর পক্ষের নির্লজ্জতা আরো বেশি দুর্বার হ'য়ে ওঠে, আবার নির্লজ্জতার সেই দুরন্তপনা দেখে নারীসুলভ লজ্জার রক্ষণশীলতা যেন নতুন ক'রে আরো বেড়ে ওঠে। লজ্জা আর নির্লজ্জতার এই যে চিরন্তন লুকোচুরি লীলা, এ কখনই অনাবিল আনন্দের হয় না, যদি দুই পক্ষ থেকেই অন্তরে অন্তরে এই লীলার সঙ্গে সায় দিয়ে যাবার গোপন বাসনাটুকু না থাকে।

রঞ্জনের মনটি এখন কানায় কানায় ভরা। সে ভাবে, জ্ঞানলাভের পর থেকেই মুক্তপ্রাণ মানবতার ক্ষেত্রে যে গণ্ডীবিহীন উদার স্বাধীনতা সে একান্তমনে কামনা ক'রে এসেছিল, আজ এতদিন পরে ঠিক সেই দিক দিয়েই সে সফল হ'তে পেরেছে। রঞ্জন আর রমজানের মধ্যে যে অবিরাম দ্বন্দ্ব এতকাল পর্যন্ত কোনোমতেই মেটাতে পারা যাচ্ছিল না, এই সহজ দাম্পত্য প্রেম এসে তাকে অতি সহজেই মিটিয়ে দিলে,—বোধ হয় চিরদিনের জন্যেই মিটিয়ে দিলে। এখন আর ও রমজান নেই, সম্পূর্ণ ভাবেই রঞ্জন হ'য়ে গেছে। এই প্রেমই বুঝি তবে সব কিছুর মীমাংসার একমাত্র মন্ত্র। এই সহজ প্রেম মানুষের বংশ পরিচয়ের ধার ধারে না, তার শুধু আত্মগত মূল্যটাকেই যাচাই করে। তার জন্য কোনো অতীত কিংবা ভবিষ্যৎ সত্তার ওপর নির্ভর করবারও দরকার হয় না, নিছক বর্তমানতাই তার পরিবাহনের পক্ষে যথেষ্ট। মীরার সেই সহজ প্রেম ওর সমস্ত ইতিহাসকে এখন লুপ্ত ক'রে দিয়েছে, ওর মনোগত সংকীর্ণ সম্প্রদায়পীড়াকে আরোগ্য ক'রে দিয়েছে। যে ইতিহাস পূর্ব জীবনের, এই মীরাসম্পর্কিত যুগে তার কোনো অর্থই নেই। সে কথা আর উত্থাপন না করলেও চলবে। মীরা ওর সঙ্গে চ'লে এসে যে মর্যাদায় ওকে ভ'রে দিয়েছে,

সেই পরম মানবমর্যাদাই হলো ওর পাথেয়। এই নিয়ে ও সারা জীবনের দুর্গম পথটা অনায়াসে অতিক্রম করে যাবে। ধীরাই ওকে অলংকীর্ণ অকৃত্রিম মনুষ্যজগতের মধ্যে নিঃসংকোচে ঢুকে পড়বার আসল পথটা দেখিয়ে দিলে।

ধীরার মনটিও কানায় কানায় ভরা। তার যে পরম প্রিয়, সেই তাকে পরম প্রিয় ব'লে সাদরে মাথায় তুলে নিয়েছে। অন্য সব কিছু পার্থিব সম্পর্কই সে ত্যাগ করেছে, সংসারের সব কিছু বাঁধন কেটে দিয়ে শুধু ওকে নিয়েই পরম তৃপ্তিতে বাস করছে। এর চেয়ে বেশি আর কি সে চায়? কতটুকুই সে আশা করেছিল, তার চেয়ে কত বেশিই পেয়ে গেছে! ঝোঁকের মাথায় বাপের আশ্রয় ত্যাগ ক'রে আসবার পরেই ওর ভাবনা হয়েছিল, হয়তো অনেক রকমের কষ্ট সহ্য করতে হবে। হয়তো টাকাকড়ির টানাটানি পড়বে, হয়তো নিজেকেই রান্না ক'রে পর্যন্ত খেতে হবে। এই সমস্ত ভেবে ওর কান্না পেয়ে গিয়েছিল। কিন্তু একদিনের জন্যেও ওকে কিছুমাত্র কষ্ট পেতে হয়নি। রঞ্জনের এই হোটেলের ম্যানেজারের সঙ্গে আলাপ ছিল, প্রথম দিনেই ওরা এখানে এসে উঠেছিল। কিছু বেশি ভাড়া দিয়ে চমৎকার একটি ঘর পেয়ে গেল, যথেষ্ট অর্থব্যয় ক'রে তাড়াতাড়ি ঘরটিকে রঞ্জন মনের মতো ক'রে সাজিয়ে ফেলল। এখানে ওর সুখ সুবিধার কিছু অভাব নেই। যখন যা চায় তাই পেয়ে যায়। এমন কি ওর শৌখিন জিনিসপত্রের শখগুলোও অবলীলাক্রমে মিটে যায়। মেয়েরা স্বভাবতই একটু বস্তুবিলাসী, একটু বস্ত্রবিলাসী, আর অলঙ্কারপ্রিয় হয়। সেদিক দিয়েও রঞ্জনের কোনো কার্পণ্য নেই। সে ওকে একটি শৌখিন হাতঘড়ি কিনে দিয়েছে, নতুন ডিজাইনের মেট্রো প্যাটার্ন একটা সোনার মাফচেন উপহার দিয়েছে। ছাপানো রেশমি

কাপড়জামা বিস্তর কেনা হয়েছে রংবেরংএর। কিন্তু এ তো গেল বাইরের সম্পদের দিক দিয়ে। অন্তরের সম্পদের দিক দিয়েও সে বঞ্চিত হয়নি; পেয়েছে। বনিতাকে কেমন করে খুশি করতে হয়, রঞ্জন তা জানে। সংসার খরচের ব্যবস্থাটা সে ওর হাতেই ছেড়ে দেয়, অনাবশ্যক বেশি খরচ হ'য়ে গেলেও বিশেষ কিছু বলে না। সকল বিষয়েই অনাবশ্যক প্রভুত্ব ফলাতে যায় না। সে ওর নারীসুলভ দায়িত্ব জ্ঞানের মর্যাদাটুকু বোঝে, ওর ওপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে একটুও ইতস্তত করেনা। এইটুকুই মেয়েদের বিশেষ ক'রে কাম্য। কাজেই সুখে থাকবার পক্ষে কোনো দিক দিয়ে কোনো অসঙ্গতি নেই।

উভয় পক্ষের আত্মীয়-স্বজনের তরফ থেকে এ পর্যন্ত কিছু বাধাবিঘ্ন আসেনি। কিছুকাল যাবত ধীরার মনে মনে সে দিকের ভয়টাও ছিল। তবে চ্যাটার্জি সাহেবও এ পর্যন্ত ওদের কোনো খোঁজখবর করেন নি। আর রঞ্জন বলেছিলো, ওর নিজের বাড়ির লোকেরা জানেই না যে ও কোথায় থাকে।

কিন্তু ইদানিং নীরার সঙ্গে ওদের প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হ'তে লাগলো। নীরা পরীক্ষায় পাশ ক'রে এ-বছর ধীরাদের কলেজেই ভর্তি হলো। ধীরার সঙ্গে এক কলেজে পড়ে, সুতরাং দুই বোনে দেখা-সাক্ষাৎ হতেই থাকে। কিন্তু নীরা ওর দিদির সঙ্গে একটিও কথা বলতোনা। দেখা হ'লেও অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে যেতো। কেবল রঞ্জনের সঙ্গে কলেজের মোড়ে দেখা হলে পড়াশুনোর সম্পর্কে কিংবা নিতান্ত অবান্তরভাবে কচিৎ কখনো দু একটা কথার আলোচনা করতো।

একদিন রঞ্জন আপনা থেকেই নীরাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলে— "তুমি তোমার দিদির সঙ্গে একটিও কথা বলো না কেন? সে দুঃখ করছিল।"

নীরা বললে—"কি করবো বলুন, বাবা যে বারণ ক'রে দিয়েছেন। তিনি প্রথমে কিছুতেই আমাকে এই কলেজে ভর্তি হ'তে পর্যন্ত দিতে চাননি। বলেছিলেন যে দিদির ত্রিসীমানায় মধ্যে আমার যাওয়া চলবে না। যখন আমি কথা দিলাম যে দিদির কাছে আমি মোটেই ঘেঁষবো না, তখন তিনি রাজি হলেন। নইলে আমার তো খুবই ইচ্ছে হয় যে আপনারা কেমন ভাবে আছেন একবার গিয়ে দেখে শুনে আসি। চলুন না, একদিন আপনাদের বাসাটা দেখিয়ে আনবেন। বাবাকে সে কথা না জানালেই তো হলো।"

রঞ্জন যথাসময়ে এই কথা ধীরাকে বললে। ধীরা শুনে চুপ ক'রে রইল। এ কথায় কোনো জবাবই দিলেনা।

কিছুকাল পরে একদিন নীরা চাটার্জি সাহেবের কাছ থেকে একখানা চিঠি এনে হাজির করলে। সেটা সে রঞ্জনের হাতে দিয়ে বললে—"বাবাকে আমি আপনাদের কথা একদিন বলেছিলুম। বলেছিলুম যে আপনারা বেশ সুখেই আছেন। বাবা তাই শুনে নিজে ইচ্ছে ক'রেই এই চিঠিখানা লিখে দিলেন।"

চিঠির খামের ওপর ধীরার নাম। ভেতরে লেখা আছে—"তুমি ভালো আছো জেনে আমি কতকটা নিশ্চিন্ত, যদিও আমার মনে হয়না যে এমনি ভাবেই তুমি চিরকাল থাকতে পারবে। যদি কখনো নিজের ভুল বুঝতে পারো কিংবা যদি কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে চাও, তাহ'লে তোমার জন্তে আমার দরজা সর্ব সময়েই খোলা থাকবে। এইটুকু আমি তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই।"

চিঠিখানা পড়বার পরে ধীরা চুপ ক'রেই রইল। কোনো কথাই সে বললে না।

ই মজন জিজ্ঞাসা করলে—"বাবার চিঠি পড়ে অমন চুপ ক'রে রইলে যে ?"

বীরা বললে—"তুমি কি বিশ্বাস করো যে এটা বাবার নিজের দেওয়া চিঠি ? তাঁর নিজেরই হাতের লেখা যদিও বটে, কিন্তু আমি জানি, বাবা আমাকে এতই বেশি ভালোবাসেন যে নিজের মন থেকে কখনই তিনি আমাকে এমন চিঠি লিখতেন না। আমি আবার ফিরে যাই এইটেই যে তাঁর মনের একান্ত ইচ্ছে, আর সেটা যে আমিও ভালো রকমই বুঝি, এ সমস্তই তাঁর বেশ জানা আছে। সেটা আবার তিনি শুধু শুধু অকারণে চিঠিতে লিখে জানাবেন কেন ? অমন ক'রে যেচে আমাকে চিঠি লিখে এ সব কথা জানানো কি তাঁর পক্ষে দুর্বলতা প্রকাশ করা হয় না ? তিনি আমাদের দুই বোনের বিয়ে দিতে কখনই চাইতেন না। অন্তত আমাকে চিরকাল নিজের কাছে রাখাই ছিল তাঁর সংকল্প। আমি ফিরে গেলে তিনি সেদিক দিয়ে খুবই খুশি হবেন তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু সে কথা কি তিনি কখনো এমন ক'রে খুলে বলতে পারেন ? এ সব নিশ্চয়ই নীরার কাজ। সেই তাঁকে জোর ক'রে চিঠিখানা লিখিয়েছে। এখন তাঁর ঐ একটিমাত্র মেয়ে, সে কোনো উপরোধ করলে, তিনি তা ঠেলতে পারেন না।"

"না না, তাই কখনো হয় ? তুমি হয়তো ভুল বুঝছো। এতে নীরার কি এমন স্বার্থ আছে ?"

"আছে বৈকি ! তুমি ওর কিছু জানো না। ও অতি ভয়ানক মেয়ে। আমি যখনই যাই কিছু পাই, ওরও অমনি সেই জিনিসটি কেড়ে নেওয়া দরকার। যেমন ক'রেই হোক তা আদায় করবে, আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নেবে। ছেলেবেলা থেকেই ও আমার সঙ্গে এমনি ধরণের শত্রুতা ক'রে আসছে। প্রথমে নিজে কিছু নেবে

না, আমাকেই নিতে দেবে। তাতে আমাকে বরং প্রাণপণে সাহায্যই করবে। কিন্তু যেমনি আমি সেটা হাতে পেয়েছি, অমনি খপ্ ক'রে আমার হাত থেকে কেড়ে নেবে। এই ছিল ওর স্বভাব। তোমার বিষয়েও ও ঠিক সেই চাল শুরু করেছে। তুমি জানোনা, এমনিই ভয়ানক ঐ মেয়ে।"

"ছি ছি ধীরা, এ সমস্ত কি বাজে কথা তুমি বলছো ?"

"তা হ'তে পারে অবশ্য বাজে কথা, কিন্তু এমনিই আমার মনে হচ্ছিল। যাক গে, আমি বারণ ক'রে দিচ্ছি, তুমি ওর সঙ্গে আর মিশোনা। বাবার চিঠিতেও আমার কাজ নেই, আর বোনের দরদেও আমার কাজ নেই। আমাদের দুজনের মধ্যে আমি ওকে ঢুকতে দিতে চাই না, আর সেই জন্যেই আমি ওখানে যাতায়াত করতেও চাই না।"

"আচ্ছা বেশ, তাই হবে। কিন্তু নীরা সত্যিই ভালো মেয়ে, তোমার মনে ও সব কুচিন্তাগুলো যেন আর এনো না।"

ব্যাপারটা এইখানেই থেমে গেল। ওদের বাসাটা দেখতে আসাও নীরার পক্ষে আর সম্ভব হলো না, কিংবা সে রঞ্জনের সঙ্গে আর কোনো রকম ঘনিষ্ঠতাও করতে পারলে না। দেখা হ'য়ে গেলেও রঞ্জন যে ওর সঙ্গে বেশি কথা বলতে ইতস্তত করছে, তা সে দুই একদিনের মধ্যেই বুঝে নিলে। সেও হঠাৎ যেন থেমে গেল, কথা বলবার জন্যে আর তেমন আগ্রহ দেখালে না। কিন্তু তবু প্রায়ই কলেজের মোড়ে ওদের দেখা হতো। আর দেখা হ'লেই নীরা হাত তুলে কেবল একটি ছোটো নমস্কার ক'রে একটু হেসে নিজের গন্তব্য পথে চলে যেতো। কিন্তু বড়ো অদ্ভুত দেখাতো ওর সেই নির্বাক মুখের হাসিটুকু। সেই কেমন এক ধরণের একটুখানি স্মিত হাসি রঞ্জনের মনে বিষম ধাঁধা লাগিয়ে দিতো। কি যেন

এক দুর্বোধ্য রকমের বেদনায় আর মমতায় ওর সারা অন্তরটি বহুক্ষণের জন্য আলোড়িত হ'তে থাকতো। বুঝতে পারতো, ঐ নীরা মেয়েটির এ বড়ো এক আশ্চর্য ক্ষমতা। কথার ভেতর দিয়ে সে যতটুকু না জানাতে পারে, ঐ নিঃশব্দ হাসিটুকুর ভেতর দিয়ে সে তার চেয়ে অনেক বেশি যেন জানিয়ে দেবার কায়দা জানে। নীরার চেয়েও ওর প্রাণটা যেন অনেকখানি বড়ো হ'তে চায়, সে প্রাণ কিছুতে তবু বাইরের আলোতে বেরিয়ে আসবার কোনো রাস্তা খুঁজে পাচ্ছে না। বারে বারে কোন্ রুদ্ধ দেয়ালে তার মাথা ঠুকে যাচ্ছে। তবু সে যেন অদম্য, তবু সে কিছুতে হার মানবে না। দূরেই সে থাকে, কিন্তু দূর থেকে কোন দামী বস্তুটি চায় সে?

এই সময় কলকাতা শহরের মধ্যে অকস্মাৎ এক উন্মত্ততার আগুন জ্বলে উঠলো। হিন্দু মুসলমানে বিষম দাঙ্গা বেধে গেল। ঐ সমস্ত সমস্যা তখন তারই কোলাহলে একদম চাপা প'ড়ে গেল।

নয়

কলেজ যাবার জন্যে রাস্তায় বেরিয়ে রঞ্জন হঠাৎ দেখলে, কলকাতা শহর যেন বদলে গেছে। শহরের মানুষগুলোর মধ্যে যেন কি একটা বিষম ওলোটপালোট হ'য়ে গেছে। তাদের মধ্যে কি একটা নতুন রকমের চাঞ্চল্য, আশ্চর্য ধরণের উত্তেজনা। সব কাজ ফেলে দিনে দুপুরে তারা রাস্তায় রাস্তায় মানুষ হত্যা করছে। লুকিয়ে চুরিয়ে নয়, প্রকাশ্য রাজপথে, সকলের চোখের সামনে। অবাক কাণ্ড! চিরকালের নিরীহ প্রকৃতির সব মানুষ কেমন ক'রে বদলে গিয়ে এমনি নিষ্ঠুর হত্যাকারী হ'য়ে উঠলো? বেলা ন'টার সময় কোথাও কিছু এর আভাসমাত্র ছিল না, ঠিক দশটার সময় থেকে দেখা গেল যে এই অমানুষিক কাণ্ড শহরের সর্বত্রই চলেছে। হিন্দুরা তাদের প্রতিবেশী মুসলমানদের রাস্তায় বেরুতে দেখলেই হৈ হৈ ক'রে কোথা থেকে ছুটে এসে লাঠি আর লোহার ডাণ্ডার ঘা মেরে একেবারে নিঃশেষ ক'রে ফেলছে। মুসলমানেরাও তাদের প্রতিবেশী হিন্দুদের দেখলেই ছোরা ছুরির আঘাতে পেট ফাঁসিয়ে দিচ্ছে, গলা কেটে দুফাঁক ক'রে দিচ্ছে। কলকাতা শহরের পাড়ায় পাড়ায় এই ধরণের অভাবনীয় দৃশ্য। এ যেন এক নতুন ধরণের মৃত্যু-সমারোহ।

সকলেই এতে যোগ দিয়েছে। তার মধ্যে কেউ বা সক্রিয় হত্যাকারী, কেউ বা নিষ্ক্রিয় আস্ফালনকারী। পাড়ায় পাড়ায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা বিভিন্ন রকমের দল বেঁধে ফেলেছে। দলে দলে চলেছে খুনোখুনি। প্রত্যেক দলেরই আবার নিজস্ব কিছু বিশেষ স্লোগান অর্থাৎ সাংকেতধ্বনি আছে। হিন্দুরা বলে 'বন্দে মাতরম', আবার বলে

'জয় হিন্দ্', আবার বলে 'কালী মাঈকি জয়',—অর্থাৎ কিনা মাতার বন্দনা হোক, ভারতের জয় হোক, কালীমাতার জয় হোক। মুসলমানেরা বলে 'আল্লাহ্ আকবর', আবার বলে 'নারায় তকবীর', আবার বলে 'লা ইলাহ্ ইল্লাল্লা',—অর্থাৎ যিনি পরম ঈশ্বর আর যিনি সৃষ্টিতার সর্বাপেক্ষা চরম তাঁরই জয় হোক, যিনি সকলের একমাত্র প্রণম্য দেবতা আর যিনি ছাড়া কোনো দ্বিতীয় দেবতা নেই তাঁরই জয় হোক। বিভিন্ন দলের এই সব জয়ধ্বনির অর্থ হলো একই। সৃষ্টিকর্তার এমনি জয় গান করতে করতে দুই দলই তাঁর সৃষ্টি করা মানুষগুলোকে অবলীলা-ক্রমে প্রাণে মারছে। কেবল তফাৎ এই যে হিন্দু হিন্দুকে মারছে না, মুসলমানকে মারছে। আর মুসলমান মুসলমানকে মারছে না, তারা হিন্দুকে মারছে। দেখেশুনে রঞ্জন হতভম্ব হ'য়ে গেল। হিন্দু মুসল-মানের মধ্যে রেষারেষি আগেও ছিল বটে, ঘৃণা বিদ্বেষও ছিল, কিন্তু এমন বেপোরোয়া খুনোখুনি কখনো ছিল কি?

ঘুরে গেল শহরবাসীর কর্মধারার স্রোত, ঘুচে গেল তাদের নিয়মিত নিত্য দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপ। নিতান্তই খেয়ে বাঁচতে হবে বলে সকালে তাড়াতাড়ি কোনোমতে গ্রাসাচ্ছাদনের জোগাড়টা সবাই সেরে নেয়। তারপর বেলা নটা না বাজতেই মাতন শুরু হ'য়ে যায়। দুপুরে কিছু-ক্ষণের জন্যে একটু বিরতি, তার পরে আবার চলতে থাকে এই নৃশংস হত্যালীলা। অধিকাংশ লোকেই আর অফিস যায়না, দোকানপাট করে না, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে পলিটিক্সের গুলতান করে না, ঘরে বসে মেয়েদের সঙ্গে তাস খেলে না। ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে যায় না, ফেরিওয়ালা ফেরি করতে বেরোয় না, বরফওয়ালা বরফ বেচেনা, ভিখিরি পর্যন্ত ভিক্ষে চাইতে বেরোয় না। সকলের সব রকম কাজ বাজ যেন ঘুচে গেছে। এখন কেবল ঐ একটিমাত্র কাজ, মানুষ মারা।

রঞ্জন এখন মহা ফাঁপরে পড়ে গেল। নিতান্ত নিষ্ক্রিয় হ'য়ে মূর্খটি বুজে এই দেখে শুধু চুপ ক'রেই থাকবে? তাও কি কখনো সম্ভব? চোখের সামনে কত লোকের প্রাণ বলি হ'য়ে যাচ্ছে, তাই দেখে কখনো চুপ ক'রে থাকা যায়? তবে কি ও ছুটে গিয়ে এই নরহত্যায় বাধা দেবে? তাও কিন্তু সম্ভব নয়। সেই উন্মত্ত আততায়ী জনতার উদ্যত আক্রমণের মুখে বাধা দিতে গেলে ও তুচ্ছ তৃণখণ্ডের মতো সেই সঙ্গেই টুকরো টুকরো হ'য়ে উড়ে যাবে।

এটা প্রধানত হিন্দু পাড়া। এখানকার সেই স্নেহমমতায় চিরজীর্ণ দুর্বল মানুষগুলো কেন যে হঠাৎ ধাত বিগড়ে গিয়ে এমন বেপরোয়া রকমে হিংস্র হ'য়ে উঠলো, রঞ্জন তার কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। দৈনিক খবরের কাগজগুলোও পাবার উপায় নেই যে এর সঠিক কারণটা পড়ে দেখবে। যে হকারটা কাগজ দিয়ে যেতো সে আর আসেই না। সকালে ঘুম থেকে উঠে কয়েকদিন কাগজ কিনতে গিয়ে দেখেছে, পাড়ার লোকেরা শকুনি পড়ার মতো কাগজওয়ালাকে ঘিরে ফেলে দু আনার জায়গায় চার আনা দিয়ে সমস্ত কাগজগুলো কেড়েকুড়ে নিয়ে গেল, ও তার ভিতর থেকে একখানিও সংগ্রহ করতে পারলেনা। হোটেলের ম্যানেজার কোথা থেকে একখানা মুসলমানদের তরফের বাংলা কাগজ সংগ্রহ করতো। তাই দু একদিন চেয়ে নিয়ে পড়ে দেখলে, তাতে লেখা আছে যে হিন্দুরাই দাঙ্গা শুরু করেছে, তারাই বেশি হত্যা করছে, তারাই মুসলমানদের ঘরে ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। পাশের ঘরের সেই পূর্ববঙ্গীয় বৌটির স্বামী উমাচরণ বাবুর কাছ থেকে তখন হিন্দুদের তরফের একখানা কাগজ চেয়ে নিয়ে পড়ে দেখলে, তাতে একেবারে উল্টো কথা। সে কাগজ বলছে মুসলমানরাই এর জন্যে দায়ী, তারাই এত এত সংখ্যায় হিন্দুদের মেরে উজোড় ক'রে ফেলেছে,

নারীহরণ করছে, শিশুহত্যা করছে, দামী দামী সব দোকানপত্র লুট করছে। কোন কথাটা তবে সত্য? কোন কাগজটার কথা বিশ্বাস করা যায়?

পাড়ার একজন মাতব্বর গোছের ছোকরা কাপড় গুটিয়ে মালকোচা এঁটে বেঁটে সাইজের একটা মোটা বাঁশ নিয়ে রাস্তার মোড়ের কাছে বিড়ি টানতে টানতে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তার কাছে গিয়ে রঞ্জন খুব নম্রভাবেই বললে—"কেন মিথ্যে আপনারা ঐ নিরীহ লোক-গুলোকে মারছেন? ওরা তো কিছু দোষ করেনি?"

"দোষ করেনি? কি ক'রে জানলেন মোশাই, দোষ করেনি? দুনিয়ার বোবাকালারাও জেনে গেল, ছোটো ছোটো ছেলেগুলোও পর্যন্ত জানে, আর আপনি কিছু জানেন না? কেমন ক'রে জানবেন স্যার! কেবল বৌকে নিয়ে কলেজ করতে যাবেন, আর ঘরে এসে বসে থাকবেন, তাতে কেমন ক'রে আর জানবেন বলুন! অমুক অমুক জায়গায় আমাদের ঘরের মা বোনদের পর্যন্ত কেটেকুটে খুন করে ফেললে, কত মেয়েদের ধরে জোর ক'রে ধর্ম নষ্ট ক'রে দিলে, কচি ছেলেগুলোকে পর্যন্ত ছাদের ওপর থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ফুটপাতের ওপর আছড়ে মারলে, এ সব বুঝি কিছুই শোনেন নি? খবরের কাগজটাও খুলে দেখেন না বুঝি?"

"ও সব কথাতো শুনেছি। কিন্তু তাই বলে এই পাড়ার ঐ নিরীহ মুসলমানগুলোকে যে মারছেন, এরা কি দোষ করলে?"

"কি বললেন? নিরীহ? ও জাতের সবগুলোই শয়তান। বাগে যদি একবার পেতো, তাহ'লে আপনাকেই মারতে ওরা কসুর করতো নাকি? যান না একবার ওদের পাড়ায়, বৌ নিয়ে বাহার দিয়ে কলেজ করা জন্মের মতো ঘুচিয়ে দেবে। জাপিয়া

আমরা এ পাড়ার মধ্যে গোড়া থেকেই ওদের কায়দা ক'রে ফেলেছি, নইলে রাস্তায় কি আজ এমন ক'রে বেরুতে পারতেন? এখান থেকে ওদের ঝাড়গুষ্টি সমেত ফাঁক ক'রে দিয়েছি, সে জন্যে আমাদের থ্যাংকস্ দিন মোশাই, থ্যাংকস্ দিন। দোষ কিছু করে নি? তা করবে কোথা থেকে? তার আগেই যে ওদের ছোটো বড়ো সব সাবড়ে দেওয়া হলো। আরো যে ক'টা এখনো লুকিয়ে চুরিয়ে রয়ে গেছে, রাস্তায় বেরুলেই তাদের সাবড়াবো। আজই ক'টা খতম হ'য়ে গেছে তা জানেন? আমি আজ একাই এই বাঁশ দিয়ে চারটেকে শেষ করেছি, এই দেখুন এখনো এতে রক্তের দাগ লেগে রয়েছে। এই পাড়ার কতগুলো বজ্জাত হিন্দুরাই যে এখনো বাগড়া দিচ্ছে, কাউকে কাউকে নিজেদের রান্না ঘরের মধ্যেই লুকিয়ে রাখছে। নরম কাদার তালের মতো মন নিয়ে এখনো মহাপ্রভুরা সব তুল্ তুল্ করছে কিনা, এমনি ক'রে নিজেদেরই সর্বনাশ করছে। তা কেউ ফাঁক যাবে না, সবগুলোকেই একে একে টেনে বের ক'রে ঐ গাদায় ফেলবো। আমাদের গাদাটা বুঝি দেখেন নি? ঐ দেখুন একবার চেয়ে, বড়ো রাস্তার দিকে।"

এ লোকটা বলে কি? বিস্মিত হ'য়ে রঞ্জন নির্দিষ্ট দিকে ফিরে চাইলে। স্তূপাকার ক'রে শবের ওপর শব লাইন ধরে সাজিয়ে রাখা আছে অতখানি প্রশস্ত রাস্তাটাকে অবরোধ ক'রে। পাশ কাটিয়ে কোনো গাড়ি যাবার পর্যন্ত উপায় নেই। দেখেই রঞ্জনের চক্ষুস্থির হ'য়ে গেল, ওর হাঁটু দুটো কাঁপতে লাগলো। ওর সমস্ত অন্তরাত্মা বারংবার শিউরে উঠতে লাগলো। স্তম্ভিত হ'য়ে ও সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

এক মুহূর্তের মধ্যে অনেকগুলো কথাই ওর একসঙ্গে মনে এসে গেল। যাদের ঐ মৃতদেহগুলো নানা বীভৎস ভঙ্গীতে অমন ক'রে

রাস্তার ধুলোর ওপর পড়ে আছে, তারা প্রত্যেকেই ছিল যেমন এক একজন মুসলমান মায়ের কোলের ছেলে, ও নিজেও ঠিক তেমনি একজন মুসলমান মায়ের কোলের ছেলে। ওর মনে পড়ে গেল ফতিমা বিবিকে, আর রাবিয়া বিবিকে। কত কাল ধরে কত রকমের চেষ্টা ক'রে তারা ওকে এতখানি বড়ো ক'রে তুলেছে। ওদের সকলের মায়েরাও ঠিক তেমনি ক'রেই ওদের প্রত্যেককে ঠিক ওরই মতো বড়ো ক'রে তুলেছিল। সমস্তই কি এক নিমেষে বৃথা হ'য়ে গেল, তাদের সেই কত বছরের অক্লান্তচেষ্টায় মানুষ করার পরিশ্রম?

দাম কৈ, তবে এত যত্নের এই জীবনের দাম রইল কৈ? একটা দুটো নয়, তিনটে চারটে নয়, এতগুলো মায়ের পেট থেকে প্রসব করা ছেলে, আত্মরক্ষার সুযোগটুকু পর্যন্ত তাদের না দিয়ে একভাবেই মেরে ফেলে একভাবেই রাস্তার ওপর জড়ো ক'রে রাখা হয়েছে। এই কাণ্ড করতে যদি কারো মনে একটু ব্যথাও না লাগে, যদি কারো চোখে এক বিন্দু জলও না আসে, তাহ'লে আর এত ক'রে বাঁচিয়ে রাখা মানুষের জীবনের কিছু দাম রইল কৈ? ওর নিজের জীবনেরই বা তাহ'লে দাম কোথায়? ও যে নিজেও এক মুসলমানের ঘরের ছেলে! এই কথাটি তৎক্ষণাৎ ওর মনে অতিমাত্রায় প্রতীয়মান হ'য়ে উঠলো। তার পরে প্রত্যেকেরই মধ্যে যে অন্তর্নিহিত জিজীবিষার তন্ত্রীটি সর্বদাই আপন অজ্ঞাতে টান ক'রে বাঁধা থাকে, ওর নিজের জীবনবীণার সেই মূল তারটি যেন কোনো আঘাত না পেয়েই ছিন্ন হ'য়ে গেল। একটিমাত্র খবর এই প্রগল্‌ভ মাতব্বর ছোকরাটিকে একবার মাত্র গুপ্তাক্ষরে জানিয়ে দিলে হয়, যে ও নিজেও একজন মুসলমানের ছেলে। তৎক্ষণাৎ অমনি প্রমাণ হ'য়ে যাবে যে তাহ'লে ওর জীবনের আর কিছুমাত্র দাম নেই। আর এমনি হিন্দুর মতো অবস্থায় যদি ও চলে যায় কোনো

মুসলমান পাড়াতে, তাহ'লে সেখানে ওকে কোনো কথা বলতে কইতেই হবে না, পিছন দিক থেকে কখন কোন মুহূর্তে প্রমাণ হ'য়ে যাবে যে ওর এই জীবনের একটুও দাম নেই। তবে প্রমাণ হ'য়ে তাই যাক না! সত্য যা তাই প্রমাণ হ'য়ে যাক না কেন!

এ কথা ভাবতে ভাবতে আবার তখনই কেমন ক'রে সেই জীবনতন্ত্রীর বীণাটায় জোড়া লেগে গেল। তখনই মনে পড়ে গেল—না না, নিজেকে ওর বাঁচতে হবে। যাঁরা যে ওর এই জীবনকে এমন অমূল্য মাধুর্যে ভরে দিয়েছে তা ভুলে গেলে চলবে কেন? তাঁদের জন্যেই ওকে বাঁচতে হবে। যাঁরাকে যে ও নিজের কাছে এনে রেখেছে। তাকে রক্ষা করতে হবে। ফতিমা বিবিরা যে ওর মুখ চেয়ে আছে! তাদেরও রক্ষা করতে হবে। যে জীবনযুদ্ধ স্বেচ্ছায় ও বরন করে নিয়েছে, তাতে শেষ পর্যন্ত জয়ী হ'তে হবে। সেই জয়ের সৌভাগ্য যাঁরার সঙ্গে একত্রে সম্ভোগ ক'রে আপন আত্মাকে সার্থকতার তৃপ্তি দিতে হবে। সেই ভবিষ্যৎ সার্থকতার মূল্যে জীবনের দাম ওর কাছে অনেক বেশি। ওরা যারা মরেছে, তারা মরেই গেছে। সেটা এখন আলাদা কথা। কিন্তু ও রয়েছে বেঁচে। ও থাকবেও এখন বেঁচে। এখানে ও আদৌ মুসলমান নয়, ও হিন্দু ও হিন্দু। এ পাড়ার এই সব হিন্দুদের চেয়েও ও অনেক নিষ্কলঙ্ক রকমের হিন্দু। এদের এই বিকারগ্রস্ত ঘোলাটে হিন্দুত্বের চেয়েও ওর হিন্দুত্ব মেকি হ'লেও যে কত খাঁটি তা ও একবার ভালো ক'রে দেখিয়ে দেবে। মানুষের যে মনুষ্যত্ব, সে কি থাকে তার জন্মের মধ্যে, না তার জীবনধারার মধ্যে?

"কী মোশাই, দেখেই যে একদম থ মেরে গেলেন! কতগুলোকে খতম করেছি তাই গুণে গুণে দেখলেন নাকি? এ পাড়া মোশাই হিন্দুস্থান ক'রে ফেলা গেছে। ওরা চিরকাল মনে ক'রে এসেছিল

যে ওরাই মারবে, আর হিন্দুরাই পড়ে পড়ে মার খাবে। তা কি আর চিরকাল চলে? এবার ঘুঁটিগুলো বেবাক উল্টে গেছে। ওরা এবার দেখুক যে হিন্দুরাও মারতে জানে, ক্ষেপে গেলে তারাও এক হাত দেখিয়ে দিতে জানে। আমাদের এই হিন্দু জাতের সঙ্গে পারবে নাকি ওরা? বলুন মোশাই বলুন—'কালী মাঈকি'—আচ্ছা থাক থাক, শুনতে পেলে কেউ আবার সাবধান হ'য়ে লুকিয়ে যাবে। কিন্তু চাঁদা দিতে হবে মোশাই, হাঁ। এমনিতেই ছাড়চি না। খুব ধুমধাম ক'রে আমরা এবার কালীপুজো করছি, কেবল শুঁড়ি আর পাঁঠা। পাড়ার সবাই মোটা মোটা চাঁদা দিচ্ছে, আর আপনিই বুঝি ফাঁকি দেবেন? সেটি হচ্ছে না। রাত জেগে জেগে আমরা কত কষ্ট করছি সেটা একবার বলুন!"

রঞ্জন এতক্ষণ পরে একটু হাসতে পারলে। বললে—"নিশ্চয়, চাঁদা আমি দেবো বৈকি!"

দেখে শুনে এই পরম বিস্ময়কর ব্যাপারটি ও ক্রমে আবিষ্কার করলে যে ঐ পাড়াটার যাবতীয় হিন্দু প্রতিবেশীদের পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের এখন খুবই যেন মিল। সকলে একই রকমের উদ্দেশ্য নিয়ে যেন আজকাল চলছে। সকলে একই রকমের উত্তেজনাপূর্ণ কথা বলছে। লাঠি তুলে মারবার মতো মানুষ পেলে সকলেই একসঙ্গে লাঠি তুলে মারে। বাঙালী হিন্দুতে হিন্দুতে এমন অদ্ভুত মিলের কথা ইতিহাসে কখনো শোনা যায়নি। এমন কি স্বদেশী আন্দোলনের সময় এমন মিল হয়নি, বিদেশী বর্জনের সময় হয়নি, নন্‌কোঅপারেশনের সময়েও না, আর সত্যাগ্রহের সময়েও না।

রঞ্জন একা ওদের এই নিরেট উগ্র একতাকে কেমন ক'রে প্রতিরোধ করবে? এখানে তর্ক ক'রেও কোনো লাভ নেই, সকলের বিপরীত

কিছু আচরণ করতে গিয়েও কোনো লাভ নেই। চুপচাপ থেকে যাওয়াই এস্থলে সব চেয়ে ভালো। কলেজ যাওয়া তো ঘুচেই গেছে। রাস্তায় বেরুতেও ভয় করে। কত কি বীভৎস দৃশ্য যেখানে সেখানে চোখে পড়ে। ও তাই সারাক্ষণ বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে চেয়ে থাকে। মনে মনে শুধু এই ভাবে, একই দেশের মধ্যে দুটি জাত যুগের পর যুগ ধরে পাশাপাশি একত্রে বাস ক'রেও তাদের অন্তরে অন্তরে এ বৈরীভাব কেমন ক'রে লুকিয়েছিল? একই সংসারের মধ্যে বাস ক'রে দুই ভাইএর মধ্যেও রেষারেষি কি এমনি লুকোনো থাকে আর এমনি প্রচণ্ড হয়? একই মানুষের মনের মধ্যে দুটি স্বতন্ত্র জাতের কামনাও কি গোপনে গোপনে পরস্পরের প্রতি এমনি হঠাৎ মারাত্মক হ'য়ে ওঠে?